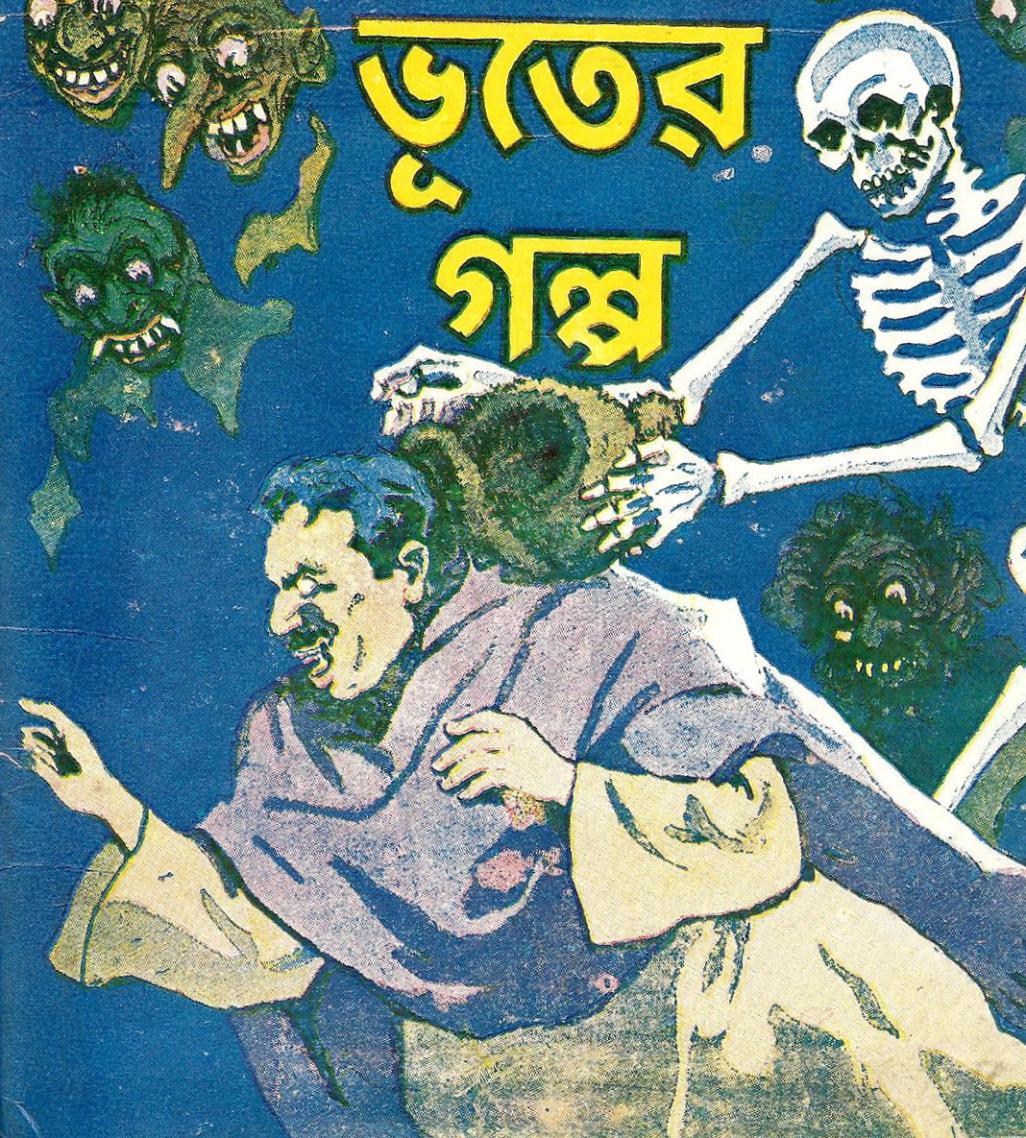


অডিও ফট ড্রোব গল্প



পাঁচমবন্দ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইভেরীর জন্য অনুমোদিত



অডুত যত ডুতের গল্প

সমাদক
গোরাঞ্জ প্রসাদ বস্তু

দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

ADBHUT JATA BHUTER CALPA
CODE NO. 63A 20

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্ৰ মজুমদাৰ
দেব সাহিত্য কুটীৰ প্রাইভেট লিমিটেড
২১, আমাপুর লেন,
কলিকাতা-১

পুনৰ্মুদ্রণ :
জুন
২০০৮
১৫

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদাৰ
বি. পি. এম.স্ট্ৰিটিং প্ৰেস
ৱঘুনাথপুৰ, দেশবন্ধুনগৱ
২৪ পৱনগনা (উত্তৰ)

দাম—
টা. ৪৫.০০



সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কক্ষালের টেকার	মাণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১
২। কক্ষাল-সারথি	হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৫
৩। গৃণী	চারু বল্দোপাধ্যায়	২৩
৪। গঙ্গাধরের বিপদ	বিভৃতভূষণ বল্দোপাধ্যায়	৪০
৫। আত্তেগার	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৪৬
৬। নমস্কার	শ্রেষ্ঠজ্ঞানল মুখোপাধ্যায়	৫৪
৭। ভৌতিক	সুকুমার দে সরকার	৬৭
৮। ভাঙ্গারের রক্ষা নেই	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৭৪
৯। ভৌতিক কাহিনী	গোরাঙ্গপ্রসাদ বসু	৮২
১০। যেটোতে বুড়ী	বুদ্ধদেব বসু	৮৭
১১। বন্ধু	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৯১
১২। খুড়া মহাশয়	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৯৮
১৩। গল্পের শেষে	প্রেমেন্দ্র মিশ্র	১০৯
১৪। ভূতের গান	ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৮
১৫। ছবির ভূত	মাণিক বল্দোপাধ্যায়	১২১
১৬। আমার ভূত দেখা	শিবরাম চক্রবর্তী	১২৯



—ঢাকাজাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতুম, আমার আস্তীরনা আমার তিরন্কার করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা করতেন, মাটোরমশাই প্রচার দিতেন এবং কাগজের সম্পাদকেরা না-ছেপে ফেরত দিতেন। কিন্তু বলে রাখ, একদিন সম্ভু বিপদ্ থেকে যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, সে শুধু আমার ঐ কবিতাস্তির জোরে। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ, কবিতা আমার প্রাণরক্ষা করলে কেমন ক'রে? সত্যি বলছি, সেদিন কারো সাথ্য ছিল না যে, মরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করে! ভাগ্যে কবিতা লিখতে শিখেছিলুম, তাই বেঁচে গেলুম। নইলে লোকের অভ্যাচারে কবিতা-লক্ষ্যন্তীকে বাল বয়সে বিদায় দিলে, সেদিন আমার বে কি অবস্থা হতো, তা আমিই জানি।

গল্পটা তাহলৈ খ্লেই বলি। নান স্থান ঘূরে আমি বাঁচ্ছিলুম জয়পুর থেকে দিল্লী। টাইঁঁ-টেব্ল খুলে দেখলুম, টানা দিল্লী যেতে হ'লে রাত্রের গাড়িটাই—সূবিধে। কিন্তু সে-ঝেঁ অনেক রাতে ছাড়ে—প্রায় দুটো। একে জয়পুরের মত জায়গা, তায় মাঘ-মাসের শীত, তার উপর রাতি দুটো—এই শ্যাহজপুর ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা করতে আতঙ্কে আমার বুক কঁপতে লাগলো। কিন্তু উপায় কি? আমি ছেঁশন-মাটোরকে বলুম—“কি উপায় করা যাব, বলুন দেখি? এই দারুণ শীতে তোর-রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে ঝেঁশ-ধরবার কথা মনে করতেই তো আমার কষ্ট দিয়ে জরুর আসছে!”

ষ্টেশন-মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনি কি ফাল্ট-ক্লাস প্যাসেজার?”

তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল-কোম্পানী আধাভাড়ায় সবৰ্ত্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা করায় আমি সম্ভাস বক্স-মানুষী করছিলুম। বৃক্ষ ফুলের বক্স—“হ্যাঁ, আমার ফাল্ট-ক্লাসের টিকিট!”

ষ্টেশন-মাস্টার বক্সেন—“প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভালো ব্যবস্থা আছে।”

আমি বক্স—“কি?”

তিনি বক্সেন—“আপনি এক কাজ করবেন। সম্ভ্যা আটটার মধ্যে থেরে-দেয়ে ষ্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একটা ফাল্ট-ক্লাস গাড়ি ঐ সাইজেও কেটে রেখে দেবো, আপনি তাইতে বিছানা পেতে শুরুে পড়বেন—লেপ মুড়ি দিয়ে। তারপর রাতে যখন মেল আসবে, তাইতে আপনার গাড়ি লাগিয়ে দেবো—আপনি দিবিয় ঘুমতে ঘুমতে দিলৈ গিয়ে পেঁচবেন।”

আমি বক্স—“বাঃ, এ তো বেশি!”

ষ্টেশন-মাস্টার বক্সেন—“হ্যাঁ, শৌকের রাতে গাড়ি ধরবার অসুবিধে বলেই তো কোম্পানী বড়-লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।”

আমি বক্স—“খুব ভালো ব্যবস্থা। আমি তাইলৈ আটটার মধ্যেই আসবো—আপনি গাড়ি ঠিক করে রাখবেন।”

তিনি বক্সেন—“গাড়ি ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরী করবেন না। আটটার পর আর ষ্টেশন নেই বলে আমরা আটটার সময় ষ্টেশন বন্ধ করে চলে যাই।”

আমি বক্স—“আটটার মধ্যেই আসবো।” বলে আমি চলে গেলুম।

তারপর সম্ভ্যাবেলো আহারাদি সেবে পায়ে তিনজোড়া ডবল-মোজা, গাঁথে দুটো গরম গেজির উপর একটা মোটা ঝানেলের কার্মিজ, তার উপর সোয়েটার, তার উপর তুলো-ভরা মেরজাই, তার উপর ওয়েষ্ট কোট, কোট, ওভার-কোট এবং সবৰ্বাপরি একটা মোটা বালাপোষ মুড়ি দিয়ে, মাথাটাকে কান-চাকা ট্রিপ ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এটৈ কাপতে-কাপতে ঠিক আটটার সময় ষ্টেশনে এসে হাজির হলুম। আমার মস্ত-বড় লোহার তোরণটা দৃঢ়জন কুলি এসে ধুরাধারি করে নামাতে গিয়ে একজন ফিক্ করে একটু হেসে ছেড়ে দিলো। আমি বক্স—“কেম্বা হলো রে?”

সে বক্স—“বাবুজির তোরণে দেখিছ ফাঁকা। যা দৃঢ়-একটো ধূস্ত-উত্তি আছে, সেগুলো গাঁথে জড়িয়ে নিয়ে বাস্তা আমাদের বর্ধিসং করে থান বাবু—আপনার কুলি-ভাড়া, রেল মাশুল অনেক বেচে থাবে।”

আমি বক্স—“ওহ, যা, তোম্বো আর ইংৰে করতে হবে না!” বলেই আমি হন্দ হন্দ করে ষ্টেশন-মাস্টারের ঘরের দিকে চলে গেলুম। ষ্টেশন-মাস্টার আমায় দেখেই বক্সেন—“গুড় ইডনিং বাবু! আপনার ভাগ্য খুব ভালো—আজ আর কেমনো প্যাসেজার নেই; সমস্ত গাড়িটাই আপনার একলার! চলুন, আপনাকে

গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।” বলে তিনি আমাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে, পাঁচ-ছয়টা রেল-সাইন টপ্পকে, অনেক-দূর চলে চলে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাঁড় করালেন। সামনে দেখলুম, একখনা ধৈঁয়াতে রঙের গাড়ি কাটা পড়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটা কল্থকাটা, অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

মাষ্টারবাবু গাড়িটার চারি খুলে দিয়ে বলেন—“নিন—উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুধু পড়ুন!” বলেই তাড়াতাড়ি তাঁর হাত-বাতিটা তুলে নিয়ে “গুড় নাইট্”—বলে ছুট দিলেন। অন্ধকারে তাকে আর দেখতে পেলুম না, রেল-লাইনের খোওয়াগুলোর উপর তাঁর জুতোর খস্খস্ম শব্দ কেবল শুনতে লাগলুম। ছাঁৎ করে আমার ঘনে হলো—তাইতো, মাষ্টারবাবু, অমন করে পালালেন কেন?

ইতিমধ্যে দোখি, কুলি-দুটো আমার তোরণে ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েই বলেছে—“বাবুজি পয়সা!” আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই, তারাও ছুট দিলে ষ্টেশনের দিকে। ব্যাপার কি? আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ভাবছি, দোখি, দুটো করলা-মাখা কালো ভৃত রেল-লাইনের বাঁধের নাচ থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারটে সাদা চোখ দিয়ে আমার দেখতে দেখতে ষ্টেশনের দিকে চলে গেল। তাদের পিছনে একটা কুরুর লাজ তুলে দৌড় দিলো! তার পরেই সব একেবারে নিস্তর্ক্ষ!—একেবারে অন্ধকার!

আমারসার রাত্তি-চারিদিকে অন্ধকার ঘৃট-ঘৃট করছে। সেই অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক চারিদিক দেখতে লাগলুম—আশে-পাশে কেউ নেই, দূরে কেবল গাছগুলো অসাড় হয়ে ছায়ার প্রতি দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ভিতরটা কেমন ছম্ব-ছম্ব করতে লাগলো।

আমি আস্তে-আস্তে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলুম। গাড়ির ভিতরটা একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। তাড়াতাড়ি দেওয়াল হাঁড়ে বিজ্ঞিনিবাতির চারি টিপ্পলুম—ঘৃট করে শব্দ হলো, আলো হলো না। সবৰ্বনাশ! আলো নেই না কি? আলোর সুইচ নিয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করলুম, কোনই ফল হলো না, যেহেন অন্ধকার তেমনই! পকেট খুললুম, দিয়েশলাই নেই। কেমন করেই বা ধাকবে? আমি তো চুরুট থাই না—লুকিয়েও না। হয় তো তোরণের মধ্যে একটা দিয়েশলাই আছে; চারি খুঁজতে লাগলুম, পৈতেতে চারি বাঁধা ছিল; বালাপোষ, ওভার-কোট, কোট, ওয়েল্ট-কোট, সোয়েটার-গেঞ্জির গোলক-ধাঁধার মধ্যে কোথায় যে পৈতে-গাছটা হারালো, কিছুতেই খুঁজে পেলুম না। বাম্বনের ছেলে, বিপদে-আপদে, বিদেশ-বিদুঃয়ে যজ্ঞোপবীতাই মন্ত সহায়! সেটাকেও শেষে খোওয়ালুম।

সেই অন্ধকারে আমার ঘেন হাঁপ ধরতে লাগলো। অন্ধকার যে ঝাঁতাকলের ঘতো মানুষের বুককে এঘন করে পিষ্টে থাকে—এ আমি জানতুম না। আমি গাড়ির মধ্যে এদিক-ওদিক করে ছট-ফট করতে লাগলুম। মনে হলো যেন প্রাণ বেরিয়ে যাবে। মাথা ঘুরতে লাগলো—চোখের সামনে নানা-রকম ছায়া দেখতে

লাগলুম, কানে কাদের সব ফিস্-ফিস্ কথা এসে লাগতে লাগলো! কোথায় একটু আলো পাই? আমি ছুটে গাড়ি থেকে বেরিয়ে রেলের লাইন থেকে দূর্টো পাথর তুলে ঠক্-ঠক্ ক'রে সজোরে ঠক্-তে লাগলুম—যদি একটু আলোর ফিন্কি পাই! কিন্তু হায় অদ্বিতীয় আলোর বদলে পাথর-কুঁচির ফিন্কি এসে আমার চোখ-দূর্টোকে ঝন্কনিয়ে দিলে!

আমি দূর্হাতে চোখ রংগড়াতে-রংগড়াতে ষ্টেশনের দিকে ছুটি দিলুম—যেমন ক'রে পারি, সেখান থেকে একটা আলো নিয়ে আসব। ষ্টেশন মাস্টারটা কি পাঞ্জি! এই অল্পকারে মাঠের মধ্যে আমায় একা ফেলে গেল, একটা আলো দিল না! বজ্জে কি না, দিব্য ঘূর্মতে ঘূর্মতে থাবেন! পাঞ্জি কোথাকার!

আমি ছুটতে-ছুটতে একেবারে ষ্টেশনের কাছে এসে হাঁপ নিয়ে দাঁড়ালুম—স্ল্যাটফর্মের কিনারায় যে একটা বাঁকা খেজুরগাছ ছিল, ঠিক তার সামনে। কিন্তু এ কি? এই তো সেই খেজুরগাছ; এই তো—এই তো রয়েছে। কিন্তু ষ্টেশন কোথায়? আমি একদিক-ওদিক চারাদিক চেয়ে দেখলুম—ষ্টেশন নেই। মনে হলো, কালো শ্লেষের গা থেকে ছেলেরা যেমন তাদের আঁকা ছবিগুলো মুছে ফেলে, ঠিক তেমনি ক'রে অল্পকারের গা থেকে ষ্টেশনকে একেবারে কে মুছে ফেলেছে!

আমার বুক্টা ধূক্-ক'রে উঠলো। আমি আর তিল-মাত না দাঁড়িয়ে আবার ছুটলুম—বে-পথে এসেছিলুম, সেই পথে—আমার গাড়ির দিকে। টপাটপ পাঁচ-ছুটা লাইন টপকে ছুটতে-ছুটতে আমি যখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি অতবড় গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে! গাড়ির চিহ্নাত সেখানে নেই। কি সবৰ্ননাশ!

আবার ভালো ক'রে চারাদিক্ চেয়ে দেখলুম—ষ্টেশনও নেই, গাড়িও নেই। চারাদিক্ খীঁ-খীঁ করছে! এখন উপায়? এই-রাত্রে আগ্রহ পাই কোথা? করি কি? কিন্তু ষ্টেশনের দিক্কাটা সেই খীঁ-খীঁ মুণ্ডি মনে হয়ে আমার বুক্টা ছাঁ ক'রে একবার মনে হলো, যাই, আর-একবার গিয়ে ভালো ক'রে ষ্টেশনটা খুঁজে আসি। উঠলো। ছেলেবেলায় গলেপে শুনতুম, দৈতাদানারা রাতারাতি বড়-বড় বাঁড়ি উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাঁড়ি সেইখানে রেখে যেতো—এ কি তাই হলো নাকি? মনে তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই!

হঠাৎ বুক্টা কেঁপে উঠে মনে হলো, এমন ক'রে রেল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা তো ঠিক নয়—আচম্বকা একখানি গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যেতে পারে! বেই এই কথা মনে হওয়া, তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সরে অলাদিকে ছুটে শেলুম! কিন্তু যেদিকে যাই, সেইদিকেই রেলের লাইন লোহার জাল দিয়ে আমার ঘিরে ফেলেছে—পালাবার উপায় আর নেই! আমার এই ছুটোছুটি দেখে অল্পকার থেকে কারা যেন হঠাৎ খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। আমি চমকে উঠে থেমে দাঁড়াতেই

টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধের উপর থেকে গড়তে গড়তে নীচে এক গাছতলায় এসে পড়লুম। মনে হলো প্রাণটা যেন বাঁচলো। ট্রেণ-চাপা পড়বার আর ভয় নেই।

গাছের গায়ে টেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। মনে হ'তে লাগলো—কতক্ষণে রাঠিটা কাট'বে। কিন্তু রাঠির যেন আর শেষ নাই। বসে-বসে দেখতে লাগলুম, নিস্তথ রাঠি বিহু-বিহু- করতে-করতে আরো নিকুম হয়ে আসছে। আর রাঠের অন্ধকারটা তার কালো রাতের উপর চাম্চিকের ডানার মতে একখানা কালো কৃৎসিত কম্বল আস্তে-আস্তে টেনে ঘূঁড়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর গা থেকে একে-একে সব জিনিষ যেন ঘূঁছে আসছে। দেখতে-দেখতে আঘি-শৃঙ্খল যেন ঘূঁছে আসতে লাগলুম। কালো ঝুঁতো মোজা-পরা আমার লম্বা পাদ-দ্বানা একটু-একটু ক'রে ঘূঁছে গেল। কালো ওভারকোট ও নীল বালাপোষ-মোড়া গা—তাও আস্তে-আস্তে ঘূঁছতে লাগলো। যখন প্রায় কোমর অবধি ঘূঁছে গেছে, আঘি আর সে-দ্ব্যাপ দেখতে পারলুম না—তাড়াতাড়ি চোখ বুঝে ফেললুম। চোখ বুঝে মনে হ'তে লাগলো—আঘি আছি কি নেই?—আছি কি নেই?

“আছে, আছে—এইখানে আছে!” বলে কানের কাছে কে একজন চীৎকার ক'রে উঠলো। আঘি চোখ চেয়ে দেখি, মানুষের দেহের মেদ-মাংস ছাঁড়িয়ে নিলে যেমন হয়, তেমনিতর একটা কঞ্জাল তার কাঠির মতো সরু-সরু লম্বা আঙুল নেড়ে ইসারা ক'রে কাকে ডাকছে। দেখতে-দেখতে ঠিক তারই ঝুঁড়ি আর-একটা কঞ্জাল লাফতে-লাফতে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর আর একটা!

শ্বিতীয় কঞ্জালটা আস্তে-আস্তে সরে আমার খৰ কাছে এসে ঘাড় হেঁট ক'রে আমায় দেখতে লাগলো। তার চোখের উপর চোখ পড়তে দেখলুম—না আছে পাতা, না আছে তারা, শুধু দৃঢ়ো গোল-গোল গহ্বর কালো কটকট করছে! সে আমাকে বেশ নিরাকীর্ণ করে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—“এই নাকি সে?”

প্রথম কঞ্জালটা বলে—“সে না তো কে?”

শ্বিতীয়টা বলে—“বেশ বেমালুম লুঁকিয়েছে তো, একেবারে চেনবার যো নেই!”

শেষ-কঞ্জালটা ছুটে এসে বলে—“কৈ, দোখি!” বলে তার হাড় বার-করা আঙুলগুলো দিয়ে টিপে টিপে আমায় দেখতে লাগলো।

“ও আর দেখছিস্ কি? ও সে-ই! আমার চোখে কি ধূলো দেবার যো আছে—হাজারই লুকোক না!” বলে প্রথম কঞ্জালটা এতখানি হাঁ ক'রে বিকট শব্দে হেসে উঠলো। ঘুঁথের ভিতর থেকে তার সেই সাদা সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধরলো।

শেষ-কঞ্জালটা বলে—“তবু একটু পরখ কোরে নেওয়া ভালো। কি জানি, সাদা ভুল হয়!”

প্রথম কঞ্জাল বলে—“নে, আর পরখ করতে হবে না; ওদিকে লম্ব বরে ঘায়!”

বলে সে আমার শিয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি ভাবলুম—ব্যাস্. এইবার আয়ার শেষ।

দেখতে-দেখতে বাকি-দৃঢ়ো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা-ন্দুখানা ধরলে, প্রথমটা মাথার দিক্টা ধরলে; তারপর তিনজনে মিলে মাটি থেকে চাঁদোলা করে আমার তুলে ফেলে। আমি তাড়াতাড়ি দৃঢ়াত দিয়ে গাছের গুড়িটা চেপে ধরে বলে উঠলুম—“কোথায় নিয়ে যান মশাই!”

তারা বল্লে—“বিয়ে দিতে!”

আমি চম্কে উঠে বল্লুম—“বিয়ে দিতে কি মশাই!—এই বুড়ো বয়সে?”

একজন বল্লে—“বুড়ো বয়ই আমরা পছন্দ করি।”

আমি বল্লুম—“মশাই, আমার চেয়ে তের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে ঘান্ না, আমার কেন মিছিমিছি কষ্ট দিছেন!”

প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে বলে উঠলো—“তুমি ভেবেছ, পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে? তোমাকে আমরা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবো।”

আমি বল্লুম—“আমি তো মশাই, পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই। সেই ছেলেবেলায় একবার পালিয়েছিলুম বটে; তারপর তো জ্যাঠামশাই পূর্ণিশ দিয়ে ঝেণ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেন।”

সে বল্লে—“আমরাও পূর্ণিশ এসেছি, ধ’রে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দেবো বলে।”

আমি কাঁচুচু হয়ে বল্লুম—“কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে পারব না।”

—“পারবে না কি? বিয়ে তোমায় করতেই হবে। এমন কি তোমার গো?”

বলে সেই পয়ঃস্না-ন্দেরের কঙ্কালটা ভীষণ গভর্জন করে উঠলো।

আমি বল্লুম—“রাগ করেন কেন মশাই? আমি ছাড়া কি পাত্র নেই? কত ছেলে হয়তো খুশি হয়ে বিয়ে করবে।”

সে বল্লে—“এত রাতে এখন ভালো পাত্র পাই কোথা? শার-তার হাতে তো যেয়ে দেওয়া যাব না? চল, লগ্ন বয়ে যাও।”

আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্লুম—“তাহলৈ নিতান্তই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে?”

শেষ কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম সূরে বল্লে—“দৃঢ় করছিস্. কেন ভাই ক্যাংলা?”

আমি তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম—“ক্যাংলা কে মশাই! আমি তো ক্যাংলা নই। আমি শ্রীয়াধবচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্ণ। আমার পিতার নাম ‘মধুসূদন চক্ৰবৰ্ণ।’”

প্রথম কঙ্কালটা হো-হো করে হেসে উঠে বল্লে—“রাধে মাধব! রাধে মাধব!”

আমি বল্লুম—“সে কি মশাই?”

সে বঙ্গে—“এই এত রাতে, এই শশানের ধারে একটা জ্যাম্ত শেঁয়াল-কুকুর থাকে না, আর মাধব চক্রবর্তী আছে। তুই এতই বোকা পেঁজি আমাদের?”

আমি বল্লুম—“এই তো আমি রয়েছি!”

সে বঙ্গে—“আরে ভাই, মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভিতর থেকে কথা ফইলেই কি তুই মাধব চক্রবর্তী হয়ে যাবি?”

আমি বল্লুম—“সে কি মশাই! মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভিতর আবার কে এলো?”

সে বঙ্গে—“আরে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্তীর শৈল্য দেহের মধ্যে সেৰ্বিয়ে আছিস, সে কি আমি টের পাইনি ভেবেছিস?”

আমি বল্লুম—“এমব কি হেঁয়ালি বকছেন মশাই? মাধব চক্রবর্তীর দেহের মধ্যে যদি ক্যাংলা এলো, তো মাধব চক্রবর্তী গেল কোথা?”

সে বঙ্গে—“আরে ভাই, বাম্বুনের ছেলে সে, বৈকুষ্ঠে গেছে!”

আমি বল্লুম—“না-য়াবেই সে বৈকুষ্ঠে গেল?”

সে বঙ্গে—“য়াবেছে না তো কি!”

আমি বল্লুম—“য়াবেছে কি রকম! সে য়াবে গেল আর টের পেলে না?”

সে বঙ্গে—“মানুষ কখন জ্ঞান আর কখন ঘৰে, সে তা টের পায় নাকি!”

কথাটা শৈল্যে বৈঁ ক'রে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমার অজ্ঞাতে আমি ঘরে গেলুম না কি—আঁ? সেই যে দেখলুম প্রথিবীর গা থেকে একে-একে সব ঘূছে আসছে—সেই কি আমার মৃত্যু না কি? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। হয়তো এ আমি নই—এ আর কার আস্তা আমার শৈল্য শরীর দখল করেছে। নইলে এই কঙ্কালগুলোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইতে পারতুম? জ্যাম্ত মানুষ কি কখনো তা পারে। কিন্তু মারা গেলুম কেমন ক'রে? আমার তো রোগ হয়নি। হয়তো এই বাঁধের উপর থেকে গাঁড়িয়ে পড়ার সময় পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে—আমি টের পাইনি।

ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঘূর্ণিয়ে যেতে লাগলো। কেমন মনে হ'তে লাগলো—না, আমি মাধব চক্রবর্তী নই। এয়া ঠিকই বলেছে—কাঙ্গালীচরণের আস্তা আমার শৈল্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে যসেছে। তাইতে আমার দেহের শ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্তীর জের ব্যাখ্যা এখনো চলছে। কিন্তু কাঙ্গালীচরণ লোকটা কে? আমি যদি কাঙ্গালীচরণ হব, তবে আমি আমাকে চিন্তে পারাছি না কেন? এরা তো চিন্তে পেরেছে!

প্রথম কঙ্কালটা বলে উঠলো—“কি হে ক্যাংলা, কি ভাবছ? বিরে করবা’র মাত্ত স্থির হলো?”

আমি বল্লুম—“আচ্ছা মশাই, আমি কি সত্যি কাঙ্গালীচরণ?”

সে খানিক আমার ঘুথের দিকে অবাক্ হয়ে চেঞ্জে—“সে কিরে ক্যালা, তুই নিজেকে নিজে চিনতে পারচিস্ না?”

আমি বল্লুম—“না।”

সে বল্লে—“সর্বনাশ হয়েছ! তুই আমাদেরও চিনতে পারচিস না?”

আমি বল্লুম—“একটুও না।”

সে বল্লে—“তোর মনে পড়ছে না—আজ এই আমাবস্যার দিনে ষষ্ঠিতে লগ্নে তোর বিশ্বে—রাগেশ্বরীর সঙ্গে?”

আমি বল্লুম—“কৈ, আমার তো কোনো বিশ্বের কথা হয়নি!”

সে বল্লে—“সে কিরে! তোর গায়ে-গোবর পর্বচন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না?”

আমি বল্লুম—“গায়ে-গোবর কাকে বলে?”

সে বল্লে—“তুই অবাক্ করলি। তোর কিছু মনে পড়ছে না? গায়ে-গোবরের দিন ভোর-রাত্রে তালপদ্ধুরে তুই মাছ মারতে বাছিলি তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে, তাল-গাছের মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে রাগেশ্বরী বৰ-পণের কড়ি বাচিল; তুই রাগেশ্বরীকে দেখতে পার্সন, সেও তোকে দেখতে পার্নি, তারপর তুই যেমন ঠিক তালগাছের তলাটিতে এসেছিস, অর্থন রাগেশ্বরীর পা-দুটো দল্লতে-দল্লতে তোর কপালে এসে ঠক্ করে লেগে গেল। রাগেশ্বরী তো লজ্জায় সাত-হাত ভিত্ত কেটে, মাথায় ঘোঁটা টেনে দৌড়! আর তুই বাড়তে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে এসে বাঁলি—ও-মেয়েকে আমি বিশ্বে করব না। কেন রে, কেন—কি হয়েছে? তুই বাঁলি—ওর পা আমার কপালে ঢেকেছে। তাতে হয়েছে কি? তুই বাঁলি—হয়েছে আমার মাথা আর মৃদু! বলে তুই ‘কপাল চাপড়াতে লাগলি! এসব তোর মনে পড়ছে না?’”

আমি বল্লুম—“মনে পড়ছে, এই রকম একটা গংপ যেন কোথায় শুনেছিলুম। তারপর কি হলো?”

সে বল্লে—“সর্বনাশ কৱ্লি! তারপরেও তোর মনে পড়ছে না? তারপর তো গুরুত্বাক্র এলেন; এসে বিধেন দিলেন যে, রাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঢেকেছে, তুই সাত-একে-সাতশোবার তোর পা দিয়ে তার মাথাটা খেঁলে দে, তাহলেই সব দোষ খণ্ডে যাবে। তুই বাঁলি—ওরে বাপ্ত্রে! রাগেশ্বরীর মাথায় লাধি-মারা! সে আমি পারব না!—বলে তুই ছুট দিলি!”

আমি বল্লুম—“তার পর?”

সে বল্লে—“তার পর আজ বিশ্বের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে-খুঁজতে এই শশান-ঘাটে এসে দোধি, তুই এই মাধব চক্রবর্ণীর ঘড়াটাকে দানা পাইয়ে বসে আছিস্। হাঁয়ে, এই মাধব চক্রবর্ণীকে ঘারা পোড়াতে এসেছিল, তারা গেল কোথায়? তোকে দেখে তায়ে পালিয়েছে বুঁফি?”

আমি বল্লুম—“মাধব চক্রবর্ণীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না?”

সে বল্লে—“তোর কিছই ঘনে পড়ছে না? তুই সাতি বলছিস্, না মন্দিরা করছিস্?”

আমি বল্লম—“তোমার দিবা, আমি সাতি বল্লাছি!”

সে বল্লে—“তবে সবৰ্বনাশ হয়েছে—তোকে মানুষে পেয়েছে!”

আমি বল্লম—“হানুমে পেয়েছে কি গো!”

সে বল্লে—“জানিস্, না ব্র্দীব, আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাঁপ, মানুষেও তেমনি আমাদের কারো-কারো ঘাড়ে চাপে। তুই যখন মাধব চতুবন্তীর দেহে সে-ধিরেছিলি, তখন বোথ হয় তার একটু খানি প্রাণ ছিল, সেইটোকে পেয়ে বসেছে!”

আমি বল্লম—“তাতে কি হয়?”

সে বল্লে—“মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিন্তে পারে না, আপনার লোককে চিন্তে পারে না, আবোল-তাবোল বকে, কট্মট্ ক'রে ঢোখ ঘুরোতে থাকে, আমাদেরও ঠিক তেমনি হয়। তাই তো তুই অমন করছিস্—নিজেকে চিন্তে পারিছিস্, না, আমাদেরও চিন্তে পারিছিস্, না!”

আমি বল্লম—“ও, তাই আমি নিজেকে ক্যাংলা বলৈ চিন্তে পারিছি না। ওগো, তবে আমার কি হবে?”

সে বল্লে—“যেমন বিয়ে করবো না বোলে পালিয়ে এসেছিস্, তেমনি ঠিক জন্ম!”

আমি বল্লম—“ওগো, আমি রাগেশ্বরীকে বিয়ে করবো—আমাকে উম্ধার করো!”

সে বল্লে—“তবে বেরিয়ে আয়—ওখন থেকে!”

আমি বল্লম—“বেরিব কি ক'রে গো?”

সে বল্লে—“পথ হারিয়ে ফেলেছিস্ ব্র্দীব? মৃদ্ধিকল করলি দেখাই! এক কাজ কর। মাধব চতুবন্তীর ঐ কেঁচার খুট-টা এই গাছের ডালে বেঁধে গলায় একটা ফাঁস দিয়ে তুই বুলে পড়—তাহলৈ সুড়েৎ ক'রে বেরিয়ে আস্তে পারবি!”

আমি আঁকে উঠে বল্লম—“ওরে বাপ্ৰে—সে বে ফাঁস! সে আমি পারব না!”

সে বল্লে—“ভয় কি! আমি তো কতবার ফাঁস গোছি! তোর কোনো ভয় নেই, তুই বুলে পড়!”

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বল্লম—“না গো না—সে আমি পারব না! গলায় ফাঁস দিতে কিছুতেই পারব না!”

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঞ্জালটা তার সেই কালো গত্তের মত ঢাখ-দুটোকে বন্ বন্ কোরে ঘৰিয়ে বল্লে—“কৰী, তুই ফাঁস যেতে পারব না! আমরা হলুম গলায়-দড়ে! তুই আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে এমন কথা বলিস্ বে, ফাঁস যেতে তোর ভয় হয়—কুলাঙ্গার কোথাকার!”

আমি কাঁচুমাটু হয়ে বল্লম—“কি করব, আমার যে ভয় কয়েছে!”

সে দাঁতের দু-পাটি কড়মড় করতে করতে বলে উঠলো—“ফের ঐ কথা! এই বেলা বুলে পড়, নইলে তোর ভালো হবে না বল্লাছি!”

আমি বল্ৰুম—“ওগো, তোমাৰ দৃটি পায়ে পাড়ি, আমি ফাঁসিতে কুলতে পাৱব না—আমাৰ ভয় কৰছে।”

সে আৱো রেণে বল্লে—“হতভাগা—কোথাকাৰ! দূৰ হ, আমাদেৱ সামনে থেকে দূৰ হ!” ব'লে সে তেড়ে আমাৰ ঘাৱতে এলো।

বিতীয় কঞ্জালটা এগিয়ে এসে বল্লে—“গাগ কৱেল কেন খুড়ো মশাই। ও হয় তো ক্যালা নয়! নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবে কেন?”

খুড়ো মশাই বল্লেন—“কৈ! ক্যালা নয় ও? আমি সাত-বছৰ টিক্টিকি প্ৰলিশে কাজ কৱেছি, কত বড়-বড় ফেৱাৰ পাকড়াও কৱেছি—আমাৰ ভুল হবে?”

শেৰ-কঞ্জালটা এগিয়ে এসে বল্লে—“যখন সল্লেহ হচ্ছে তখন একবাৰ পৱন ক'রে দেখতে স্ফৰ্তি কি দাদামশাই?”

দাদামশাই বল্লেন—“আছাৰ বেশ, পৱীক্ষা হোক্” ব'লে আমাৰ দিকে ফিরে বল্লেন—“কি হে, তুমি মাধব চৰুবতৌ, না কাঙালীচৰণ?”

আমি বল্ৰুম—“আজ্জে, আগে তো জানতুম আমি মাধব চৰুবতৌ, কিন্তু তাম্পৰ থেকে মনে হচ্ছে কাঙালীচৰণ।”

সে বল্লে—“কাঙালীচৰণ যদি হও, তুমি আমাৰ অবাধ্য হয়েছ ব'লে তোমাৰ শাস্তি নিতে হবে—তোমাৰ ফাঁসি দেবো আমৱা, এই শমশানে—এই গাছেৰ ডালে!”

আমি বল্ৰুম—“আজ্জে, আমি তবে মাধব চৰুবতৌ।”

সে বল্লে—“বেশ, মাধব চৰুবতৌ ব'লে যদি নিজেকে প্ৰমাণ কৱতে পাৰ, তাহ'লে তোমাৰ তিনবাৰ সেলাম ঠুকে আমৱা চলে যাব।”

—“আৱ যদি না পাৰি?”

—“তাহ'লে এইখানে তোমাৰ ঘাড় মটকে রেখে চলে যাব।”

—“ঘাড় মটকে দেবেন? সৰ্বদ'নাশ! এই বিদেশ-বিভু'য়ে, এই অচেনা জায়গায় এত রাস্তিৱে নিজেকে কি কৱে প্ৰমাণ কৱবো মশাই?”

—“না পাৰ, ঘাড়টি মটকে দেবো—শমশানেৰ ভূত হয়ে থেকো।”

সত্যি বল্ছি এই কথা শুনে আমি কেবল ফেল্লুম। তখন সেই বিতীয় কঞ্জালটা এগিয়ে এসে বল্লে—“ক'ন্দছ কেন? তোমাৰ এমন কোনো চিহ নেই, যাতে প্ৰমাণ হয়, তুমি মাধব চৰুবতৌ?”

আমি বল্ৰুম—“আছে। এই দেখ্ন, আমাৰ ডানহাতে একটা জড়লেৰ দাগ।”

সে হেসে বল্লে—“ও প্ৰমাণ তোমাদেৱ প্ৰলিশেৰ কাছে চলে, এখানে আমাদেৱ কাছে চলে না। কোন ভিতৱেৰ প্ৰমাণ দিতে পাৰ?”

আমি বল্ৰুম—“আমাৰ ভিতৱে কি আছে না আছে, আমি তো জানি না মশাই! এই দেখ্ন না, আমাৰ ভিতৱে কাঙালীচৰণ আছে, কি মাধব চৰুবতৌ আছে, আমি তাই ঠিক ঠাইৰ কৱতে পাৰাছ না।”

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীরভাবে বলে উঠলো—“কাঙালীচরণ হ'লে তোমায় ফাঁস দেবো কিম্বু !”

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম—“আজ্জে না, না, আমি মাধব চন্দ্রবন্তী !”

সে বলে—“শৌগ্রীগর প্রমাণ কর, নইলে ঘাড় মট্কালুম বলে !”

ম্বিতীয়ে কঙ্কালটা বলে—“অমন ষেবড়ে থাক কেন ? তোমার কি এমন কোনো গুণ নেই যাতে বোৱা যায় তৃতীয় মাধব চন্দ্রবন্তী ?”

আমি বলে উঠলুম—“হাঁ, আছে বৈ কি ! আমার একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পারি !”

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বলে—“তৃতীয় কবিতা লিখতে পার ? নিজে লেখ ? না পরের কবিতা নিজের বলে চালাও ?”

আমি বললুম—“না শশাই, আমি সে-রকম কবি নই !”

সে বলে—“তোমার কবিতা কাগজে ছাপা হয় ?”

আমি বললুম—“না, সম্পাদকরা ভয়ে ছাপেন না !”

সে বলে—“ভয়ে ছাপেন না কি রকম ?”

আমি বললুম—“আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীর যে, একবার সে-কবিতা ছাপলে পাঠকরা অন্য কবিতা পড়তেই চাইবে না। কাগজ ভাস্তু করা তখন দয় হয়ে উঠবে। এ-কথা এক সম্পাদক আয়ার নিজের মুখে বলেছেন !”

সে বলে—“আচ্ছা ! কৈ দোখ, একটা কবিতা লেখ দিকিন !”

আমি তখনই ওভারকেপ্টের পকেট থেকে আমার পকেট-বইখানা বার ক'রে বললুম—“আলো একটা চাই যে !”

সে বলে—“দীর্ঘ আলো !” বলে থানিকটা ধূলো-বালি একত করে একটা ফুল দিলে, আর অর্ধন আগুন জরলে উঠলো। আমি সেই আলোয় বসে লিখতে লাগলুম।

থানিকটা লিখেছি সে বলে—“কৈ, কি লিখলে পড় !”

আমি বললুম—“এখনও যে শেষ হৱান মশাই !”

সে বলে—“কবিতার আবার শেষ আছে না কি ? যা লিখেছ পড়—ফাজলামি করতে হবে না !”

আমি সূর কোরে পড়লুম—

“পঁড়িয়ে বিপদে তারা,

হয়েছি যা দিশে-হারা !

উদ্ধার এ-দৃঢ়-কারা-

গার হ'তে যা-জননী !

শ্বশানে বাসয়ে ডাকি,

ভয়ে যোরে শির-চাকি,

থাবি থার প্রাণ-পাখী,
শুন্য হৈরি এ ধরণী!
কোথা যোৱ গেহ-ঝাঁচা,
কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে মা, আমাৱে বাঁচা
দিয়ে তোৱ পা-তরণী!"

এইটুকু শেষ হতেই সে বল্লে—“তেৱ হয়েছে, তেৱ হয়েছে! এ-কম গান তো
আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদেৱ মুখে শুনোছি। এ তোমার নিজেৱ লেখা না, প্ৰৱান্গে
গান একটা মৃৎস্থ ছিল, তাই লিখে শোনোছি?”

আমি বল্লম—“না মশাই, এ আমাৱ নিজেৱ রচনা। একেবাৱে টট্টকা। এতে
আপনি প্ৰৱান্গেৱ গৰ্থ কোথায় পেলেন? দেখছেন না, একেবাৱে আধুনিক ধৰনেৱ
লেখা!”

সে বল্লে—“থাম, তোমাৱ আৱ জ্যাঠাপনা কৰতে হবে না। প্ৰৱান্গেৱ একটা গান
চুৱি ক’ৱে নিয়ে আমাৱ ফাঁকি দেবে ভেবেছ? তা হচ্ছে না। দৰ্দি তুমি কত বড়
ওস্তাদ! আমাৱ নাম দিয়ে একটা কৰিতা লিখতে পাৱ?”

আমি বল্লম—“খ্ৰু পাৰি। নাম দিয়ে আমি অনেক কৰিতা লিখেছি। তেনেৱ
নাম দিয়ে, ওষুধেৱ নাম দিয়ে, অনেক ভালো-ভালো কৰিতা আমাৱ লেখা আছে।
একবাৱে একটা জুতোৱ দোকানেৱ কৰিতা লিখে আমি প্ৰাইজ পেয়েছিলম। আপনাৱ
নামটা কি বলুন, আমি এখনি লিখে দিছিঁ।”

সে বল্লে—“আমাৱ নাম জাঁদ্ৰেল। লিখে ফেল দৰ্দি এই নাম দিয়ে একটা
কৰিতা চঠ ক’ৱে। ব্ৰুৰ কত বড় বাহাদুৰ তুমি!”

আমি কাগজ-পেম্সিল নিয়ে লিখতে শুৱ, কৱেছি মাত্ৰ, সে বল্লে—“কি লিখলে,
পড় হে! আমিও বড় কৰিতা দু-চক্ষে দেখতে পাৰি না।”

আমি বল্লম—“মশাই, আৱ একটু সময় দিন।” বলে আমি খস্ খস্ শব্দে
লিখে ঘেতে লাগলম।

একবাৱে একটু ধেমেছি, সে আমাৱ খাতাৱ দিকে বঁকে দেখে বল্লে—“উঁ,
অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবাৱে পড়ি।”

অগত্যা আমি পড়লম—

“রেল আছে, জেল আছে,
আৱ আছে কংবেলঃ
পাশ্ আছে, ফেল্ আছে,
আৱ আছে শ্ৰেল শেলঃ;
চোল আছে, চোল আছে,
আৱ আছে সারখেল

সব সে বড় হাস

জাদুরেল জাদুরেল !”

পড়া শেষ হ'তেই সে চীৎকার ক'রে উঠলো—“বাঃ, বাঃ, বেড়ে লিখেছ তো হে!
আর একবার পড় তো, আর একবার পড় তো !”

আমি আর একবার চীৎকার ক'রে পড়লুম—“রেল আছে, জেল আছে ইত্যাদি !”

সে আবার বল্লে—“বেশ হয়েছে ! চমৎকার হয়েছে ! শাও, প্রমাণ হয়ে গেল তৃষ্ণ
ক'ব মাধব চৰুবন্তৰ্ণ !”

আমি বল্লুম—“ঠিক বল্ছেন মশাই, আমি কাঙালীচিরণ নই ?”

সে বল্লে—“কাঙালীচিরণের চৌদপুরুষ এমন ক'বিতা লিখতে পারে না। সাধব
চৰুবন্তৰ্ণ না হ'লে এমন ক'বিতা লেখে কে ?”

আমি বল্লুম—“মশাই, আমার আর একটা ক'বিতা শুনবেন ? এই খাতায় লেখা
আছে—এই জয়পুরের শৌচ সম্বন্ধে !”

সে বল্লে—“কৈ, শোনাও তো দেখি !”

আমি ভাড়াতাড়ি পকেট-বইয়ের পাতা হাত-ডে ক'বিতাটা বার ক'রে পড়তে সুর-
করলুম—

“বস্তা-বস্তা পুঞ্জ-পুঞ্জ তৈরি হিম দেলো
ব্যোম-মাগে কে রচিল শীতের পাহাড় ?
লেপ-গাদি বালাপোষ সবৰ্দ্ধ বৰ্ষা ভেঙে
কম্প এমে ক'পাইছে শরীরের হাড় !
উত্থব-ফণা ক্রম্য শত নাগিনীর প্রায়
কগালে-কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিম্বা কোন পিশাচিনী উম্মাদিনী-সমা
তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকায় ক'রিছে কোতল !
অথবা কি মেষ-দৈত্য ছেঁড়ে শার্পনেল —”

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠলো—“ওরে ক্যাংলাকে পাওয়া গেছে !”

আমি চমকে উঠে, পড়া থামিয়ে ঢে়ে দেখি, আমার সামনের কক্ষাল তিনটে
লাফাতে লাফাতে ডিগ্বাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি
“রাম ! রাম !” বল্লতে বল্লতে সেখান থেকে উঠে পড়লুম। এতক্ষণ ‘রাম-নামটা’ বে
কেন ঘনে আসেনি’ কে জানে ?

আমি বেল-লাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দুটো কুলির সঙ্গে দেখা।
তারা বল্লে—“বাব, আপনাকে আমরা খঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেঁড়ে কোথায়
গিয়েছিলেন ?”

আমি আর কি বল্ব ? বল্লুম—“আমি এখানে ঐ ইয়ে হচ্ছিল কি না, তাই
একটু দেখাচ্ছিলুম !”

তারা বল্লে—“আপনার গাড়ি ঠেলে আমরা এই ওদিকে রেখে দিয়েছি। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিই।” বলে তারা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে।

আমি গাড়িতে উঠে বল্লম—“হাঁরে, গাড়িতে আলো-নেই কেন?”

সে বল্লে—“বিজ্ঞি বাঁচি আছে, মেল-গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বলবে।”

আমি বল্লম—“আমাকে একটা বাঁচি দিয়ে যেতে পারিস্?—বখশিশ দেবো।”

তাদের একজন ছুটে গিয়ে একটা বাঁচি এনে দিলে। আমি সেইটে সামনে রেখে পকেট-বই থেলে নিজের লেখা কর্বিতা পড়তে লাগলুম।



ফুকাল-জামায়ি

—হেমেন্দ্রকুমার রাম

উঃ—যালেরিয়ার মতন ছ্যাঁচড়া অসুখ প্রথিবীতে আর কিছু আছে কি? উই! এই দ্যাখ না, সখ্ ক'রে সেদিন ঢাকুরিয়ার 'লেক' দেখতে গিয়েছিলুম, সম্ম্যার একটু আগে। হঠাতে কাঁপুনি দিয়ে আঘাত জবর এল।

সেই যে-সে জবর, যে-সে কাঁপুনি? না পারি দাঁড়াতে, না পারি বসতে, একেবারে ঘাসের উপর পড়লুম শুয়ে। কী শীত রে বাপ্ত! পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেমন যেন আচ্ছেদের মত হয়ে রইলুম!

সেই ভাবে কতক্ষণ ছিলুম, ভগবান্ জানেন। তবে একবার চাদরের ভিতর থেকে

জন্ম-জন্ম ক'রে চোখ মেলে উঁকি মেরে দেখলুম, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারের মেলা
বসেছে, কোথাও জন-মানবের সাড়া নেই!

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কোথায় বাগবাজারে আমার বাড়ী, আর কোথায় পড়ে
আছি আমি, একজা! গুণ্ডায় গলায় ছুরি বসাতে পারে, সাপে কামড়াতে পারে,
বিনা-চিকিৎসার প্রাণপাখী ফুড়ুক ক'রে পালিয়ে যেতে পারে! বাড়ীর লোক এতক্ষণে
হয়তো ভেবে সারা হ'চ্ছে!

আর তো এখানে থাকা চলে না! যেমন ক'রেই হোক, আমাকে আজ বাড়ী
বেতেই হবে।

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। গায়ের ভিতর দিয়ে তখনো যেন আগন্মের ঝলক
ছ'টছে, তোধের সামনে দিয়ে যেন রাশি রাশি স'বে' ফুল নাচতে নাচতে একবার
অঁধাৱ-সাগৱে ভুবে যাচ্ছে, আর একবার ভেসে উঠছে! প্রতিবার পা ফেলি আৱ মনে
হয়, এই ব্ৰহ্ম আমি দাঁড়াও ক'রে পপাত ধৰণীতলে হলুম! তবু থামলুম না,
মাতলের মতন টল্লে টল্লে এগিয়ে চললুম।

রাত থাঁ থাঁ করছে! সেই রাতে আমি প্রথম বুৰতে পারলুম, প্ৰথিবী কত-
বেশী স্তৰ্য হতে পারে! সহৱের হট্টগোলে রাগ হয় বটে, কিন্তু এ স্তৰ্যতাৱ সহা
কৰা অসম্ভব! একটা ব্যাং, কি একটা বিং বিং পোকা, কি একটা পাহাড়াওমালার
নাক পৰ্যালত ডাকছে না, গাছের পাতার বাতাসের একটি নিঃশ্বাস পৰ্যালত শোনা
যাচ্ছে না! সারি সারি কোশ্পানীৰ আলোৱে থামগুলো নীৱে দাঁড়িয়ে জৰুৰত
চক্ষে যেন থ্রুমে অন্ধকারকে নিৰীক্ষণ কৰছে! তিমিৰ-তুলিৰ প্রলেপ-মাখানো
গাছগালার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীৰ পৱ বাড়ী দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তাৱাও যেন
প্ৰেতপুৰীৰ মতন নিস্তৰ্য—তাদেৱ ভিতৰ থেকে একটা ঘূৰ-ভাঙা খোকার কাষায়
আওয়াজ পৰ্যালত জেগে উঠছে না। কে যেন আজ নিদৃষ্টীৰ মল্ল প'ড়ে সমস্ত
জগৎকে বোৰা ক'রে দিয়ে গেছে।

জৰৱেৰ ঘোৱে চলেছিই তো চলেছিই—এই নিঃশব্দ পল্লী ছেড়ে সহৱেৰ শঙ্কেৰ
ৱাজো গিয়ে পড়াৰ জন্মে প্রাণ যেন আই-চাই কৰতে লাগল, তবু এ পথ আৱ শেষ
হতে চায় না। এ পথ যেন আজও শেষ হবে না, কালও শেষ হবে না—আমাকে
যেন কোন অভিশপ্ত আস্বার মতন চলতে হবে অনন্ত কাল ধ'ৰে! এক বেচাৱা
ইহুদীৰ গল্প পড়েছিলুম। কাৱ শাপে তাকে নাকি অনন্তকাল ধ'ৰে সারা বিশ্বে
ছ'টোছ'টি ক'রে বেড়াতে হয়েছিল। আমাৱও তাই হল নাকি?—

মাথাটা একবাব নাড়া দিয়ে ভাবলুম,—দ্বাৰ ছাই! এ-সব কি উচ্চত কথা
ভাৰছি? জৰৱে আমাৱ মাথা খাৱাপ হয়ে গেল নাকি?

মাৰে মাৰে এক-একটা মাঠ—যেন এক-একটা অন্ধকারেৰ মায়া-সৰোবৰ। সেখান
দিয়ে যেন অন্ধকারেৰ জেউ বইছে, অন্ধকারেৰ স্নোত ছুটে আসছে আমাকে গ্রাস
কৰবাব জন্মে! অন্ধকারেৰ তৱশেৰ ভিতৰে গাছগুলোকে দেখাচ্ছে যেন বড় বড়

অচুত যত ভূতের গন্ধ—

কঙালের টক্কাৰ



—“যা লিখেছি পড়— ফাজলামি কৰতে হবে না।”

অঙ্গুত ষত ভূতের গন্ত—

কঙ্কাল-সারথি



“এই বেলা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও গো !”

দেন্ত্য-দানবের মত—পাইকের হৃৎপাণ্ড হিঁড়ে থাবার জন্যে তারা ওৎ প্রেতে প্রস্তুত হয়ে আছে। কামা-ভরা কল্কনে বাতাস এসে চূপচূপ ঘেন আমার কাণে কাণে বলে থাক্কে—ওহে নিখুঘ রাতের অজ্ঞান মানুষ! এ মতৃপুরীর ভিতর দিয়ে কোথায় চলেছ তুমি? আমার কথা শোনো, ভূত-প্রেতরা একে একে জেগে উঠছে, এই বেলা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও গো!...

আরো খানিক অগ্রসর হয়ে মনে হ'ল, পৃথিবীর সমস্ত শব্দ এসে আমার দ্বাই পাসের দ্বাই জুতোর ভিতর আশ্রম নিয়েছে। প্রত্যেকবার পা ফৈলি, আর সেই শব্দগুলো জুতোর ভিতর থেকে চমকে উঠে, রাজপথের উপরে আছাড় থেকে পঁড়ে আমাকে চমকে চমকে তোলে! শব্দ শুনতে চাই, নিজের পাসের শব্দ পাছিছ; কিন্তু কেন জানি না, সে শব্দ শুনে শুনে মন আমার খুসি হবে কি, আরো বেশী নেতৃত্বে পড়তে লাগল!—সে যেন রাজপথে ঘূমল্ত কোন অশরীরী প্রেতাষ্মার চীৎকার, আমার পদাঘাতে সে যন্ত্রণায় গজ্জ্বলে উঠছে!

* * * *

আঃ! এতক্ষণ পরে ঝসা রোডের মোড়ে এসে পড়লুম। অশ্বস্তির নিঃখ্বাস ফেলে ট্রামওয়ের একটা লোহার থামে ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলুম।

এখানটাও তেমনি নিঞ্জর্ণ ও তেমনি নিষ্পত্তি হলেও আমার মন ঘেন অনেকটা আরাম পেলে! এই তো ট্রামের রাস্তা, এই পথ ধরে সিধে গেলেই—বত মাইল দ্বারেই থাক্—আমাদের পাড়া বাগবাজার পাওয়া যাবেই যাবে! খানিক দূর এগুতে পারলেই লোকজনেরও সাড়া পাব নিশ্চয়, আর ট্রাম ও বাস বৰ্দ্ধ হলেও ট্যাঙ্ক মেলাও তো অসম্ভব নয়!

তখন জরুর আমার চোখ ছল-ছল করছে, কাগ করছে তোঁ-তোঁ, আর খাথা ঘুরছে বোঁ-বোঁ করে! বার বার ইচ্ছে হ'তে লাগল পথের উপরে লম্বা হয়ে শুধে পড়বার জন্যে; কেবল বাপ-মায়ের বিষণ্ণ ঘৰের কথা ভেবেই মনের সে ইচ্ছা দমন করলুম, অনেক কষ্টে। নিজে-নিজেই বললুম, মন, তুমি শালত হও! এই পথের শেষেই আছে তোমার বাড়ী, তোমার আন্তীয়স্বজন, তোমার মরম তুল-তুলে বিছানা! কোন বকমে চক্র মুদে এই পথটুকু পার হ'তে পারলেই—ব্যাস, সকল কষ্ট সকল ভাবনার অবসান!

হঠাতে দূর থেকে একটা শব্দ জেগে উঠে চারদিকের নিষ্পত্তির মুখে ঘেন ভাষা দিলে। ঘড়-ঘড়, ঘড়-ঘড় করে একটা বাঞ্জ-ডাকার মতন শব্দ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে...তারপরেই শুলুম ভেপ্পুর আওয়াজ—তোঁপ, তোঁপ, তোঁপু, তোঁপ!

ট্যাঙ্ক, না বাস?

আহ্যাদে চাখা আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাঁকিয়ে রইলুম।

তারপরেই দেখা গেল, নীচে দুটো আর উপরে একটা আলো। তিনটো আলো দেখেই বুরলুম...ট্যার্জি নয়, বাস্ আসছে!...তাহলে জরুর ধমকে আঁষি ভুল বুরেছিলাম, বাস্ যখন চলছে তখন রাত খুব বেশী হয়নি! কিন্তু আশ্চর্য, এরই মধ্যে এ-অঞ্চলটা এমন ভয়ানক নিষ্ঠত্ব হয়ে পড়ে? বাবা, আমার কল্কাতার গোলমাল বেঁচে থাক্, এ-অঞ্চলে আবার ভদ্রলোক বাস করে?

কিন্তু বাসের আলো অত বেশী জরুর কেন? সামনের সারা পথে সে বেন আগন্তুনের ডেউ বইয়ে ছুটে আসছে! আর এই নিরালা পথে অত জোরে ভেঁপু বাজাবারই বা দরকার কি? এ-অঞ্চলের সন্ধ্যের পরেই ঘৃমকাতুরে সোকগুলোর কাণে যে তালা ধৰে যাবে।

উচ্চরণাসে ছুটতে ছুটতে ধূলোয় ধূলোয় পথ অল্ধকার ক'রে একখানা রাঙ্গা টক্টকে ছ্রস্ত-বড় বাস্ আমার কাছে এসে হঠাত দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন তৌর, তৌক্, স্বরে চেঁচায়ে উঠল,—“ধৰ্ম্মতলা, ওয়েলেস্‌লি, শ্যামবাজার!”

আঁষি তাড়াতাড়ি বাসে উঠে একখানা গদীমোড়া আসনের উপর গিয়ে ধূপ্ ক'রে বসে পড়লুম। হোক্, শ্যামবাজারের বাস, এই স্তৰ্য মড়ার মহল্লক থেকে এখন তো স'রে পাড়ি! শ্যামবাজার থেকে বাগবাজার পায়ে হেঁটে যেতে এমন বিশেষ দৈরিং লাগবে না।

...

কিন্তু কেন জানি না, বাসের ভিতরে ঢুকেই আমার বোধ হ'ল, আঁষি বেন এক জগৎ ছেড়ে আর এক অচেনা জগতের ভিতরে প্রবেশ করলুম!

বাস্ ছুটছে, তার ভেঁপু বাজছে। এত বেগে বাস্ ছুটছে, তার জান্মাগুলো সব খোলা রয়েছে, অর্থ বাহির থেকে বাতাসের একটুখানি ঝলক পর্যালত আমার গায়ে লাগছে না! ভারি অবাক্ হয়ে গেলুম। আমার জরুর কি এত বেশী উঠেছে বে, দেহের অনুভব করবার ক্ষমতাটুকুও আর নেই?

পথ তেরিনি নিঞ্জন আর নিঃসাড়। কিন্তু বাতাসও কি আজ ঘৃন্ময়ে পড়েছে? আমার খালি মনে হতে লাগল, দম বন্ধ হয়ে সারা প্রাংখণী আজ মারা পড়েছে—তার কোথাও আর জীবনের লক্ষণ নাই। বেঁচে আছি খালি আঁষি, ও এই বাসের ড্রাইভার আর কণ্ডাঙ্গাৰ।

আমরা তিনজন ছাড়া বাসের ভিতরেও কোন আরোহী ছিল না। ধাকবেই বা কেন? এত রাতে কার ঘাড়ে ঢৃত চাপবে বে, বাসে চ'ডে বেড়তে বেরবে!

বাসে ভেঁপু, বাজছে, আর বাজছে, আর বাজছে! কাণ যে আলাপালা হয়ে গেল! কণ্ডাঙ্গাৰের দিকে ফিরে বিরক্ত স্বরে বললুম—“ড্রাইভারকে বারণ করে দাও। পথে সোকও নেই, গাড়িও নেই,—তব্ এত ‘হ্ৰ’ বাজছে কেন?”

লোকটা শিখ। মন্তব্দি লম্বা দেহ, মন্তব্দি দাঢ়ি। সে কালা আৱ বোবাৰ মত আমাৰ পানে তাকিয়ে রইল।

আবাৰ বললুম—“শন্ত? ‘হণ’ দিতে বাবণ কৰ!”

সে তবু জবাৰ দিলৈ না, ড্রাইভারকে ‘হণ’ থামাতেও বললৈ না। লোকটা সাত্য-সাত্যই কালা ও বোৰা নাৰ্কি? কিন্তু না, তাই বা হবে কি ক'রে? এই অৰ্থনিক আগেই তো সে “ধৰ্ম্মতলা, গৱেলেস্টলি, শ্যামবাজাৰ” ব'লে চেঁচিয়ে পাড়া মাং কৰছিল।

সে বোধ হয়, আমাৰ কথাৰ জবাৰ দিতে চায় না। এৱা কি ভেবেছে, এদেৱ ভেপুৰ আওয়াজে সারা সহৱেৱ ঘূৰ ভেঙে যাবে, আৱ তাহলৈই সবাই বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে এসে বাসেৰ প্যাসেজোৱ হয়ে বসবে?

কিন্তু সহৱ জাগবাৰ কোন লক্ষণ প্ৰকাশ কৰলৈ না। পথেৰ আশেপাশে নেড়ী কুকুৰগুলো আৱাৰ ক'রে কুণ্ডলী পাৰ্কিয়ে শৰে ঘূমোচ্ছিল, কিন্তু এই বাসেৰ সাড়া প্ৰেয়েই তাৰা তাড়াতাড়ি উঠে, ল্যাজ প্ৰেটেৱ তলায় চৰ্কিয়ে ছুট পালাতে লাগল—মহা-ভয়ে কেউ কেউ ক'ণ্ট ক'ণ্ট ক'ৰে ক'ণ্ডতে ক'ণ্ডতে!... আজকে বাইৱেৱ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কেবল এই কুকুৰগুলোৰ কাছ থেকে, কিন্তু তাৰাও দেখা দিয়েই অদৃশ্য হচ্ছে!

কুকুৰগুলো কেন আমাদেৱ বাস দেখে পালাচ্ছে? মনেৰ ভিতৱ্যে কেবল এই প্ৰশ্নই জাগতে লাগল—কেন? কেন? কেন?

কণ্ডাঞ্চিৱ কেন আমাৰ কথাৰ জবাৰ দিচ্ছে না?—কেন? কেন? কেন? কেন? ড্রাইভাৰ কেন কুমাগত ভেপুৰ বাজাচ্ছে?—কেন? কেন? কেন?

...

...

...

...

কণ্ডাঞ্চিৱ দিকে ফিরে বললুম, “তোমাৰ ভাড়াৰ পয়সা নাও!”

সে মন্ত একথানা কালো হাত বাড়ালৈ। ভাড়া দিয়ে টিৰ্কিট নেবাৰ সময় আমাৰ হাতে তাৰ হাতেৰ ছৰীয়া লাগল—ঊঁ, অৰ্মান মনে হ'ল কে যেন একথানা তৌক্য বৱফেৱ ছৰী দিয়ে আমাৰ হাতে খাঁচ ক'ৰে খোঁচা মারলৈ। জ্যান্ত মানুষেৰ হাত এমন ঠাণ্ডা কন্কনে হয়!

আশচৰ্য হয়ে তাৰ মুখেৰ দিকে তাকালুম! তাৰ লম্বা চুল আৱ দাঢ়ি-গোঁফেৰ জগলে ভৱা মুখথানা বাস-মড়াৰ মুখেৰ মত স্থিৱ। তাৰ চোখেও পলক পড়ছে না। তাৰ চোখ যেন পাথৰে গড়া!

আমাৰ বুকটা গুড়গুড় কৱতে লাগল। আজকেৱ সহৱেৱ এই নিঝৰ্ণনতা, প্ৰথিবীৰ এই নিঃশব্দতা, বাতসেৰ এই অভাৱ, ভাড়াটে বাসেৰ এই ভেপুৰ আওয়াজ, কণ্ডাঞ্চিৱ এই উদাসীন ধৰ্ম্ম—সমন্তই যেন রহস্যময়, সমন্তই বেন অস্বাভাৱিক।

ক'ৰি কুকশেই আজ বাড়ীৰ বাইৱে পা দিয়েছি!

ষষ্ঠবার ফিরে তাকাই, ততবারই কন্ডাঙ্গোরের সেই মড়ার মত স্থির মূখ আর পলক-হারা পাথুরে দ্বিতীয় চোখে পড়ে! কেমন একটা অমানুষিক ভাবে আমার মনটা ছেমে গেল—আর সহ্য করতে পারলুম না—সামনের বেশের উপরে, দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে চোখ ঘূমে আর্মি চুপ করে বসে রইলুম। ভাবলুম, শ্যামবাজারে পেঁচবার আগে আর মাথা তুলে চাইব না!

কিন্তু মাথা তুলতে হল—আবার চোখ খুলতেও হল।

আধ ঘটার বেশী সময় কেটে গেছে, গাঢ়ীও না থেমে ক্রমাগত ছুটছে, তবু এখনও শ্যামবাজার এল না কেন?

মূখ তুলে জান্মা দিয়ে মূখ বাড়িয়ে আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। শ্যামবাজার তো অনেক দূরের কথা, গাঢ়ী এখনো ভবানীপুরেই আমে নি! অর্থ গাঢ়ী এত বেগে ছুটছে যে, পথের দ্বি-পাশের বাড়ীগুলো তৌরের ঘতন পিছনে সারে সরে যাচ্ছে! এও কি সম্ভব?

হতভয়ের ঘতন মূখ ফিরিয়েই দেখি, গাঢ়ীর ভিতরে দশ-বারোজন লোক বসে রয়েছে! নিজের চোখকেও আর্মি বিশ্বাস করতে পারলুম না!

আমি হলপ করে বলতে পারি, একজনের ভিতরে গাঢ়ী একবারও থামে নি, তবু কেখেকে এরা এল, কখন এরা গাঢ়ীতে উঠল?

একে একে সকলকার ঘূর্খের পানেই তারিয়ে দেখলুম, সব মূখই মড়ার ঘতন স্থির, নির্বিবর্কার! সব চোখের পাথুরে দ্বিতীয় আড়ত হয়ে আছে। কে যেন শ্মশান থেকে করেকটা ঘৃতদেহ তুলে নিয়ে এসে বেশের উপর সারি সারি বসিয়ে দিয়ে গেছে!

তাদের ভিতরে বাঙালী আছে, খোট্টা আছে, সায়েব আছে। কিন্তু তারা সবাই চেঁরে আছে আমার দিকেই। সে চার্টানিতে কোন ভাবের আমেজ নেই, সে-চার্টানি যেন চাউলিই নয়—অর্থ সে চার্টানি দেখলেই গা ছম্বুক করে, দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাব! তাদের চার্টানি যেন চোখের ভিতর দিয়ে আসছে না,—আসছে আলোকের উপর ওপার থেকে, অশ্বকারের আঘাত ভিতর থেকে, যে-দেশে জ্যান্ত মানুষ নেই, সেই দেশ থেকে! ভাবহীন অর্থ ভয়ানক তাদের সেই চাউলি!

আর এক আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, গাঢ়ীর ঝাঁকুনিতেও তাদের কারূর দেহ একটুকুও নড়ছে না! গাঢ়ীর ভিতরে বসেও তাদের দেহ যেন গাঢ়ীকে না ছুঁয়ে শুন্যে বিরাজ করছে! মনে হচ্ছে লাগল, আমার অঙ্গাতসারে যেমন হঠাত তারা গাঢ়ীর ভিতরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তের্বাঁ হঠাত তারা আবার হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারে, আমার অজ্ঞানেই! যেন তারা ছায়ার কামাহীন অন্ধচর—দেখা দেয়, ধরা দেয় না। তাদের দেখা যাব, ধরা যাব না।

আমার সভ্য দ্বিতীয় আবার পথের দিকে ফিরিয়ে নিলুম। গাঢ়ী তেমনি হেঁচকি-তোলা আওয়াজের ঘতন ডেপুর শব্দ করতে করতে তৌরবেগে ছুটছে

—কিন্তু তখনো ভবানীপুর আসে নি! আমি শ্যামবাজার, না সোজা হগলয়ের দিকে চলেছি?

কি এক দৃঃসহ, অজনা টানে অঙ্গুর হয়ে চোখ আবার গাড়ীর ভিতরে ফেরালুম! গাড়ীতে ইঠিমধ্যে লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে উঠেছে—তারাও স্থির-নেত্রে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে!

সঘস্ত গাড়ীর ভিতরে একটা বোটকা গন্ধ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—যেন ধাসি ঘড়ার গন্ধ! হাসপাতালের ঘড়ার ঘরে গিয়ে আমি একবার এই রকম গন্ধই পেয়েছিলুম!

আমার সবর্বাঙ্গে কাঁটা দিলে, বুকের কাছটা শিউরে শিউরে উঠতে লাগল —আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি?

আর থাকতে না পেরে হঠাতে চেঁচিয়ে উঠে বললুম, “এই কণ্ডাক্ষীর, গাড়ী বাঁধো!”

কণ্ডাক্ষীর কোন সাড়া দিলে না, গাড়ী আমাবারও চেষ্টা করলে না।

আবার বললুম, কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

রেগে দাঁড়িয়ে উঠে কণ্ডাক্ষীরের দেহ ধরে আমি নাড়া দিতে গেলুম—কিন্তু তাকে ছুঁতেও পারলুম না। ঢাঁকের সামনে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাইছি, কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে পারিছি না—সে-দেহ যেন হাওয়া দিয়ে তৈরী!

হঠাতে গাড়ীর সব লোক একসঙ্গে অটুহাস্য সু-বু-ক'রে দিলে! সে অস্তুত বীভৎস হাসি আসছে যেন অনেক দ্রু থেকে, অনেক আকাশ-বাতাস ভেদ ক'রে, অনেক সম্মু-প্রান্তির পার হয়ে, অনেক নরকের অশ্বকারে ঢুব দিয়ে—অথচ তার আওয়াজ এত স্পষ্ট যে, আমার কাণ যেন ফেটে যাবার মত হ'ল!

আমি পাগলের মত চীৎকাৰ ক'রে ব্যথুম, “গাড়ী থামাৰ, জল্দি গাড়ী থামাৰ,—এই ড্রাইভাৰ!”—গাড়ী-থামানো ঘটার সৰ্ব ধৰে আমি ঘন ঘন নাড়তে লাগলুম!

ড্রাইভাৰ এতক্ষণ পৰে আমার দিকে ঘূৰ ফেরালৈ—সে-ঘূৰে এক তিলও শাস্ত নেই, সে-ঘূৰ সাদা-ধৰথে হাড়ের ঘূৰ—নাক-চোখের জায়গায় তিন-তিনটে গন্ত, দণ্ড-ঠেঁটের জায়গায় দণ্ড’ সারি দাঁত বেৰিয়ে আছে।

এতক্ষণ তবে এই পোৰাক-পৱা কঙ্কালটাই গাড়ী চালিয়ে আসছে?

গাড়ীর ভিতরে অটুহাসিৰ আওয়াজ আরো বেড়ে উঠল!

আর সহিতে পারলুম না—সেই ভীষণ অটুহাসি শুনতে শুনতে আমি একেবাবে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

জান ইলে দেখলুম, নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছি, আমার চারপাশে বসে
মা, বাবা, ভাই-বোনেরা।

শুনলুম, আমি নাকি রসা রোডের ফ্লটপাথের উপরে জরুর ঘোরে বেহুস
হয়ে শুরোচিলুম।

কালকের রাতের বিভীষিকার কথা সকলকে বললুম।

বাবা বললেন, “ও-সব বাজে কথা। জরুরের কৌকে ‘লেকে’র ধার থেকে রসা
রোড পর্যান্ত এসেই তুমি বেহুস হয়ে পড়েছিলে। তারপর ঐ-সব খেয়াল
দেখেছ!”

কিন্তু আমার মন বলতে লাগল—না, না, আমি যা দেখেছি, তা খেয়াল নয়!



গুলি

—চার্ট, বন্দ্যোপাধ্যায়

গোকুল ষথন বাবু বাবু তিনবাবু চেষ্টা কৰিয়াও এফ-এ পাশ কৰিতে পারিল না, তখন তাহার বাবা বাললেন—তোর লেখাপড়া কিছু হবে না, তুই একটা চাকরী কর। কিন্তু গোকুল তাহার পাঠ্য প্রস্ততকে পর্ডিয়াছিল ‘বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মীঁ’। সে ঠিক কৰিল, দাসত করা কিছু নয়; বাণিজ্য কৰিয়া লক্ষ্মীঠাকুরুণকে রাতারাতি লোহার সিল্দুকে বন্দী কৰিতে হইবে। তাহাদের গ্রামের বিধু বাগচি কয়লার কারবার কৰিয়া বড়লোক হইয়া উঁঠিয়াছে—গাঁয়ের লোকের ভাষায় বালতে গেলে আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে। সূতরাং সেই বাঁধা রাস্তা দিয়া লক্ষ্মীঠাকুরুণের বাহনটিরও আসতে কোন ক্রেশ ও আপত্তি না হইবারই কথা মনে কৰিয়া গোকুল কয়লার ব্যবসা আৱস্থ কৰিয়া দিল।

বছৰ-তিনেক ধৰিয়া হাজার পনৰ-কুড়ি ঢাকা লক্ষ্মীৰ বাহনটিকে দ্বৰ আওয়াইল, কিন্তু কিছুতেই লক্ষ্মীৰ দৰ্শন মিলিল না। তখন দেনার দায়ে সবৰ্ষৰ বৰাকৱেৱ কয়লার খাদে বিসজ্জন দিয়া একথানি মাত্ৰ দা কোনমতে বাঁচাইয়া গোকুল গজভূক্ত

কাপথের মতো বাড়ী ফিরিয়া আসিল। গোকুল মনে মনে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল হে, তাহার বাবা তাহাকে লোকসানের জন্য যদি অতিরিক্ত রকমের তিরস্কার করেন, তবে সে এ দার্শন গল্প দ্বাইয়া ব্যবসার শেষ দিয়া জীবনেরও শেষে একটি রন্ধবণ দাঁড় টানিয়া দিবে।

কিন্তু গোকুল আচর্ষ্য হইয়া দৰ্শিল, তাহার বাবা তাহাকে ব্যবসায়ে লোকসানের সম্বন্ধে না রাখ না গল্প কিছুই বলিলেন না, সহজ সাধারণভাবেই তাহাকে কুশল-প্রশ্ন করিয়া বাড়ীতে আদুর করিয়া প্রশংস করিলেন। গোকুল হাঁপ ছাঁড়িয়া বাঁচল—ধাক্। বাবা তা হলে রাগ করেন নাই।

গোকুল নিশ্চিন্ত হইয়া প্রকুরের মাছের ঘুড়ো ও বাড়ীর গাইয়ের ঘন-আওটানো দৃশ্য খাইতে লাগিল।

একদিন তাহার বুড়ো বাবা কৌচার টেরিটি গায়ে দিয়া গোয়ালঘরের আগত মেরামত করিতেছিলেন; গোকুল সামনে-খাটো পশ্চাতে-লম্বা ছিটের শার্ট গায়ে দিয়া বাণিষ্ঠ-করা চকচকে পাতলা হাত্কা চাঁটিজোড়কে পায়ে করিয়া টানিয়া লইয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। বৃড়া একবার ছেলের পাশ-পিছন চাঁচা চুলছাঁটার বাহার ও লম্বা-বুলের ফ্যাসান-দুর্বস্ত শাটের দৃশ্য পকেটে হাত ভরিয়া দাঁড়াইবার কাষদা দৰ্শিয়া লইয়া বলিলেন—বাবা গোকুল, তোমার সেই বিশ হাজার টাকা দামের দা-খানা একবার এনে দাও ত, আগড়খানা বেঁধে ফেলি!

গোকুল চোখমুখ লাল করিয়া বিশ হাজার টাকার দা-খানি বাবার সামনে রাঁখখানা দিয়া আঙ্গুষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল। বৃশ্য বলিলেন—যাও বাবা, বিধু বাগাচির বৈঠকখানায় গিয়ে বোসো গে; এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, লোকে দেখলে ভাববে, বাবু, জন খাটাচ্ছে!

গোকুলের সামনে সেই দা-খানা চকচকে দাঁত মেলিয়া পড়িয়া পর্দিয়া হাসিতেছিল। গোকুল অল্পক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দৰ্শিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

গোকুল যেমন ছিল, তেমনি এক ছুটে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বরাবর টেশনে গেল এবং একখানি বরাকরের টিকিট করিয়া গাড়ীতে চাঁপিয়া বসিল। গোকুল পল করিয়া বাড়ী ছাঁড়িয়াছে, যেমন করিয়া হোক টাকা উপার্জন করিতে হইবে। কেমন করিয়া? তাহা সে জানে না।

গাড়ীর কাঁকানি খাইয়া মগজের মধ্যে ভাবনা-চিন্তাগুলা একটি ধিতাইয়া গেলে গোকুল ঠিক করিল, বিনা মূলধনের ব্যবসা করিতে হইবে। এমন কোন্ ব্যবসা হইতে পারে? গোকুল ঠিক করিল, ডাঙ্কারী করিবে। কঘলার ব্যবসা-সম্বন্ধে তাহার বেমন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ছিল, ডাঙ্কারী-সম্বন্ধেও তেমনি; সুতরাং তাহার কাছে কঘলার ব্যবসা করা আর ডাঙ্কারী করা দৃশ্যই সমান। বরাকরে ব্যবসার স্তো অনেক চেলশোনা হইয়াছে, রাতোরাতি পেসারটা জমিয়া ঘাইতে পারে বই কি!

গোকুল আপনার সেই প্রাতল পোড়ো ঘরে, কেরোসিনের বাজে আশমারী

গড়াইয়া দ্বৃষ্টা-চারটা শিশি-বোতল রং-করা চিরেতার জল কুইনিন সইয়া ডাক্তার হইয়া
জাঁকিয়া বসিল। কয়লার আড়তদার গোকুলবাবুকে রাতারাতি ডাক্তারবাবুতে পরিগত
হইতে দেখিয়া বরাকরের লোকেরা আশ্চর্য হইল, শৰ্ম্মিতও হইল।

অল্পদিনেই গোকুল ব্ৰহ্মল, বৰাকরের লোকদের সে যতটা বোকা ভাবিয়াছিল,
তাহারা ততটা বোকা নয়। বৰাকরের লোকের রোগ হয় নিষ্ঠয়, কিন্তু গোকুল-
ডাক্তার একটা রোগীরও দেখা পায় না। একে রোগীৰ সম্মান নাই, তাহার উপর
মৃদি, গোয়ালা কেহই আৱ ধারে উঠনা জোগাইতে চাহে না, তাহারা বাকী টাকার
তাগাদা আৱশ্যক কৰিল। তাহারা এই গোকুলের কত টাকা বাইয়াছে, কিন্তু এমনি
নিয়মকহারাম তাহারা, একটুও যদি চক্ষুলজ্জা রাখে! একটুও যদি খাতিৰ-ৱেয়াৎ
কৰিয়া চলে। গোকুল বৰাকরের লোকগুলোৱ উপৰ হড়ে হড়ে চিটৰা উঠিতে লাগিল।

আগে গোকুল মনে কৰিয়াছিল, চেনাশোনা জায়গায় তাহার পসার জৰ্মবে
ভালো; এখন ঠেকিয়া ব্ৰহ্মল, ঠকাইতে হইলে অচেনা জায়গাতেই সুবিধা অধিক।
গোকুল চাঁটিবাটি তুলিয়া মৰ্ম্মিকল-আসানেৰ আশা কৰিয়া আসানসোলে গেল।

বৰাকরে লোকেৰ সঙ্গে চেনাশোনা হইয়া গিয়াছিল, সেখানে মৃদি ধারে উঠনা
দিত, গোয়ালা ধারে দৃধ ঘোগাইত। আসানসোল একেবাৰে নিৰ্বাল্পত্ব দেশ; পকেট
শূন্য। গোকুল স্থিৰ কৰিল, আগে একখানি ভালো দেখিয়া বাঢ়ী ঠিক কৰিতে
হইবে; সেই বাঢ়ীতে জাঁকাইয়া বসিয়া সকলেৰ কাছে পসার কৰিয়া লইবে।

গোকুল বাজার ছাড়াইয়া আসিয়া দেখিল একখানি ছোট দোতলা বাঢ়ী, তাহার
চারিদিকে পাঁচল-ঘেৰা হাতা এবং সেই হাতায় একটু বাগানেৰ মতো রাহিয়াছে।
দেখিয়া তাহার লোভ হইল। বাঢ়ীখানি খালিই আছে, ভাড়া পাওয়া গেলেও
পাওয়া ষাহিতে পারে। গোকুল অগস্তৰ হইয়া দেখিল, একজন হিন্দুস্থানী চাকু
চারপাইয়েৰ উপৰ বসিয়া পৰম উল্লাসে গান কৰিতেছে—

“ভালো বাস্তে এসে কান্ব কেনে সই!”

গোকুল তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বাঃ জ্যাদারসাহেব! তুমি ত
তোফা বাংলা গান কৰতে পার? এমন বাংলা তুমি শিখলৈ কেমন কৰে?

হিন্দুস্থানাটি প্ৰথমে ‘জ্যাদার’ সম্বৰাধনে খুস্মী হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার
উপৰ তাহার ভাষাশিক্ষার কৃতিত্বেৰ প্ৰশংসা শৰ্নিয়া একেবাৰে গদ্গদ হইয়া পৰ্যাজ।
একমুখ দাঁত বাহিৰ কৰিয়া বলিল—হাঁ বাৰ, অনেক দিন বাংলা মূলকমে থাকা
কৰিয়েসে কিনা, উস্ত লিয়ে বাংলা সিখিয়েসে। ইখানকার আদমি-সব বোলে কি
—পৱিত্ৰে, তুমি তো বাঙালী হোয়ে গেলো, তুমি তো বাঙালী হোয়ে গেলো!

গোকুল বলিল—হাঁ জ্যাদার-সাহেব, তুমি ত বহুত আছা বাংলা শিখেছ, গানও
ত খ'ব সন্দৰ কৰতে পার। তুমি গান কৰ, শুনি!

পৱিত্ৰেৰ একমুখ হাসিয়া চারপাইয়েৰ একপ্রাণে সৰিয়া বসিয়া বলিল—গান
শুন্বেন ত বোসেন বাৰ,

গোকুল বাসিল। পরমেশ্বর দুই হাতে দুই কান চাপিয়া ধরিয়া গাহিতে
লাগিল—

‘ভালো বাস্তে এসে কান্ব কেনে সই!...’

গান শেষ হইলে গোকুল বালিল—বাঃ ক্যা তোফা গলা তোমার! আর কি
সন্দর গান!

পরমেশ্বর গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া বালিল—হাঁ বাব, গানঠো বহুত আচ্ছা
আসে! ইয়ে হার্ম বহুৎ কোঞ্চে কোরে সিখিয়েসে!

—আচ্ছা জমাদার সাহেব তুমি বুঝি এই বাড়ীর বাবুর জমাদার?

পরমেশ্বর বালিল—হাঁ ইয়ে বাড়ী ত লক্ষ্মীকান্ত বাবুকে আসে, হার্ম ইখানকার
বাগানের তদারক করি!

গোকুল বালিল যে, পরমেশ্বর জমাদার আসলে বাগানের মালী। গোকুল
বালিল—লক্ষ্মীকান্তবাবু এই বাড়ীতেই থাকেন? কৈ, বাড়ীতে ত কোনো লোক
দেখছি না?

—না, বাব, ই বাড়ীতে থাকে না, ঐ চৌরাহার পর যে বড় মোকান আসে, ঐ
বাড়ীতে বাবু থাকে।

—তুমি একলা তবে এই বাড়ীতে?

—নেহি বাব, হামরা-লোগই বাড়ীতে কোই থাকে না—ই বাড়ীমে
বহুত ভূতের ডর আসে, সোন্খা হোয়, আউর হামরা সব ভাগি।

গোকুল আনন্দিত হইয়া বালিল—বল কি জমাদারসাহেব! তবে ত আমাকে
এই বাড়ীতে থাকতে হল। আমি ভূতের ওৱা! বাবুকে বলে তুমি ধীর ঠিক
করে দিতে পার, তা হলে আমি ভূত ভাগিয়ে বাড়ী ভালো কৰে দিতে পারি।

পরমেশ্বর তটিথ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বালিল—আপনি গুণী আসে!...
আলবৎ বাবসে হার্ম বাড়ী দিলিয়ে দিব। এই বাড়ী ত এইসেই বন্দ পড়ে থাকে।

গোকুলচন্দ্ৰ পরমেশ্বরের স্মৃতিৱাসে লক্ষ্মীকান্তবাবুৰ কাছ হইতে বাড়ীখানি
দখল কৰিবার অনুমতি অতি সহজেই পাইল। বাড়ীতে ভয়ানক ভূতের ডর, কেহ
এ বাড়ী ভাড়া লইতে চায় না; গোকুলবাবুৰ ঝাড়ফুকে বাড়ীটিৱ দূর্নীম ধীর
ঘোচে, তবে গোকুলবাবুকে বৈশিষ্ট্য কিছু ভাড়া দিতে হইবে না। প্রথম যাস বিনা ভাড়ায়,
তারপরও টিকিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে এক বৎসর পাঁচ টাকা ভাড়ায় থাকিবেন;
তারপর যাবৎ থাকিবেন, সাত টাকা ভাড়া কয়েমি রাখিল।

গোকুল সানলে সেই বাড়ী দখল কৰিয়া বাসিল। অম্বিন শহীদৰ রাষ্ট্র হইয়া
গেল যে, একজন খুব গুণী ভাস্তাৰ লক্ষ্মীকান্তবাবুৰ ভূতুড়ে বাড়ী ভাড়া লইয়াছে।
সে যখন ভূত ভাগাইতে পারে, তখন রোগ ভাগাইবে যে, তাহা এমন আৱ আৰ বৈশ
আশচৰ্য্যা কি!

গোকুল পরমেশ্বরকে তাহার কাছে থাকিবার জন্য অনুরোধ কৰিল; পরমেশ্বর

ডাগডেরবাবুর ভূত ভাগাইয়ার মন্তব্য শিখিতে পাইবার প্রলোভনেও সেই বাড়ীতে রাণিবাস করিতে কিছুতেই রাজি হইল না; অগত্যা গোকুলকে একাই আকিতে হইল।

প্রথম রাণিতে ভয়ে ভয়ে গোকুলের ঘূর্ম হইল না। প্রভাতে উঠিয়াই গোকুল দেখিল, সে বাঁচিয়া আছে কি না, ইহাই দেখিবার জন্য লক্ষ্যীকান্তবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ইতর-ভদ্র বহুলোক বাড়ীর বাহিরে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গোকুলের জাগরণক্লিন্ট মুখ দেখিয়া লক্ষ্যীকান্তবাবু, জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ডাক্তারবাবু, খবর কি?

গোকুল বলিল—উঃ মশায়! সে ভয়ানক! ভাঁগাস্ আমি বাড়ীর চৌহন্দী-বন্দী করে ধূলোপড়া দিয়ে রেখেছিলাম, তাই আমি বেঁচে আছি।

লক্ষ্যীকান্তবাবু, বলিলেন—তা হলে ত আপনি খুব বড় গৃণী বলতে হবে। আমি আনেক টাকা খরচ করেছি মশায়, কিন্তু কোন গৃণী এ বাড়ীতে এক রাণিরও বাস করিতে পারোন—কেবল এক মহেশপুরের কালীগুণী তেরাস্তির ছিল.....

তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবুকেও তেরাস্তিরের বেশ থাকিতে হইবে না।

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—আচ্ছা, দেখা যাক!

একজন বলিল—শৰ্নি-মঙ্গলবাবুর কেটে যাবে, তবে জানব যে, হাঁ, গৃণী বটে!

গোকুল শৰ্দুল বলিল—কাল ত মঙ্গলবাবু। আচ্ছা, কাল একবার কলিকাতালের পিশাচাদাপন মন্ত্রটা দিয়ে ঘাটবন্দী করে নেওয়া যাবে।

শ্বিতীর রাণি কাটাইয়া গোকুল দেখিল, সে বাড়ীতে এক ইংদুরের উপন্থৰ ছাড়া আর কিছুই উপন্থৰ নাই। কেন যে সে-বাড়ীটার ভৃত্যে অপবাদ হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তবে এইটুকু বুঝিতে পারিল যে, গৃণীরা শৰ্দুল ভরেই সে-বাড়ীতে থাকিতে পারে নাই। বাড়ীর ভিতর গরম ও ইংদুরের হটেপাটি হয় বলিয়া, সে রাণে খাটিয়া আনিয়া খোলা বাগানের মধ্যে তোফা নিয়া দিল।

বুধবার সকাল হইতে-না-হইতে গোকুলের বাড়ীর ফটকের সামনে লোকারণ্য! সকলে স্থির করিল, ভূতে খাটিয়াসুন্ধ ডাক্তারবাবুকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ঘাড় ঘটকাইয়া চালিয়া গিয়াছে। সকলেই পরস্পরকে নিকটে গিয়া গোকুলের অবস্থা দেখিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ আর সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। এক পা আগাইয়া তিন পা পিছাইয়া যখন জনতা গোকুলের ফটকের কাছে কলরব করিতেছিল, তখন গোকুলের ঘূর্ম ভাঙ্গল—গোকুল খড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। অর্মান সকলে “বাবারে” বলিয়া ছুটিয়া পশ্চাশ হাত পিছাইয়া গেল। যাহারা অসমসাহসী, তাহারা আবার অগ্রসর হইয়া গিয়া ডাকিল—ডাক্তারবাবু!

গোকুল অস্তি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বালিল—আর অশার! এ সবর্দমেশে বাড়ী! বাবা!

সকলে অর্মনি জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—কেন! কি হয়েছিল? খাটিয়া-সুখ টেনে...

গোকুল তাহাদের মধ্যের কথা কাড়িয়া সহিয়া বালিল—উঃ! একেবারে বাইরে এনে এক আছাড়।

—তারপর গলা...

—হাঁ—গলা টেপে আর কি! এমন সময়ে গুরুর আশীর্বাদে কণ্ঠ-কণ্ঠুয়ন মল্ল ঘনে পড়ে গেল। যেমন 'হং হং কঠ কঠ কণ্ঠুয়ন' বলা, আর অর্মনি সব দণ্ডনাড় করে দিলে দোড়—ঘেন সমস্ত পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে! অর্মনি আমি মুর্ছিত হয়ে পড়লাম...

—সমস্ত মন্ত্রটা আর আওড়ানো হল না?

—না, কৈ আর হল? মুর্ছায় একেবারে দাঁতকপাটি!

সকলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তবে বাঁচলেন কেমন করে? ভূত ফিরে এল না?

গোকুল বালিল—ফিরবে কি! মন্ত্র থে ঘনে পড়ে গিছল, ঘনের মধ্যে ত সবচেয়ে উঠেছিল! আর, ধারালো মন্ত্রের গোড়ায় থোঁচাটা খেয়েই বাছাধনেরা মজা টের পেয়ে গেছেন; বুঝে গেছেন যে, আমার সঙ্গে চালাকি নয়!

ডাঙ্গারবাবুর খাতি ও পসার হং হং করিয়া বাঁড়িয়া চলিল। একে ডাঙ্গা, তায় গুণী, তায় ব্রাঙ্গণ—রোগ হইলে কুইনিন-গোলা চিরেতার জল, মন্ত্রল্পের বাড়-ফুঁক, শাস্তি-স্বত্ত্বালন, সমন্তের জনাই ডাক পড়ে গোকুল ডাঙ্গাকে। গোকুলের এখন রাজাৱ হাল। কিন্তু এখনও সামনে শনিবার। শনিবার আবার অমাবস্য। সেদিনটা ভালোৱ ভালোয় উৎৱিয়া গেলে তবে বোৰা যাইবে যে—হাঁ!

লক্ষ্মীকান্তবাবু, শনিবার প্রাতে জিজ্ঞাসা করিলেন—ডাঙ্গারবাবু, কেমন ব্ৰহ্মচৰণ?

গোকুল বালিল—ব্ৰহ্মিত বড় সুবিধের নয়। তাতে আবার কপাল-কুণ্ডলিনী তত্ত্বখনা বাঢ়ীতে ফেলে এসেছ...

—তবে! আজ যে শনিবার!—

—তাই ত. ভাৰাছ!...

—তাতে অমাবস্যা!

—তাই ত। তবু দেখা থাক, কতদূৰ কি হয়...

—না না, ডাঙ্গারবাবু, অভটা সাহস কৰবেন না! ঠিক কৰে ভোবে দেখল, তাজ সামলাতে পারবেন ত?

গোকুল দৃঃই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া বালিল—আজ্ঞে, গুরুর

আশাবর্দাদে আর মা-কালীর ঝাড়ার কৃপায় পারব ত মনে হচ্ছে। আজকে সন্ধি-বেলা থেকেই কুলার্গ-তল্লের মতে প্ৰৱচারণ কৰে ভূতশুদ্ধি আৱ ভূতাপসারণ কৰতে হবে।

লক্ষ্মীকাল্তবাবু বলিলেন—হাঁ হাঁ, এই ভূতশুদ্ধিৰ কথা যা বলিলেন, ওতে মহেশ-পুরেৱ কালীগণী খ্ৰু ওস্তাদ! তাকেও আনিয়ে নেওয়া যাক, কি বলেন? আপনারা দুজনে তবু একটা জোৱ বাধেৰে ত?

গোকুল প্ৰমাদ গণিল। গৃহী আসিয়া তাহার গৃহ সমস্ত ফাঁস কৰিয়া না দেৱ! তথাপি মুখে বলিল—তা বেশ ত! আপনার আনতে ইচ্ছা হয়, আনন্দ; কিন্তু কিছু দৰকার ছিল না।

লক্ষ্মীকাল্তবাবু বলিলেন—তা হোক ডাঙ্গাৰবাবু, কথায় বলে সাবধানেৱ বিবাশ নেই। আজকে যে বড় ভয়ানক দিন!

গোকুল গম্ভীৰ হইয়া বলিল—তা বটে! কিন্তু কালীগণী কি খ্ৰু জৰুৱ গৃহী?

লক্ষ্মীকাল্তবাবু, বালিলেন—উঃ, বলেন কি? তাৰ টিৰিকতে জট! তিনি বাঁ-হাতেৱ তিনি আঞ্চলে ধৰে ঝড়াৱ মাথাৱ ঘৰ্ণিলতে মদ খান।

গোকুল চক্ৰ বিস্ফোরিত কৰিয়া বলিল...ওঃ! তবে ত ছন্দত গৃহী।

বিকেল নাগাদ কালীগণী আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মীকাল্তবাবুৰ বৈষ্ঠকথানায় গোকুলেৱ ডাক পড়িল। গোকুল গিয়া দোখিল, এক-বৈষ্ঠকথানা লোকেৱ মধ্যে একজন লোক বাসিয়া আছে, সে গৃহী না হইয়া যাব না—তাহার দুই হাতে দুই তামাৱ তাগায় আঠাৱো গণ্ডা মাদুলি; তাহার গলায় রূদ্রাক্ষেৱ মালা, হিংলাজেৱ মালা, হাড়েৱ মালা, স্ফটিকেৱ মালা, মূসলমান ফুকিৱেৱ তসবীমালা; তাহার প্ৰত্যেকটাতে এক-একটা মাদুলি, একটা তামা-বাঁধানো আমড়াৱ আংটি, একটা আংটি, সূতায় ঝড়ানো নানাৰিধি জড়ি-বৃটি; তাহার কোমৰেৱ ঘন্সিসতে একটা বসা পয়সা, তিনকড়া কাণা-কড়ি, একটা নার্ভিশথ, একটা কুঁঘীৱেৱ দাঁত, একটা বাবেৰ নথ, আৱ তাৰ সঙ্গে গোটাকতক মাদুলি ঝূলিতেছে; তাহার মাথাৱ টিৰিকটি একটি জট, তাহার শেষ প্রান্তে একটি মাদুলি জটেৱ পাকে কাৰোমি হইয়া আটকাইয়া রহিয়াছে; তাহার পৱণে লাল চেলী, কাঁধে লাল চেলীৱ উন্তুৰীয়, কপালে রঞ্জ-চৰ্দন ও সিঁদুৱেৱ ফেঁটা।

গোকুল দোখিল, কালীগণী লক্ষ্মীকাল্তবাবুৰ হাত দেখিতেছে। লক্ষ্মীকাল্তবাবু, বলিলেন—আস্ন ডাঙ্গাৰবাবু, গৃহীকে আপনার হাতটা একবাৱ দেখান।

গোকুল উহাকে গৃহী বলিয়া স্বীকাৱ না কৰিবাৱ জন্য তাহাকে গৃহী মাৰিয়া বলিল—কালীপদবাবু, কি-মতে হাত দেবেন?

কালী একটু বিৰক্ত হইয়া বলিল—কি-মতে দেৰি, তা আপনি কি বুৰবেন? আপনি কি এ শাস্তি কিছু আলোচনা কৰেছেন?

গোকুল বালিল—তা-একটু-আধটু করেছি বৈ কি!

লক্ষ্মীকান্তবাবু বালিলেন—আপনি গৃণতে পারেন, তা ত আমাদের এতদিন
বলেননি?

গোকুল গম্ভীর হইয়া বালিল—নিজের বিদ্যের কথা কি নিজের মুখে বলতে
আছে?

লক্ষ্মীকান্তবাবু, তাড়াতাড়ি আপনার হাত কালীর হাত হইতে ছাড়াইয়া
লইয়া গোকুলের সম্মতে প্রসারিত করিয়া ধরিয়া বালিলেন—ডাঙ্গারবাবু, আমার
হাতটা একবার দেখ্বুন।

কালী গোকুলের উপর ঘনে ঘনে চঁটিল। গোকুল লক্ষ্মীকান্তবাবুকে বালিল—
হাত দেখতে হবে না, আমি এমানই বলে যাচ্ছি।

লক্ষ্মীকান্তবাবুর শ্রদ্ধা চিংগুল বাড়িয়া গেল।

কালী বালিল—ওঁ! আপনি ইন্দ্রান-চরিত, কাঞ্চ-চরিত-মতে গোশেন দেখ্বুন।
গোকুল বালিল—আপনি জানেন?

কালী গম্ভীর হইয়া বালিল—হাঁ, জানি বটে, তবে ততটা অভ্যাস নেই।

গোকুল লোক-পরম্পরার লক্ষ্মীকান্তবাবুর সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনিয়াছিল,
তাহাই আবছা আবছা অস্পষ্ট করিয়া বালিলা ভাবিষ্যতের সু-খ-দুঃখ, সম্পত্তি-বিপত্তির
খুব একটা জল্বা ফল্দ নির্ভর্যেই দিয়ে গেল।

গোকুলের বিদ্যা দেখিয়া লক্ষ্মীকান্তবাবু ত অবাক! কালীরও কৌতুহল
হইল, অন্যোধ করিল যে, তাহারও অদ্ভুত গণিয়া বালিলতে হইবে।

গোকুল প্রমাদ গণিল—এবার বুঝি সকল বিদ্যা ফাঁস হইয়া যাও!

গোকুল বালিল—গুণ্ণলোকের অদ্ভুত বলা বড় শক্ত! তাঁরা নিজের বিদ্যার
প্রভাবে হয়কে নয়, আর নয়কে হয় ক'রে তোলেন কিনা! বিশেষ এ'কে দেখ্বুন
জবর গুণ্ণী!

কালী খুসী হইয়া গেল। তথাপি লক্ষ্মীকান্তবাবু ও সে পীড়াপীড়ি করিয়া
ধরিল—তবু দেখ্বুন, সব না মিল-ক, কিছু ত মিলবে।

গোকুল আবার ওজুর করিল—জানেন ত গণনা প্রভাতে জল ছেঁবার আগে
যেমন হয়, ভরাপেটে তেমন হয় না!

কালী বালিল—হাঁ, তা বটে। তবু...

তবুর পর গোকুলের আর এড়াইবার উপায় রহিল না। গোকুল চোখ পাকাইয়া
কালীর দিকে কটমট করিয়া চাহিল। কালীর দ্রুতি অর্থন নত হইয়া পড়িল।
গোকুল বালিল, সে ভীরু ও দুর্বৰ্ত প্রকৃতির লোক—উহাকে ধরিয়াইয়া অনেক কাছ
হাঁসিল করা যাইবে। গোকুল ধরিয়াইয়া বালিল—আমার চোখের দিকে তাকিয়ে
থাকুন।

କାଳୀର ଚୋଥ ହିଟିଯିଟ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଗୋକୁଳ ଶୂନ୍ୟାଛିଲ ସେ, କାଳୀଗୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାର ବାମ୍ବୁଳ, ଗୁମ୍ଫା-ପାଡ଼ାତେଇ ତାହାର ବାସ । ତାଇ ଆନ୍ଦାଜେ ଗୋକୁଳ ବଲିଲ—ଏକବାର ଛେଲେବେଳୋର ଆପନାର ଏକଟ ଖୁବ ବଡ଼ ଫାଁଡ଼ା ଗେଛେ, ଭାଗେ ଭାଗେ ବେଚେ ଗିର୍ବାଲେନ; ଏକଟ ଗର୍ବ ଆପନାକେ ଗର୍ବତୋତେ ଏମୋଛିଲ—

—ହଁ ଠିକ, ମା କୋଲେ ତୁଲେ ନିଯେ ପାଲିଯେ ଏମୋଛିଲେନ ।

ଗୋକୁଳ ବିରଙ୍ଗ ହଇଯା ବଲିଲ—ଆଃ ! ଆପନିବ ବଲଛେନ କେନ, ଓ ତ ଆମିଇ ବଲବ ! ସକଳେର ମନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୀ ଭାବିଯା ଉଠିଲ ।

ଗୋକୁଳ ଆବାର ଖାନିକଙ୍କଣ ତାକାଇଯା ତାକାଇଯା ବଲିଲ—ଏକବାର ଉଚୁ ଥେକେ ପଡ଼େ ଗିଯେ ଖୁବ ଆଶାତ ପେରେଇଲେନ...

—ଆଜେ ହଁ, ଗାଛ ଥେକେ...

ଗୋକୁଳ ଆବାର ଧରକ ଦିଯା ବଲିଲ—ଆଃ ! ଆବାର ବଲଛେନ, ଓ ତ ପରେ ଆମିଇ ବଲବ !

କାଳୀ ଅପ୍ରମ୍ଭତ ହଇଯା ବଲିଲ—ଆଜ୍ଞା, ବଲିନ ଦେଖ କି ଗାଛ ?

ଗୋକୁଳ ମୁର୍ମିକଳେ ପାଇଁଗଲ । ଏକଟ ଚୋଥ ପାକାଇଯା ଭାବିଯା ବଲିଲ—ମେ-ଗାଛେ ବର୍ଜାଦିତ୍ୟ ଛିଲ, ଗାଛେ ପା ଠେକାତେ...

କାଳୀ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳିତ ହଇଯା ବଲିଲ—ହଁ, ଠିକ ବଟେ, ମେଟା ବେଲଗାଛ ।

ଗୋକୁଳ ଆବାର ଧରକ ଦିଯେ ବଲିଲ—ଆଃ ! ଆମାକେ ବଲତେ ଦିଜେନ କହି ? ଗାଛର ନାମ ତ ଆମ ବଲତେ ଯାଇଛିଲାମ । ଆଜ୍ଞା, ଅତୀତେ ଗଣନା ଦେଖେ ବିଶ୍ଵାସ ହଲ ତ ? ଏଥିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲି...ଆପନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧ୍ୟଟା ତେମନ ଭାଲୋ ଯାଛେ ନା...

ମାନୁଷ ପ୍ରାୟଇ ବର୍ତ୍ତମାନେ ସ୍ମୃତି ଥାକେ ନା; ସେ ଅତୀତେ ଓ ଭାବିଷ୍ୟତର ଦିକେ ତାକାଇଯା ତାକାଇଯା କେବଳଇ ଦୀଘିନିଃଶ୍ଵାସ ଫେଲିତେ ଥାକେ । ଇହା ଭାବିଯାଇ ଗୋକୁଳ ବଲିଲ—ଆପନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ତେମନ ଭାଲୋ ଯାଛେ ନା...

କାଳୀ ଅମିନ ବଲିଯା ଉଠିଲ—ହଁ, ଠିକ ବଲେଛେନ, ଆମ ଭାରୀ ଝଞ୍ଜାଟେର ମଧ୍ୟେ ମନେର ଅମୃତେ ଆଛି ।

ଏକ-ବୈଠକଥାନା ଲୋକ ସକଳେଇ ଡାଙ୍ଗାରବାବୁର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ଦେଖିଯା ଏକବାରେ ଘୁମ୍ଫ ହଇଯା ଗେଲ । ସକଳେ ମନେ ମନେ ଆର୍ଟିଯା ରାଖିତେଇଲା, ଏହି ଗୁଣୀ ଡାଙ୍ଗାରବାବୁଟି ଛାଡ଼ା ଆର କାହାକେବେ ଦିଯା ଚିକିଂସା କରାନୋ ନାୟ ।

କାଳୀ ବଲିଲ—ତାରପର ?

ଗୋକୁଳ ଘୁମ୍ଫ ଧରାଇଯା ଦୀଘିନିଃଶ୍ଵାସ ଫେଲିଯା ବଲିଲ—ତାରପର ? ଆଜକେ... ଥାକ୍, ସେ ଆର ଶୁଣେ କାଜ ନେଇ ।

ସକଳେ କୌତୁଳ ଏକେବାରେ ଉଂସକ ହଇଯା ଉଠିଲ । ସକଳେଇ ବ୍ୟାପାର କି ଜାନିବାର ଜନ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଗୋକୁଳ ଅନେକ ଇତିହାସ କରିଯା ମେନ ଅଗତ୍ୟ ବଲିଲ—ଆଜକେ ଏକଟ ବିଶେଷ ରକମ ଫାଁଡ଼ା ଆଛେ ଦେଖିଛ । ଆପନି ପୂର୍ବ-ଜନ୍ମେ ସେ ଜାନୋଯାର ଛିଲେନ, ସେଇ ତୁତ ଆଜକେ ଆପନାକେ ତାଡା କରିବ ।

কালীর মৃথ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গোল। তবু সে ক্ষীণস্বরে বালিল—প্ৰৱৰ্জন্মেৰ কথা আপনি কোন্ শাস্ত্ৰেৰ নিম্নৰেশে বলছেন? সে-ৱৰকম কি কোনো শাস্ত্ৰ আছে?

গোকুল গম্ভীৰ হইয়া বালিল—আপনি গৃণীয়ানুৰ, আপনাই বলুন, সে কোন্ শাস্ত্ৰ?

কালী বালিল—হাঁ, গুৱাদেৰ বলতেন বটে, এই ৱৰকম শাস্ত্ৰ আছে, যাতে ক'ৱে প্ৰৱৰ্জন্মে কে কি ছিল, আৱ পৱজন্মে কে কি হবে, তা বলা যায়। আপনি কি সে-শাস্ত্ৰ দেখেছেন?

গোকুল বালিল—দেখেছি বৈ কি! আমাৰ গুৱাদু তিবৰত থেকে সে-শাস্ত্ৰ অনৈছিলেন। তাৰ নাম ঘটোঞ্চাটিনী অদ্বিতীয়সারিণী তল্প।

কালী বালিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ, গুৱাদেৰ ঐৱৰকম একটা প্ৰকাণ্ড কটমট নাম কৱতেন বটে!

তখন সকলে জেদ কৱিতে লাগিল—বালিতে হইবে কালীগৃণী প্ৰৱৰ্জন্মে কি ছিলেন, পৱজন্মে কি হইবেন।

কালীৰ মৃথ চুন হইয়া গিয়াছে। সে আৱ কোনো কথা বলে না। তাহা দেখিয়া গোকুলেৰ একটু দয়া হইল, সে বালিতে ইতস্ততঃ কৱিতে লাগিল। আবাৰ সকলে জেদ কৱায় গোকুল বালিল—এত লোকেৰ সামনে...

লক্ষ্মীকাল্তবাদু বালিলেন—লোকেৰ সামনে বলতে কি শাস্ত্ৰে নিষেধ আছে?

—না, শাস্ত্ৰে ঠিক নিষেধ নেই; তবে...

তখন সকলে কলৱ কৱিয়া উঠিল—তবে আৱ কি? আপনি বলুন।

গোকুল যথাসাধা চেষ্টায় খুৰ গম্ভীৰ হইয়া বালিল—গৃণী প্ৰৱৰ্জন্মে গুৱাদু ছিলেন, আৱ-একটা গুৰুকে গুৰুত্বে মেৰে ফেলিছিলেন; সেইজন্য তিনি গয়লাৰ বাঘুন হয়ে জল্মেছেন; আৱ সে ভূত হয়ে শৰ্ণিবাৰে অমাৰস্যাৰ সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে!

লক্ষ্মীকাল্তবাদু বালিলেন—আজই ত শৰ্ণিবাৰ অমাৰস্যা!

কালী বালিল—গো-ভূত! সে যে ভয়ানক! সে আবাৰ মন্তৰ মানে না!

গোকুল তাঁছিলোৱ হাসি হাসিয়া বালিল—ভয় কি, আমি আছি!

তখন সকলে আশ্বস্ত হইয়া কালীগৃণীৰ পৱজন্ম শৰ্ণিবাৰ জন্য বাস্ত হইয়া উঠিল।

গোকুল গম্ভীৰ হইয়া বালিল—আপনি কোনো ধোপাকে মেৰেছেন বা মারবেন...

কালী ভীত হইয়া বালিল—হাঁ, মেৰেছি বটে! এই পৱশু। কেন, কি হবে বলুন দেখি?

গোকুল বালিল—আপনি আসছে জল্মে গাধা হয়ে জল্মাবেন।

সতা একেবাৱে অবাক, নিষ্ঠত্ব!

গোকুল হাসিয়া মনে মনে বালিল—আর এ-জল্লে এখানকার সব কর্ণাটই গাধা হয়ে
জল্লেছেন দেখতে পাচ্ছি!

গোকুলের এই বিদ্যা জাহির হইবার পর আর কেহ গোকুলকে নিজেদের অস্ত্র-
গন্তা করিতে অন্যরোধ করিতে সাহস করিল না। কে যে বানর ছিল এবং কে যে
হন্মান হইবে, তাহা জানিতে বড় কাহারো উৎসাহ দেখা গৈল না।

সভার কেহ কথা কহে না দেখিয়া গোকুল কথা পাড়িল; চিন্তা করিয়া কাহাকেও
তাহার গন্তা-শান্তির গৃহ উপার্যটি ধরিতে দিতে সে চার না। সে বালিল—তারপর
গুণীয়শার; আজকের কি ব্যবস্থা করেছেন?

কালী বালিল—মনে করাছ কুলকুল-চক্রের উপর ভূতাপসারণী হোষ্টা করব।
কি বলেন আপনি?

গোকুল বালিল—হাঁ, সেটা ত করতেই হবে, ঠিক আমিও এই কথাটি আপনাকে
বলব তাবাহিলাম। আপনি ত তা' হলে ইন্দ্র গুণী। এতক্ষণে আমি আপনার পরিচয়,
পেলাম। ও-হোম ত বেন্সে লোকে করতে জানে না, পারেও না, করতেও নেই...

কালী গম্ভীর হইয়া বালিল—হাঁ, তল্পে নিষেধ আছে।

গোকুল বালিল—হাঁ, আছেই ত।...আচ্ছা, আমি বলি কি এই সঙ্গে অকড়ম-চক্রে
বসে পিশাচ-বিহুবগ মল্লাটা জপ করলে হব না?

কালী গম্ভীর হইয়া বালিল—হাঁ হাঁ, অতি উত্তম! আমি হোম করব, আপনাই
মল্লাটা জপ করবেন।

গোকুল বালিল—আচ্ছা, তাই হবে। আমাকে ত আবার গো-কৃত-বিতাড়িনী
মল্লাটাও জপ করতে হবে। একটা গো-কৃত-বিদ্বীনী কৰচ লিখে আপনার টিকিতে
বেঁধে দেবো।

কালীর ঘূৰ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গৈল। তাহা দেখিয়া গোকুল তাড়াতাড়ি
বালিল—একটা আঘাকেও ধারণ করতে হবে।

কালী বালিল—আপনার ত শিখা নেই দেখছি।

গোকুল বালিল—আমার গুরুসম্পদার নিঃশিখ।

কালী বিজ্ঞের ঘত মাথা নাড়িয়া বালিয়া উঠিল—ও! আপনারা তাহলৈ
তিব্বতীয় আশ্রমের!

গোকুল হাসিয়া বালিল—আপনার দেখছি সমস্ত খবরই জানা আছে।

কালী গম্ভীর হইয়া বালিল—শ্রীগুরুর প্রসাদে।

গোকুল কৃত তাড়াইবার অন্ত্যনের একটা ধূৰ লম্বাচৌড়া ফল্দ' করিয়া দিল
এবং সেই ফল্দ' কালীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বালিল,—গুণীয়শার, দেখন, কিছু
ছাড়-টাড়, হল কি না?

কালী ফল্দ' একবার চোখ দুলাইয়াই বালিয়া উঠিল—করেছেন কি? আসল
জিনিষই ভুল!

ଗୋକୁଳ ବଲିଲ—କି ମଶାର ?

କାଳୀ ବଲିଯା ଉଠିଲ—କାରଣ !

ଗୋକୁଳ ହାସିଯା ବଲିଲ—ଓଃ ! ଓ ଜିନିଷଟା ଆମାଦେର ଗୁରୁ-ସମ୍ପଦରେ ଚଲେ ନା କି ନା...

କାଳୀ ବଲିଯା ଉଠିଲ—ଠିକ ଠିକ, ଆପନାରା ସେ ତିବଦ୍ତୀ ସମ୍ପଦାର ! ଆପନାରା ସ୍ଵ-ତାଙ୍କୁ ଚାରେର କାଥ ପାନ କରେନ ବଟେ ! କିନ୍ତୁ ଚା-ଓ ତ ଫଳ୍ଦେ ଧରେନ ନି !

ଗୋକୁଳ ବଲିଲ—ଚା ଆମାର ବାସାର ଆଛେ, ଓ ନେଶାଟୋ ଆମାକେ ନିର୍ମାତି ଦ୍ୱାବେଳାଇ କରିତେ ହୁଏ, ନଇଁଲେ ମଞ୍ଚ ଜାଗତ ଥାକବେ କେବେ ?

କାଳୀ ବଲିଲ—ହଁ, ଚା ଖେଳେ ଘର ଆସେ ନା ବଟେ ! କିନ୍ତୁ...ଆମାର ଜନ୍ମେ ଏକ ବୋତଳ କାରଣ ଫଳ୍ଦେ ଧରେ ଦିନ । ଆମରା ଶବ-ସାଧନା କରି କିଳା, କାରଣଟା ଆମାଦେର ବଇଁଲେ ନର...

ଗୋକୁଳ—ତା ଅବଶ୍ୟ—ବଲିଯା ଫଳ୍ଦେ ଏକ ବୋତଳ କାରଣ ଲିର୍ବିଯା ଦିଲ, ଏବଂ ବଲିଲ—ଶକ୍ତ୍ୟକାନ୍ତବାବ, କାରଣଟା ଆମ ନିଜେ କିଲବ; ସେମେ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରଜ୍ଞ-ଆର୍ଟାର ଚଲେ ନା !

ଗୋକୁଳ ନିଜେ ଗିରେ ଥୁବ କଡ଼ା ରକମେର ଏକ ବୋତଳ ମଦ କିନିଯା ଆନିନ୍ଦାହିଲ ଏବଂ ହୋଇ କରିତେ କରିତେ କାଳୀଗ୍ରୂପୀକେ ଚାଲିଯା ଚାଲିଯା ଦିତେ ଲାଗିଲ । କାଳୀ ବୀ-ହାତେର ମାବେର ଦ୍ୱାଟି ଆଙ୍ଗୁଳ ଘର୍ଡିଯା କନିଷ୍ଠା, ତର୍ଜନ୍ନନୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଲିତେ ଏକଟି ତେପାଙ୍ଗୀ ବୈଟକ କରିଯା ତାହାର ଉପର ମଦେର ଛୋଟ ବାଟିଟି ବସାଇଯା ପାନ କରିତେଛିଲ । ତାହା ଦେଖିଯା ଗୋକୁଲେର ଭାବି କୌତୁକ ବୋଧ ହିଲ । ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ—ଗୁଣୀ-ମଶାର, ଓରକମ କରେ ଥାଜେନ ସେ ?

କାଳୀ ଏକଟ୍ଟ ଅବଭାବ କ୍ଷରେ ବଲିଲ—ଆପନାଦେର ଗୁରୁ-ସମ୍ପଦରେ ତ ଏସବ ନେଇ, ଆନବେନ କୋଷେକେ ? ଡାନ ହାତେ କରେ ଥେଲେ, କିଂବା ମୋଜା ଆଙ୍ଗୁଳେ ଧରେ ଥେଲେ ସେ, ମଦ ଖାଓରା ହୁଏ । ମଦ ତ ଆମରା ଥାଇ ନା । ବୀ-ହାତେର ତିନ ଆଙ୍ଗୁଲେର ଡଗାଯା ବରସରେ ଥେଲେ ହୁଏ କାରଣ, ଆମରା କାରଣଇ ପାନ କରେ ଥାକି ।

ଗୋକୁଳ ବଲିଲ—ବେଶ ! ଏକଟା ନକ୍ତନ ତତ୍ତ୍ଵ ଶେଖା ଗେଲ । ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆପନା-ହେଲ ଗୁଣୀର ସାକ୍ଷାତ ପେଯେଛି । ଆମାକେ ଦୟା କରେ କିଛି, ଗୁଣ-ଟନ ଶିଖିରେ ଦିତେ ହବେ କିନ୍ତୁ ।

କାଳୀ ଉତ୍ଥନ୍ତ ହିଲୁ ବଲିଲ—ତା ବେଶ ! କିନ୍ତୁ ଜାଲେନ ତ ଶିବେର ଗୁରୁ ରାମ, ଆର ରାମେର ଗୁରୁ ଶିବ !

ଗୋକୁଳ ହାସିଯା ବଲିଲ—ତା ଅବଶ୍ୟ ! ତା ଅବଶ୍ୟ ! ଆମାର ଏକଟ୍ଟ-ଆଧଟ୍ଟ ଯା ଜାନା ଆଛେ, ଆପନାକେ ଶିଖିରେ ଦେବୋ ବୈକି ! କିନ୍ତୁ ଭାଲୋଯ ଭାଲୋଯ ଆଜକେର ରାତଟା ତ କାଟିଯେ ଉଠି ।

କାଳୀ ଆଙ୍ଗୁଳେ ଏକବାର ଚାରିଦିକେ ଦେଖିଯା ଲାଇଲ । ଇହା ଗୋକୁଲେର ଚୋଥ ଏଡାଇଲ ନା ।

গোকুল আবার পাত্রপূর্ণ করিয়া দিল। কালী বলিল—অত ঘন ঘন না হে।

গোকুল বলিল—বলেন কি? প্রত্যেক কুশীর ঘরের আহুতি ধেমন হোমানলে পড়বে, অমনি এক-এক পাত্র জঠরানলে পড়বে, এই ত নিয়ম। দেখুন না, আমার জপের সমেরু হবে এক বাটি চা!

কালী খেলো হইয়া যাইবার ভয়ে আর কিছু বলিতে পারিল না; কিন্তু সে ব্যর্থতাচ্ছিল যে, মদের নেশাটা মাথার মধ্যে চন্চন্চ করিয়া চাড়িয়া উঠিতেছে।

ঝুঁ আড়ম্বরে জপ-হোম শেষ হইল। তখন গোকুল বলিল—এইবার সর্বেপড়া দিয়ে বাঢ়িটার ঘাটবন্দী করে দিয়ে আসি।

কালীর গা তখন ছম্বম্ব করিতেছিল। সে একলা ধারিতে হইবার ভয়ে বলিল—হাঁ চন, আমিও ধূলোপড়া দিয়ে রেখে আসি।

ঘাটবন্দী করিবার জন্য বাড়ির চারিদিকে ধূলা ছড়াইতে ছড়াইতে কালী ঝুঁ তাড়াতাড়ি মন্ত্র আওড়াইতে লাগল—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভৃতা ষে ভৃতা ভূবি সংস্থিতাঃ ॥

যে ভৃতা বিদ্যুকর্তাৰ স্তে নশ্যলতু শিবাঞ্জয়া ॥

ওঁ বেতালাশ পিশাচাশ রাঙ্কসাশ সরীসুপাঃ ।

অপসর্পন্তু তে সবেৰ চাঁড়কান্দেগ তাড়িতাঃ ॥

ঘাটবন্দী করিয়া আসিয়া দুঃজনে খাটে মশারিৰ খাটাইয়া শয়ন কৰিল। গোকুল দেখিল, অত মদ খাওয়া সত্ত্বেও কালী ভয়ে ধূমাইতে পারিতেছে না। গোকুল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া ধারিয়া কালী ধূমাইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য আস্তে ডাকিল—গুণীমশায়!

কালী একেবারে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—আঁ! কেন? কি হয়েছে?

গোকুল বলিল—আজ আর শুরা কেউ এলেন না দেখাই!

কালী চাপা গলায় বলিল—চুপ, এখনো বলা যাব না, তৃতীয় প্রহরেই খন্দের বেশী উৎপাত।

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ধারিয়া গোকুল ডাঁকিল—গুণীমশায়!

কালী আবার লাফাইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—কেন? কি হল?

গোকুল কোনোমতে হাসি চাপিয়া বলিল—আজ্জে, আমি একবার বাইরে যাব।

কালীর তখন নেশায় শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে! সে শুইয়া পাড়িয়া বলিল—আঁ! তোমার এত ভয়! যাৰ, কিছু ভয় নেই, আমি শরীর-সংরক্ষণী মন্ত্র পড়াছি! কিন্তু খবরদার, দশরথের বেটার নাম করো না যেন; তাহলৈ শুরা ভারি রাগ করেন, তখন একটু অসাবধান হলেই ঘাড় ঘট্কান!

গোকুল অহাভয়ের ভান করিয়া বলিল—আঁ! বলেন কি? আমি যে মন্ত্র-তন্ত্র সব ভুলে যাচ্ছ...

কালী জড়িতস্বরে বলিল—ভয় নেই। হং হং বোঁ খ্ৰং ঝং কট্কট্
ফট্ফট্ তাৱয় তাৱয়—বল্লতে বল্লতে চলৈ যাও।

গোকুল রূপ্যহাসিৰ বেগে কম্পিতস্বরে মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে বাহিৱে
চাঁপুয়া গিয়া আৱ হাসি চাঁপতে পাৰিল না, হো হো কৰিয়া উচ্চৱে হাসিয়া উঠিল।
সে-হাসি শৰ্দনয়া কালী একেবাৱে বিকট চীৎকাৰ কৰিয়া উঠিয়া বাসল।

গোকুল ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা কৰিল—গুণীমশায়, বাপাৱ কি?

কালী কম্পিতকষ্টে বলিল,—বিকট হাসি শৰ্দনতে পেলৈ না?

গোকুল বিশ্঵াস প্ৰকাশ কৰিয়া বলিল—কৈ, না ত!

কালী বলিল—এইবাৱ আসছেন তাৰা! ঘূৰ সাবধান! বোঁ ত্ৰোঁ যং রং লং
বং শং বং সং হো হং সঃ কট্কট্ ফট্ফট্ তাৱয় তাৱয়...

গোকুলেৱ হাস্যৱোধ কৰা কষ্টকৰ হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পৱে গোকুল দেখিল কালীৰ নাক ডাকিতেছে, কালী ঘূমাইয়া
পাড়িয়াছে। গোকুল বাহিৱে গিয়া গোটাকতক চিল সংগ্ৰহ কৰিয়া আনিয়াছিল।
সেই চিলগুলি একসঙ্গে ঘূঢ়া কৰিয়া জোৱে ছুড়িয়া ফেলিল। একটা চিল দৰজাৱ
শিকলে দাঁগিয়া শব্দ হইল—টুঁ!

কালী একেবাৱে ধড়াড় কৰিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিল—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

গোকুল ঘূৰেৱ ভাব কৰিয়া জোৱ দিল না। কালী বিৰস্ত হইয়া চীৎকাৰ কৰিয়া
ডাকিল—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

গোকুল ধড়াড় কৰিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—আৰি, কি?

কালী বলিল— শিয়াৱে শমন ক'ৱে ভালো ঘূৰ আপনাৱ যা হোক্! ঊৱা যে
এসেছেন!

গোকুল বিশ্বাসেৱ ভাবে বলিল—এসেছেন কি?

—হাঁ, দৰজাৱ শিকল ঘূলেছেন...

—না, ও ইঁদুৰে মাটি ফেলেছে বোধ হয়।

—ইঁদুৰ নয় হে, ইঁদুৰ নয়, শিকল খোলাৱ শব্দ স্পষ্ট শৰ্দলাম!

—নাও, ও কিছু নয়; আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শ্ৰেয়ে থাকুন! আৱ ত কিছু শোনা
যাচ্ছে না!

—তা হোক্ অন্তৱৰ্তী আওড়াও হে। ও ভূতশংগাটোছৰঃ সম্মোচনাৰীৱ-
মুল্লাস জৰুৰ জৰুৰ.....

—আজ্ঞা গুণীমশায়, ওটা কিসেৱ মন্ত্ৰ? গো-ভূত-তাড়ান মন্ত্ৰ কি?

—হাঁ, দেখছ না মন্ত্ৰেৱ শৰ্শে রয়েছে!...ভূতশংগাটোছৰঃ সম্মোচনাৰী-মুল্লাস...
গোকুল বলিল—আপনাৱ টিৰিকতে সে-কৰচটা ঘূলছে ত!

—তা ত ঘূলছে! জৰুৰ জৰুৰ প্ৰজৰুৰ প্ৰজৰুৰ.....

—তবে আৱ কোন ভয় নেই!

କାଳୀ ବଲିଲ—ତୁମ ତ ବଲିଲ ଭୟ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଖରା ତ ଏସେ ସ୍ଵର୍ଗର କରଛେନ !...
ଦହ ଦହ ଶୋଯି ଶୋଯି...

କାଳୀର ସ୍ଵର୍ଗ ଆର ଆସେ ନା । ଗୋକୁଳରେ ତୁତ ନାଥାଇବାର ସର୍ବଧିଆ ଆର ପାଇ ନା ।
ଅପେକ୍ଷା କରିତେ କରିତେ କଥନ ଗୋକୁଳ ସ୍ଥାଇଯା ପଢ଼ିରାହେ । ହଠାଂ ସଥନ ସ୍ଵର୍ଗ
ଭାଙ୍ଗିଲ, ତଥନ ଦେଖିଲ ଏକେବାରେ ଭୋର ହଇଯା ଆସିଯାଇଛେ । କାଳୀର ତଥିଲେ ଖୁବ ନାକ
ଡାକିତେହେ । ଗୋକୁଳ ଆଶେ-ଆଶେ ମଶାର ତୁଳିଯା ଖାଟ ହିତେ ନାମିଯା 'ହୃଦ୍ଭୃତ
ବା' କରିଯା ବିକଟ ଚାଁକାର କରିଯା ଲାଫାଇଯା ଗିଯା କାଳୀର ମାଥାଟା ଜୋରେ ଚାପିଯା
ଧାରିଲ ! କାଳୀ ଘୁମେ ଏକଟା 'ଘୁ ଉପ୍ତୁଷ୍ଟଶଦ କରିଯା ସମ୍ମତ ମଶାର ଛିର୍ଭିନ୍ନା
ସବର୍ଦ୍ଦିଗେ ଜଡ଼ାଇଯା ଲାଇଯା ଏକଲାକେ ସିର୍ଦ୍ଦିର ଉପରେ ଗିଯା ପଢ଼ିଲ, ଏବଂ ସିର୍ଦ୍ଦି ଦିଯା
ଗଡ଼ାଇତେ ଗଡ଼ାଇତେ ଗିଯା ଏକେବାରେ ନାଚେ ଥୋଯାର ଉପରେ ଆହାଡ ଥାଇଲ; ତାହାର
ଜଟଓଯାଳା ଟିକିଟି ଗୋକୁଲର ହାତେର ମୁଟୋର ମଧ୍ୟେ ହିଁଡ଼ିଯା ରହିଯା ଗିଯାଇଛି !

ଭୋର ହିତେ-ନା-ହିତେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଳିତବାବ, ଲୋକଜନ ଲାଇଯା ବାଢ଼ୀର ସାମନେ
ଆସିଯା ଦାଁଡ଼ାଇଯା ସ୍ର୍ଵେଦ୍ୟାଦୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିତେହିଲନ । ସ୍ର୍ଵେଦ୍ୟାଳ୍ମତ ହିତେ ସ୍ର୍ଵେଦ୍ୟାଦୟ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂତେ ଅଧିକାରେ ପା ଦେଓଯା ତ ଅରଣି ନୟ !

କାଳୀଗୁଣୀକେ ପଢ଼ିଯା ଗୌଣ-ଗୌଣ କରିତେ ଦେଖିଯା ଦ୍ୱ-ଏକଜନ ଅସମସାହିସିକ ଲୋକ
ଇତମତଃ କରିତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱା ଆଗାଇଯା ଏକ-ପା ପିଛାଇଯା ଗିଯା
ତାହାକେ ଉଠାଇଯା ହାତର ବାହିରେ ଆନିଲ । ବେଚାରାର ଟିକି ଛିର୍ଭିନ୍ନା ରକ୍ତ ପଢ଼ିତେହେ,
ଘୁମେ ଏକପାଶ ଥୋଯାର ଆହାଡ ଥାଇଯା ଧେଣୁଲାଇଯା ଗିଯାଇଛେ, ସବର୍ଦ୍ଦିଗେ କ୍ଷର୍ତ୍ତବ୍ୟକ୍ତ ।

ସକଳେ ତାହାର ଘୁମେ ଚୋଥେ ଜଳ ଦିଯା ବାତାସ କରିତେ କରିତେ ଜିଞ୍ଜାସା କରିଲ—
ଗୁଣୀ, ବ୍ୟାପାର କି ?

କାଳୀ ବଲିଲ—ଉଃ ରେ ବାବା ! କୀ ଭୟନକ ! ଏକଟ ସ୍ଵର୍ଗରେ ପଡ଼େଇଛ ; ବେଇ
ମନ୍ତ୍ରର ପଡ଼ି ବ୍ୟଧ ହରେଇଛ, ମେଇ ତକେ ଏକଟ ଆଶ୍ରମ ଗୋ-ଭୂତ ଏକଦମ ତେବେ ଏସେ ଚେପେ
ଧରଲେ ଆମାର ଟିକଟା ! ଐ ହତଭାଗା ଡାଙ୍କାରଟାଇ ତ ସତ ନଷ୍ଟେର ଗୋଡ଼ା । ଟିକିତେ
ବେଧେ ଦିଯେଇଲି କି ନା ଗୋ-ଭୂତ ଥେଦାନେ କବଚ ! ସତ ଆକ୍ରୋଶ ପଡ଼ିଲ ଏସେ ଟିକଟାର
ଓପର ! ଆଚକା ସ୍ଵର୍ଗ ଭେଙେ ଥେତେଇ ଅରଣି ଆଓଡ଼େ ଦିଲାମ 'ହୁଁ ହୁଁ ବୈଁ କୌଁ' ।
ତଥନ ଆର ଆମାର କିଛି କରନେ ନା ପେରେ ମଶାରିସ୍ମୁଦ୍ର ଆମାର-ଜିନ୍ଦିରେ-ସାର୍ଦିରେ ତାଳ
ପାକିଯେ ଛୁଟେ ଫେଲେ ଦିଲେ ଓପର ଥେକେ ଏକେବାରେ ନାଚେ...

ସକଳେ ସମସ୍ତରେ ଜିଞ୍ଜାସା କରିଯା ଉଠିଲ—ଆର ଡାଙ୍କାର ?

ହଁ ! ଡାଙ୍କାର ! ତାକେ କି ଆର ରେଖେଛେ ? ଆୟି ସାଇ, ତାଇ କୋନୋ ଗତିକେ
ପ୍ରାଣେ ବେଚେ ଏସେଇ !

—ତାହିଲେ ତ ତାକେ ଏକବାର ଦେଖା ଉଚିତ । ବିଦେଶୀ ଲୋକଟା ଗୋଯାନ୍ତର୍ମି
କରିତେ ଗିଯେ ବେଯୋରେ ଯାରା ଗେଲ ଗା !

ତଥନ ସକଳେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଁଶେର ଲାଠିର ଡଗାର ଲାଠିନ ବାଁଦିରା ଲାଇଯା ସମ୍ପର୍କେ

ସିର୍ଦ୍ଦିତେ ଉଠିତେ ଲାଗିଲା । ପ୍ରତୋକେରଇ ଇଚ୍ଛା ସକଳେର ପଞ୍ଚାଂ ଥାରିବେ । କାଳୀର ଭୟ କରା ଶୋଭା ପାର ନା, ତାଇ ତାହାକେ ପ୍ରାଣ ହାତେ କରିଯା ସକଳେର ଆଗେ ଆଗେଇ ସ୍ଥାଇତେ ହିତେଛିଲ; ମେ ଧରଥର କରିଯା କାଂପିତେ କାଂପିତେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଘନ୍ତ ପଢ଼ିତେଛିଲ— ହନ ହନ ଦମ ଦମ ପଚ ପଚ ମର୍ଦ୍ଦୟ ମର୍ଦ୍ଦୟ...

ସକଳେ ଠେଲାଠେଲି କରିତେ କରିତେ ସିର୍ଦ୍ଦିତେ ଉଠିତେହେ ଟେର ପାଇୟା ଗୋକୁଳ ତାଙ୍ଗାତାଙ୍ଗି କାଳୀର ଟିକିଟି ସିର୍ଦ୍ଦିର ଦରଜାର ମାଥାର ଢୋକାଟେ ଶିକଳେର ଶୁର୍ବୋତେ ଝୁଲାଇୟା ଦିଲ ଏବଂ ଆପାଦିଷ୍ଟକ ମୁଢ଼ି ଦିଯା ରୁଦ୍ଧହାରୀର ଢୋଟେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ କାଂପିତେ ଲାଗିଲା ।

ଏତଙ୍କଣେ ଗୋଲମାଲ ଶୁନିଯା ପାଡ଼ା-ପଡ଼ଶୀ ସକଳେ ଆସିଯା ଜୁଟିଯାଛେ । ତାହାରୀ ସକଳେ ଏକବାକେ ସାଙ୍ଗ୍ୟ ଦିଲ, କାଳ ରାଶେ ତାହାରା ଭୂତେର ବିକଟ ହାସି, ଉଂକଟ ଚାଁକାର, ହୃଟୋପ୍ରଟି ଶୁନିଯାଛେ; ଏମନ ଉପଦ୍ରବ ଏ ବାଡ଼ୀତେ ଆର କଥନେ ହିତେ ଦେଖା ଯାଇ ନାହିଁ ।

ସକଳେ ଉପରେ ଉଠିଯା ସିର୍ଦ୍ଦିର ଦରଜାର ଓପାର ହିତେ ଲମ୍ବା ଲାଠି ବାଡ଼ାଇୟା ବାଡ଼ାଇୟା ଗୋକୁଳେର ମଶାରିର ଚାରିରିଦିକେ ଲାଟନ ଶୁର୍ବାଇୟା ଶୁର୍ବାଇୟା ତାହାର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିତେ ଚେଷ୍ଟା କରିତେ ଲାଗିଲ, କେହିଁ ସାହସ କରିଯା ସେ-ଘରେ ପା ଦିତେ ପାରିତେଛିଲ ନା; ତଥନେ ଘରେର ମେଘେତେ ହେମେର ପ୍ରଜାର ଚିହ୍ନ ଛଡ଼ାଇୟା ପଢ଼ିଯା ଥାରିଯା ସକଳେର ଘନେ ଭୟ ଜୁହାଇୟା ତୁଳିତେଛିଲ ।

କାଳୀ ବିଲି—ଦେଖୁ କି? ଏହି ଦେଖ, ଆମାର ଟିକିଟା ଏଥନେ ବୁଲିଛେ! ଆର ଡାଙ୍କାର? ଓ ହସେ ଦେଖେ । ଦେଖଛ ନା, ଓ କି ରକମ କାଂପଛେ! ଭୂତ-ପ୍ରେତ-ପିଶାଚ କି ରୋଗୀ ରେ ବାପୁ, ସେ, ଓଷ୍ଠ ଗିଲିଯେ ତାକେ ମାରବେ! ଏ ସେ ଏକେବାରେ ମରା ଜିନିନ୍ଦି! ...ଓ ହସ ହସ କାଳୀ ଧମ ଧମ ବିଦେ ଆଲେ ମାଲେ ତାଲେ ଗନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ପଚ ପଚ ଫଥ ଫଥ... ।

ଏକଜନ ଢୋକାଟେର ଏପାର ହିତେଇ ଘରେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟ୍ ବୁର୍କିଯା ଭଯେ ଡାକିଲ—
ଡାଙ୍କାରବାସ୍ୟ!

ଗୋକୁଳ ଧରମଡ କରିଯା ଉଠିଯା ବାସିଯା ବଲିଯା ଉଠିଲ—ଆଁ!

ଅମିନ “ଓରେ ବାବାରେ!” ବଲିଯା ଚାଁକାର କରିଯା ସକଳେ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତେ ଏକହବୁଟେ ପଲାଇୟା ଏକେବାରେ ରାସ୍ତାର!

ନିଃଶବ୍ଦେ ହାସିତେ ହାସିତେ ଗୋକୁଳେର ପେଟେ ବାଥ ଧରିଯା ଗିଯାଇଛି । ଅନେକ କଲ୍ପେ ଏକଟ୍ ଦୟ ଲାଇୟା ପ୍ରକୃତିଶ୍ଵର ହିଯା ସେ ନୀଚେ ନାମିଯା ଚାଲିଲ ।

ନାମିତେ ନାମିତେ ଦେଖିଲ, ଡଗାଯ ଲାଟନ-ବାଁଧା ଲାଠିଗୁଲି ବାଡ଼ାଇୟା ଧରିଯା ସକଳେ ଗୁଟିଗୁଟି ଆବାର ଅଗ୍ରମର ହିତେହେ । ଗୋକୁଳ ଡାକିଲ—ଗୁଣ୍ଣା!

କାଳୀ ହାତଜୋଡ କରିଯା ବଲିଲ! ଥାକ ବାବା—ଥାକ! ତୋମାର ତ ଆମରା କିଛୁ ବାଲିନ, ତୋମାର ଭାଲୋର ଜନ୍ମେଇ ଆମରା ତଳମଳ କରିଛିଲାମ! ଥାକ ବାବା! ତୁମ ଥାକ!...ମ୍ରାବିଡି ମ୍ରାବିଡି ଜବଳ ଜବଳ ପ୍ରଜବଳ ପ୍ରଜବଳ...

গোকুল ধার্মিয়া বালিন—আমি মরে ভূত হইনি গৃহীমশায়! আমি জ্যাম্তই আছি।

কালী মাথা নাড়িয়া বালিন—জ্যাম্ত! জ্যাম্ত তুমি থাকতেই পার না! আমার সঙ্গে ত চালাক খাটবে না বাবা! থাক, থাক! তোমায় আমি কিছু বলিনি। এই চলে শাঁচি বাবা! থাক, থাক!...জাজৰিল ঘমঘটে তারয় তারয়...

গোকুল হাসিয়া বালিন—ঐ দেখুন; সুর্য উঠেছে। সুর্য উঠলেও কি ভূত দেখা দেয় নাকি?

তাও ত বটে! তখন সকলের প্রতায় হইল গোকুল ভূত হয় নাই, জ্যাম্তই আছে!

গোকুল বালিন—এ বাড়ীকে এক বৎসর শোধন না করলে দোষ কাটিবে না। ফি শনিবারে আর অমাবস্যায় শোধন করতে হবে।

সঙ্কুলীকাম্তবাবু হাতজোড় করিয়া বালিনেন—তাই করুন ডাঙ্গারবাবু! আপনার খাই-খরচের আর পঞ্জো-আর্চার সমস্ত ভার আমার। আপনি এক বছর ধরে শোধন করে আমার বাড়ীটির দোষ কাটিয়ে দিন।

গোকুল গম্ভীর হইয়া বালিন—তাহলৈ গৃহীমশায়, আসছে শনিবার আসছেন ত?

কালী মুখ ঘূরাইয়া দৃষ্টি হাত তুলিয়া ঘন ঘন নাড়িয়া বালিন—আমি? আমি আর এদের ঘাঁটাতে আসছি না ডাঙ্গারবাবু!

গোকুল গম্ভীর হইয়া বালিন—তা না আসেন, এ কাজ আমি একলাই আরো ভালো পারব।

এ কথায় কাহারোই অবিশ্বাস হইল না যে ভূতে কালীগৃহীকে দোতলা হইতে তুলিয়া আছাড় দেয়, তাহার হাতেও যখন গোকুল নিন্দার পাইয়াছে, তখন সে বড় গৃহীই বটে!

গোকুলের পসার কায়েমি হইয়া গেল।



গঙ্গাধরের বিপদ

—বিচুক্তিভূষণ বলদোপাখ্যায়

অনেকদিন আগের কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে।

সে-সময় মসলা-পোলতায় গঙ্গাধর কুণ্ডুর ছোটখাটো একখানা মসলার দোকান ছিল।

গঙ্গাধরের দেশ হৃগলী জেলা, চাঁপাড়াঙ্গার কাছে। অনেকদিনের দোকান, যে-সময়ের কথা বলছি, গঙ্গাধরের বয়স তখন পশ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভাল যাচ্ছিল না। নানা রকম অসুখে ভুগত প্রায়ই। তার ওপর বাবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুসড়ে পড়েছিল। দোকান-ঘরের ভাড়া দুঃমাসের বাকী, মহাজনের দেনা ঘাড়ে—দুপুরবেলা দোকানে বসে থেলো হৃকো হাতে সে নিজের অদ্ধেতের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধ্যার সময় গোমস্তা আসবে ভাড়া নিতে বলে শাসিয়ে গিয়েছে। কি বলা যায় তাকে।

এক পুরাণে পরিচিত মহাজনের কথা তার মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ ঝী, পেশোয়ারী মসলান, মেটেবুরজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের নেনদেন ছিল

তার সঙ্গে। করেকবাৰ টাকা নিয়েছে, শোধও করেছে—কিন্তু সুন্দেৱ হাব বড় বেশী ব'লে ইদানীঁ বছৰকৱেক গঙ্গাধৰ সেদিকে যাবামি!

ভেবে-চিন্তে সে মেটেবুৰজেই রওনা হলো। সুন্দ বেশী ব'লে আৱ উপাস্ব কি? টাকা না আনলেই নয় আজ সম্ভ্যাৰ ঘণ্যে।

মেটেবুৰজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়েৱ নতুন বাসা খুঁজে বাব কৱতে, টাকা নিতে, গল্পগুজৰ কৱতে দেৱী হয়ে গেল। খিদিৱপুৰৱেৰ কাটিগঙ্গা পাব হয়ে এসে ঝাম ধৰবে, হন্ হন্ কৱে হেঁটে আসছে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে ডেকে বঞ্জে—এ সাহেব, ইধাৱ শুনিয়ে তো জেৱা—

সম্ভ্যা হয়ে গিয়েছে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলো, সেখানে কতকগুলো গাছপালায় বেশ একটু অন্ধকাৱ। স্থানটা নিষ্জৰ্ণ, তাৱ ওপৰ আবাৱ তাৱ সঙ্গে রয়েছে টাকা। গঙ্গাধৰেৱ মনে একটু সন্দেহ যে না হলো, এমন নয়। কিন্তু উপাস্ব নেই, লোকটা এঁগিয়ে এল। ওই গাছগুলোৱ তলায় সে যেন তাৱই প্ৰতীক্ষাৰ দাঁড়িয়ে ছিল।

লোকটা খুৰ লম্বা, মাথাৱ বাঁকড়া বাঁকড়া চুল ঘাড়েৱ ওপৰ পড়েছে, যুথুটা ভাল দেৰা যাচ্ছে না। পৰনে ঢিলে ইজেৱ ও আলখালো। সে কাছে এসে সুন্দ নীচু কৱে হিস্পীতে ও বাংলায় মিলিয়ে বঞ্জে—বাৰু, সন্তায় মাল কিনবেন?

গঙ্গাধৰ আশ্চৰ্য হয়ে বঞ্জে—কি মাল?

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বঞ্জে—এখানে কথা হবে না বাৰু, পুলিশ ঘৰছে, আমাৱ সঙ্গে আসন্ন—

খুপ্সি গাছেৱ তলায় এক জায়গায় অন্ধকাৱ খুৰ ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বঞ্জে—জিনিসটা কোকেন। খুৰ সন্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুটি মাল—লুকিয়ে দেবো।

গঙ্গাধৰ চম্কে উঠলো!

সে কখনো ও-ব্যবসা কৱোনি। ডিউটি-ছুটি কোকেন—কি সৰ্বনেশে জিনিস! ভাল লোকেৱ পাজোৱ পড়েছে! না, সে কিনবে না।

লোকটা সভ্বতঃ পাজোবী মুসলমান! বাংলা বলতে পাৱে—তবে বেশ একটু বাঁকা। সে অন্নয়েৱ সুন্দেৱ বঞ্জে—বাৰু, আপনি নিন্। আপনাৱ ভাল হবে! সিকি কড়িতে দেবো—আমাৱ মুস্কল হয়েছে, আমি মাল বিক্ৰিৱ লোক খুঁজে পাইছোনে। ঘুৰে ঘুৰে বেড়াচ্ছ কত জায়গায়—আবাৱ সব জায়গায় তো ষেতে পাৱিনে, পুলিশেৱ ভয় তো আছে। কেউ কথা কইছে না আমাৱ সঙ্গে, সেই হয়েছে আৱও মুস্কল। ইঠাঁৎ সহৱে এত পুলিশেৱ ভয় হলো যে কেন বাৰু, তা বুঁৰিনে—আগে যাবা এ-ব্যবসা কৱতো, তাদেৱ কাছে বাঁচি। তাৱা আমাৱ দিকে চেয়েও দেখছে না। আপনি গৱৰাঙ্গি হবেন না বাৰু—মাল দেখন, পৰে দামদন্তৱ হবে।

লোকটাৱ গলার সুন্দে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধৰেৱ মন থানিকটা ভিজল!

কোকেনের ব্যবসাতে মানুষে রাতারাতি বড়মানুষ হয়েছে বটে! বিনা সাহসে, বিপদ
এড়িয়ে বেড়ালে কি লক্ষ্যলাভ হয়? দেখাই, যাক, না!

হঠাতে গঙ্গাধর চেয়ে দেখলে যে, লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়ে ছিল,
কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে, এই ভয়ে বেশী জোরে ডাকতেও সাহস
পেল না! চাপা গলায় বাঙ্গলা হিস্টিতে ডাকলে—কোথায় গিয়া ও খৰ্ষসাহেব!
এদিকে—ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘকৃতি আলখালীধারী খৰ্ষসাহেবকে
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বল্লে—জলদি বলো, রাত হো গিয়া। অনেক
দূর যানে হোগো।

কি একটা যেন ঢাকবার জন্য লোকটা প্রাণপণে চেষ্টা করছে! বল্লে—আমার
সঙ্গে এসো, মাল দেখাবো।

দূরজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেকদূর গেল। যে-সময়ের কথা বল্লে, তখন
ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে শাওয়াতে বড়-বড় ভড়
ও নৌকো ডাঙায় কাদার ওপর পড়ে আছে, দূ'-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে
দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদাকাঁটার বন, পেছনে অনেকদূরে খিদিরপুর বাজারের
আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খৰ্ষসাহেব একটা বড় অস্তুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে
চেয়ে বল্লে—আমায় দেখতে পাচ্ছ তো?

কেন পাবো না? এমন বয়েস এখনও হয়নি যে, এই সন্ধ্যাবেলাতেই চোখে
ঠাওর হবে না।

একবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলে—তোমার ডেরা কোথায় খৰ্ষসাহেব?

লোকটা চকিতে পিছন ফিরে সন্দিখ্য দৃঢ়িতে চেয়ে বল্লে—কেন, সে তোমার
কি দুরকার? প্রলিশে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভালো হবে না জেনো।
মাল দেবো, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে—আমার বাসার খেঁজে তোমার
কি কাজ?

লোকটার চোখের চাউলি কি অস্তুত! গঙ্গাধর অস্বচ্ছ বোধ করলে। যখন
ভাল দেখা যায় না—কিন্তু ওই দূই চোখে যেন ইস্পাতের ছৱির ঝল্সে উঠল না,
সঙ্গে তার টাকা রয়েছে, এ অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপর্যাচিত অজ্ঞাতকুলশীল
লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যাবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েছে! লোভে মানুষের
জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন এসেইছে, তখন আর
চারা নেই। বিশেষতঃ সে যে ভয় পেয়েছে, এটা না দেখানোই ভাল। দেখালে,
বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না! ছৱির বার ক'রে বসলে তখন আর উপায়
থাকবে না।

অনেক দূরে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটি গাছের গুর্ণি পড়ে

আছে গুদামঘরের দরজা থেকে একটি দ্বারে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে, গুদামঘরের আশে-পাশে সবৰ্ত্ত আগাছার অন্তর্জ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অধিকার হলেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়—সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে ইঁল গুদামঘরটা পূরুণো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে! বাঁশের বেড়া খসে পড়েছে, জায়গায় জায়গায় চালের খোলা উড়ে গিয়েছে, যাবে মাঝে সামনের দোরটা উই-ধরা,—ভেঙে পড়তে চাইছে যেন!...

গঙ্গাধরের কেমন একটি ভৱ হ'ল! কেন সে এখানে এল এই সম্মায়? এ-রকম জায়গায় একা মানুষে আসে—বিশেষ ক'রে, এতগুলো টাকা সঙ্গে ক'রে? সে আসত না কখনই, সে কলকাতার আজ নতুন নয়, তার ওপরে কুন্নো বাবসাদার, বাঙাল দেশ থেকে নতুন আসেনি। কিন্তু ওই লোকটার কথার স্বরে কি যাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেছে, সাধ্য ছিল না যে, সে ছাড়ায়! একথা এখন ভাব মনে হল!...

হঠাতে অধিকারের মধ্যে খাঁ-সাহেবের ঘূর্ণি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অচ্ছৃত ধরনের, যেন মনে হয়, অধিকারে ওর চেহারা যিলিয়ে গিয়েছিল, আবার ফুটে বেরুল! কোথাও যে চলে গিয়েছিল, এমন মনে হয় না। পাকা ও বুনো খেলোয়াড় আর কি!

খাঁ-সাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকল। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে পেছনে আসতে বলল, তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিম্-ঝিম্ করছে, বুক টিপ্-টিপ্ করছে। এই অধিকার গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও-লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে, কিংবা ছুরির বুকে বসাবে—সেই ফালিতে এতদ্রু ভুলিয়ে এনেছে। লোকটা নিশ্চয়ই জানত যে, তার কাছে টাকা আছে—সম্মান রেখেছিল। কে জানে, খোদাদ খাঁয়ের দলের লোক কিনা? গঙ্গাধরের কপালে বিল্-বিল্ ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে—দৌড়ে পালাবে? কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, এই জোরান পাঞ্জাবী মস্লমানের সঙ্গে দৌড়ের পাঞ্জাব তার পক্ষে পেরে গুঠ অসম্ভব।

কলের প্রতুলের মত গঙ্গাধর গুদামের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য! গুদামের ওদিকের দেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙ্গা! গুদামের সবৰ্ত্ত দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। ঘাকড়সার জাল সবৰ্ত্ত, অধিকারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু নাকে-মুখে লাগে। একটা কি রকম ভাব্যসা গুর্ধ গুদামের মধ্যে! মেরেটা সাঁৎসেতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকোন!

এবিদেক আবার খাঁ-সাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে, যায় কোথায়?

অস্পষ্টকণ...যিনিট দুই হবে...কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা...আবার

সেই ভূটা হলো। কেমন এক ধরনের ডয়—যেন বুকের রঙ হিম হয়ে যাছে! এই বা কি রকম ডয়? আর গুদামঘরটার মধ্যে কন্কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্নোত বইছে মাঝে মাঝে!

মিনিট দুই পরেই খাঁ-সাহেব—এই তো আধ-অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে!...

হঠাতে আবার একটা অশ্চৃত কথা বলে খাঁ-সাহেব। বললে—তুমি কালা নাকি? এতক্ষণ কথা বলছি, শন্তে পাছ না? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোকেন যে জায়গায় আছে বল্লাম—তা দেখতে পেয়েছ? সাবলের ঢাঢ় দিয়ে তুলতে বল্লাম—পিপে দুটো। হাঁ ক'রে সঙ্গের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?

বারে! এ কথা কখন বলেছে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে, মৃত্যুর মত দ্রষ্টিতে চেয়ে বলে—কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা? কই, কোথায় সাবল? কথা বল্লতে বল্লতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁ-সাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো, তার বিভ্রান্ত বিহৃঢ় আতঙ্কাকুল দ্রষ্টির সামনে খাঁ-সাহেবের মৃত্যু, গলা, বুক, হাত, পা, সারা দেহটা যেন চৰ চৰ হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়ছে—সব যেন ভেঙে ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে...খাঁ-সাহেব প্রাণপণে দাতিমুখ খামুটি ক'রে বিষম মনের জোরে তার দেহের চৰ্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধ'রে রাখার জন্যে চেষ্টা করছে, কিন্তু পেরে উঠছে না! তার চোখের সে বিজিত হতাশ দ্রষ্টি গঙ্গাধরের হৃদয় স্পর্শ করলো। দেখতে দেখতে অতভুত দীর্ঘকালি দেহের আর কিছু অবশিষ্ট রইল না... সব ভেঙে গেল, গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল...এক...দুই...তিনি...চার...

আর কোথায় খাঁ-সাহেব? চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে যিলিয়ে গিয়েছে... একটা ঠাণ্ডা কন্কনে বাতাসের আপটা এল কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আন্তরিকে চৈৎকার ক'রে গুদামঘরের স্যাঁসেতে মেঝের উপর ঝুঁক্ষিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দেশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিমা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পেঁচে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকাঢ়িও থোরা যায়নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নির্যাপ্ত হয়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারত না।

...মাস দুই পরে মেটেবুরজের খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে— গঙ্গাধর, টাকা নিয়ে যাবার দিন কিংবা ঘটেছিল, সেটা বল্লে। খোদাদাদ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

খাঁনকাঙ্গল চুপ করে থেকে বল্লে—সাহজন্ম, ও হলো আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খ'ব বড় ব্যবসায় ছিল। আজ বছর পনের আগেকার কথা, রমজান

মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তঙ্গাটের কাছে একখানা জাহাঙ্গ ভিড়েছিল; সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে,—জাহাঙ্গের লোকের সঙ্গে সড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখতো, কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে হঠাৎ খন হয়। কেন বা কে খন করলে জানা যায়নি, কেউ ধরাও পড়েনি। তবে দলের লোকই তাকে খন করেছিল, এটা বোৰা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আয়ি জানি। আমার মনে হয়, আমীর খাঁ সেই থেকে ঘৰে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রি করবার জন্যে, ওর লুকানো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোৰা ! তা বাবু, সে গুদামঘরটা কোথায়, তুমি দেখাতে পারবে ?

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে সেখানে গিরেছিল, তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেত না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়ল, পূরাগো ভাঙা গুদাম-ঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের ঘুথের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দ্রষ্টিটা ! হতভাগ্য কি এতদিনেও বোঝেনি, সে মারা গিয়েছে ? ...কে উন্নত দেবে ? ভগবান তার আস্তাকে শান্তি দিন !



ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀ

—ମୌରୀଶ୍ରମୋହନ ଘୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ

ସଦୀ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଦିରେଛି । ଏଗ୍ଜାର୍ମିନେ essay ଲିଖିତେ ଦିରେଛିଲ, 'ଦେଶ-ଭ୍ରମଗେ ମତ ଏହିନ ଉପକାରିତା' । ଏକରାଶ କାଗଜ ଭାର୍ତ୍ତ କରେ ଲିଖେ ଏମେହି ସେ, ଦେଶ-ଭ୍ରମଗେ ମତ ଏହିନ ବ୍ୟାପାର ଆର ନେଇ । ଦେଶେର କଟ, ଦେଶେର କଟ, ସବ ଏହି ଏକ ଦେଶ-ଭ୍ରମଣେହି ଦ୍ଵର କରା ଯେତେ ପାରେ । ସେ ଦେଶ-ଭ୍ରମ ନା କରେ, ମେ ମାନ୍ୟ ନର,—ଆର ସେ ଭ୍ରମ କରେ ବେଡ଼ାଯ, ସରେର ଧାରେ ଭୁଲେଓ ଆସେ ନା, ତାର ମତ ମହାପର୍ବତ ଆର ଶି-ଜଗତେ ନେଇ ! ଅର୍ଥାଏ, ଘର-ବାଢ଼ୀ, ମା-ବାପେର କ୍ଷେତ୍ର-ଆଦର, ଏମେ ନା ହଲେଓ ମାନ୍ୟରେ ବାଁଚା ଆଟକାଇ ନା—କିନ୍ତୁ ଦେଶ-ଭ୍ରମ ନା କରତେ ପାରିଲେ ମାନ୍ୟ ବାଁଚିତେ ପାରେ ନା । ଦେଶ-ଭ୍ରମଗେ ଘାରା ଦର୍ଭର୍କ, ଅନକଟ, ମହାମରୀ, ମ୍ୟାଲୋରିଆ—ସବ ଦ୍ଵର ହୁଏ, ଅତ୍ୟବେଳେ ସର ଛାଡ଼େ, ଦେଶ-ଭ୍ରମ କରି ଇତ୍ୟାଦି । ଜାନି ନା, ଏଗ୍ଜାର୍ମିନାର ଶାସ୍ତ୍ର କତ ନୟର ଦେବେନ ଆମାର ମେ essay ପଡ଼େ—ତାରେ ଏଗ୍ଜାର୍ମିନର ପର ଆମାଦେର ମନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ସଂକଳନ କରେ ଫେଲିଲେ ସେ, ଏବାର ଏକବାର ଦେଶ-ଭ୍ରମଣେ ବାର ହୁଏଇ ଥାକ୍ । କେନନା, ଦେଶ-ଭ୍ରମ ନା କରିଲେ ଆମରା ମାନ୍ୟ ହତେ ପାରିବୋ ନା ।

ଥାଡ଼ୀତେ ହାଙ୍ଗାମା ବାଧିଯେ ଅନୁମତି ଆର ପରସା ଆଦାୟ ହଲେ । ତଥନ ସକଳେ ପରାମର୍ଶ କରେ ଏକଦିନ ହାବଡ଼ାର ରେଲେ ଚଢ଼େ ପଞ୍ଜୀଯାମ-ଦର୍ଶନେ ବୈରିଯେ ପଡ଼ା ଗେଲ । ଆଶ୍ରା-ଦିଲ୍ଲୀ ସାବାର ମତ ଅତ ପରସା ପାର କୋଥାଯ ? କାଜେଇ ମୋଜାର ଦଲ ମୁଁ ଜିନି ଅବଧି ଦୌଡ଼ ଦେବେ ଠିକ ହଲେ; ଅର୍ଥାଏ ସାବାର ଜାଗଗା ହଲୋ ଶେଯାଥାଲା ! ହାବଡ଼ା-ଶେଯାଥାଲାର ସେ ଲାଇନ ଆଛେ—ଶାର୍ଟିନ କୋମ୍ପାନୀର, ମେଇ ରେଲେ ଚଢ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପୂର୍ବେ ଆମରା ଥାନା କରିଲୁମ ।

নেউগীর মামার-বাড়ী শেয়াখালায়; সে হলো আমাদের গাইড। তার মামরা পিছতে থাকেন, দেশের বাড়ী খালি পড়ে আছে—সেখানে ভারী ফ্র্যান্ট ক'রে স্বাধীনভাবে থাকা যাবে—সকলের মনে উৎসাহ আর ধরে না! আশু ঘোষ একটা বঙ্গ-হারমোনিয়াম ধোগাড় করেছিল—সে মন্ত গাইয়ে! তারপর পালিত চল্লো এক ছিপ নিয়ে—শোয়াখালার প্রকৃতে মাছ সে আর রাখবে না, তার প্রতিজ্ঞা!

টেন ছাড়লো। এর বাড়ীর খিড়ক দিয়ে, ওর বাগান ঘূরে, খানা-ডোবার উপর পুল পার হয়ে, মেটে পথ ধরে, আম-কঠালের বনের মাঝ দিয়ে টেন চল্লো—কিন্তু ঝাঁকানি যা দিয়ে চল্লো, তা চিরকাল মনে থাকবে! আমরা দোলা পেঁয়ে কে কার ঘাড়ে গাঁড়ে পাড়ি! তারি মধ্যে আশু, বাজলা নিয়ে অহা-কসরৎ স্বর ক'রে দিলে,—

“ফাগুনে এ দোদুল দোলা দুলিয়ে দে—”

প্রাণ ধায় আর কি! একে গরমের ভীষণ তাত্—তার ঐ আওয়াজ! আর একি ফাগুনের দোল! চেতের দোল বটে! ধূলো আর কয়লার গুঁড়ো মেঁয়ে তেক্ষণ ছাঁচি ফাটিয়ে শেয়াখালায় এসে নামলুম, তখন স্লথ্যা হয়ে গেছে। এতক্ষণ অবধি নেউগী প্রচন্ড উৎসাহে মামার-বাড়ীর নানা গল্প করছিল। চেতেনে এসে দেখি, তার চোখ একেবারে মিন-মিন, করছে কাঁচের প্রতুলের চোখের মত! আমরা বললুম—কোথায় হে তোমার মামার-বাড়ী?

নেউগী ঢোক গিলে বললে—সে কি চেতেনের পাশেই নাকি! চলো! পথে নেমে নেউগী তাকে-একে প্রশ্ন করে, বাড়ীটা কোন্ দিকে। সকলে বললে,—মামার-বাড়ীর পথ জানো না?

নেউগী বললে,—বা রে, সেই কবে এসেছিলুম ছোট মামার বিয়ের সময়! তাও চেতেন থেকে পাল-কী ক'রে গিরেছিলুম, সে কি চিনতে পারি এখন?

তার কথায় আমরা ঘৃষ্ণড়ে গেলুম! কিন্তু সে ক্ষণকের জন্য! ঘৃষ্ণড়ে পড়লে চলবে কেন? আমরা অ্যাডভেঞ্চারে বৈরিয়েছি, তরুণের দল—

না জানি তুম, না জানি যোরা শক্তি—

মরুর বৃক্কে হাস্যমুখে বাজিয়ে বাব ডঙ্কা!

হাসি-গল্পে পল্লীর পথ সচাকিত ক'রে আমরা চললুম কোন্ অজানা কলের মধ্যে, তা না ব'রেই। দিকে দিকে অন্ধকার নেমে আসছিল—সামনে গাছপালা-গুলো বেন প্রকাণ্ড দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে মনে হ'চ্ছিল। আমাদের দলের মটকু—তার ছিল ভূতের ভূঁ; কথাটা আমরা জানতুম। সে শুধু কথা বল্থ ক'রে মাঝে মাঝে আমাদের হাত চেপে ধরছিল! সহরে থেকে আমরা ভাবতুম, পাড়াগাঁ কি সোনার দেশই না হবে! গাছের ছায়ায় ছায়াকরা সোজা-পথ চলে গেছে গ্রামের বৃক্ক ধরে—গাছে-গাছে দোয়েল-শ্যামা নহৰৎ বিসরে দিয়েছে...পথের পাশে হাঁড়ি-কলসীর দোকান—কোথাও বা খোলা মাঠ—তার একটি সীমায় কাপড়ের

বোনা পাড়ের মত গ্রামের শির ছবির মতই আঁকা—এসে দেখলুম, সেটা কবিদের কল্পনা শুধু! এ যে আধাৰ-ভৱা এবড়ো-ছেবড়ো পথ, ধূলোয় ভৱা...কোথায় দোকান, কোথায় বা খোলা মাট। পচা ডোবার পাঁকের গন্ধ ঘাবে ঘাবে সন্ধ্যার সেই রোদে-পোড়া ঝল্সানি হাওয়ার ভেসে এসে প্রাণটাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে!...

কোনোয়তে নিশানদারী ক'রে নেউগীৰ মামা-বাড়ী এসে পেঁচনো গেল—বাড়ীৰ পাশে একটা পুকুৰ, সামনে মস্ত চাঁপ্য গাছ। সদৱে বড় বড় গুল্ম-বসানো প্ৰকাণ্ড কপাট-ভেজানো ছিল। ঠেলা দিয়ে ভিতৱে ঢুকলুম—একৱাণ অন্ধকার অৰ্থন চোখেৰ সামনে জমাট বেঁধে উঠলো। মনে হলো, অন্ধকারেৰ মস্ত সভা বসেছিল এই সদৱ-কপাটৰ আড়ালে—সেখানে ষত যিশকালো অন্ধকার জমাট বেঁধে কি বড় মন্ত্র পাকাচ্ছিল—আমাদেৱ দম্ভুকা হাসিৰ ঝটকায় সাড়া পেৱে তাৱা একবাৰ চম্কে ক্ষিৰ হয়েই তাৱপৰ কোথায় যে উৰে গেল! একটু হতভন্দৰ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

এ বাড়ীতে এই রাত্রে এসে ভাল কাজ কৰিনি দেখছি! নেউগীৰ মহা অপ্রতিভ! মোমবাতি আৱ দেশলাই ছিল সঙ্গে, জৰালুম। আলো ফুটলে দোখ, সামনে এক মস্ত আটচালা। নেউগীৰ বললে—দাওতো হে একবাৰ রাঁতিটা; মালী বাড়ীৰ পাশেই থাকে—বলে সে কাৰো জৰাবেৰ অপেক্ষা না রেখেই বাঁতি নিয়ে বড়েৰ মত সাঁ কৰে অন্তৰ্ভুক্ত হলো।

আমৱা হতভন্দৰ! মটকু তো একেবাৱে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে উঠল,—নেউগীৰ ওৱ মালী দিয়ে আমায় ছেলেনে পেঁচেছে দিক—আমাৱ এখানে থাকা হবে না। শেনে কি চোৱ-ডাকাত এসে থূন কৰে রেখে ঘাবে!

নৱেন বললে,—চোৱ-ডাকাতে, না ভূতে?

মটকু প্ৰায় ক্ষেপে উঠে বললে,—না, ঘাও, সতী বলাছ, ও-সব চালাকি ভালো লাগে না। কি যে বলো! অজনা জায়গা...ও-সব নিয়ে তামাসা ভালো নয় কিন্তু!

নেউগীৰ ফিরে এল, এসে বললে,—মালী ঘৰে নেই। আমাদেৱ যে গোমন্তা আছে, তাৱ বাড়ীতে রক্ষাকালীন-পঞ্জো—লোক খাওয়ানো আছে, সেখানে গেছে।

আমৱা বললুম,—বেশ! আমাদেৱ প্ৰাণৰক্ষাৰ তাহলে উপায়? খিদে ঘা পেয়েছে—

নেউগীৰ ফিরে এল, এসে বললে,—মালী ঘৰে নেই। এই আটচালাৰ ওধাৱে ভিতৱ-বাড়ী; সেখানে রাজ্ঞাঘৰ ঘা আছে, ইয়া,—আমাদেৱ ইন্দুলেৰ হলৈৱ চেয়েও বড়।

আমৱা বললুম,—আৱে, রাজ্ঞাঘৰ তো আৱ ঘা। মস্ত ঘৰ হলো-ত কি হলো তাতে? খাবাৱেৰ জোগাড় চাই তো!

নেউগীৰ বললে,—এৰ্থন জোগাড় কৰছি!

ଅନ୍ତୁତ ଯତ ଭୂତେର ଗମ—

ଷ୍ଟଣୀ



କାଳୀର ମୁଖେ ଏକଟୀ—'ବୁ-ଉୁ-ଟୁ-ଟୁ— ଗନ୍ଦ କରିଯା ସମ୍ମତ ମଶାରୀ
ଛି' ଡିଯା। ସର୍ବାକ୍ଷେ ଜଡ଼ାଇଯା।

অন্তুত যত ভূতের গল—

অ্যাডভেঞ্চার



চুমে সকলে আচ্ছন্ন, এমন সময়ে এককাও বাধ্লো।

নরেন মটকুকে বললে,—শুনহো, রক্ষাকালী-পূজো! তিথিটা তাহলে কি হলো?

মটকু বললে,—যাও, ও-সব ইয়াকিং ভালো লাগে না। আমি এখনি চলে যাব। তোমাদের দিন দেখা নেই, কিছু না—এই অমাবস্যায় বেরনো—

আমরা এখনি হো-হো করে হেসে উঠলুম যে, বেচারীর কথা আৱ শেষ হলো না।

আমাদের কাছে বাতি ছিল কড়জন। তারি চার-পাঁচটা জেৱলে ঘূৰে দেখি, আঠচালায় যেৰেৱ একখানা ছেঁড়া ধূলো-মাঝা জাজিয়ে পাতা আছে। তাৱ শ্ৰী দেখলো মনে হয়, নেউগীৰ মামার বহু-প্রাচীন প্ৰৱৰ্পণৰ ব্যখন নবাব আলীবেশৰী'ৰ আমলে এখনে বাস কৰতে আসেন, তখন সেটা রাজমহল থেকে বৰ্তৰ সঙ্গে এনেছিলেন। তুই পৰোয়া নেই—তাতেই গা ঢেলে সব বসে পড়লুম। আশু বসতে পেয়ে হারমোনিয়ামের বাজ্জা ধূলে বাজনা সৰু কৰে দিলৈ। মটকুৰ পানে চেয়ে দেখি, তাৱ মৃৎ একেবাৰে শুকিয়ে আম্সি হয়ে গেছে!

নেউগী এৱি মধ্যে ঘূৰে এসে বললে,—গোমস্তা-বাড়ী থপৰ গেছে, আমরা এসেছি।

নেপেম বললে,—আমাদেৱ সঙ্গে কলা, কেক, আৱ পাউরুটি আছে তো— এখনকাৰ মত তাৱ সম্বাৰহাৰ কৰা যাক, এসো!

জল? তাইতো—তেন্তোঁয় গলা বৈ শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে! নেউগী আৰাৰ বলেছিল—জল, জল খবে কি? সেখানে থালি ডাব! যত চাও, ধেয়ো। সে-ডাব তো দেখীচি, এখন গাছেৱ মাথাৰ—জলও কোন্ পাঁকভৱা পুৰুৱে!—উপাৱ? ভাবনাৰ পেটেৱ কিধে পেটেই রাখে গেল।

আমি বললুম,—জল না পেলে ঐ পাউরুটি খাওয়া?...আৱ বৈ পাৱে পাৱুক, আমাৰ তো গলা দিয়ে নামাবে না!

নেউগীৰ আৰাৰ অন্তৰ্ধৰ্ম! থানিক-পৱে সে ফিৱলো—দেখি তাৱ সঙ্গে একজন লোক। নেউগী বললে,—উঠে পড় হে, ওঁদেৱ পূজোবাড়ীতে গিয়ে থেতে হবে সব। আমাদেৱ নিয়ে বাবাৰ জন্য লোক এসেছে!

আমরা যেন প্রাণ পেলুম! বলে উঠলুম,—We are ready.

জিনিষপঞ্চলো একটা বৰে রেখে আমৰা ধূলো-পায়েই বাতা কৱলুম। সেখানে মৃৎ-হাত ধূয়ে আহাৰাদি শেষ হলো ব্যখন, তখন রিস্ট-ওয়াচে দেখি, বাবোটা বেজে সাইঁতিশ মিৰিন্ট হয়েছে! এবাৱ ফিৱে নিম্ন দিতে হবে...সাৱাদিন বা টাল-মাটাল গেছে!

পূজোবাড়ীৰ চোকাঠ পেরিয়ে পথে থানিকটা এসে দেখি, আৱ এসোৱ কাৱ সাধ্য? ভৌইগ অন্ধকাৰ! যেন জালা-জালা কালি ঢেলে কে আকাশ থেকে প্ৰথিবীৰ ফাঁকটুকুকে বৰ্জিয়ে কালো কৰে দিয়েছে! এগুতে গেলে থানাৱ পাড়ি, কি গাছেই

মাথা ঠুকে মাথা ফাটাই, তার ঠিক নেই! ঘটকু বলে উঠল,—যে যাবে যাক, আমায় এই পুঁজোবাড়ীর রোয়াকে বলে-কয়ে একটু জায়গা করিয়ে দাও ভাই!

নেউগাঁই বললে—পাগল আর কি! তাও কখনো হয়? তারপর সে বললে,—দাঁড়াও, আমি আলো আনি।

নরেন বললে, দাঁড়াবো কি। এখানে দাঁড়ালে সাপে এরীন ছোবল দেবে। এই তো তাদের বেরুবার সময়। চৈত্র মাসের অন্ধকার রাতেই তাদের মেলা বসে।

ঘটকু বললে,—রাতে নাম করছিস? লতা বলতে হয়! না ভাই নেউগাঁই, আমি আজ এ পুঁজোবাড়ীতেই থাকবো। বলে-কয়ে আমার শোবার ব্যবস্থা করে দাও। নরেনের সঙ্গে কোন ভদ্রলোক থাকতে পারে না।

নেউগাঁই কি করে! বেচারী আবার সেই পুঁজোবাড়ীতে গেল, আর আধ-বশ্টা পরে প্রকান্ত এক মশাল জেবলে নিয়ে এলো—সেই মশালের আলোয় আমরা ডেরায় ফিরে এলুম!

তারপর সেই আটচালায় গড়া-গড়া সব শূয়ে পড়লুম! শূধু নরেন বসে রইল। আমরা বললুম,—শো না রে...

নরেন বললে,—আমায় ভাই একফোটা নম্বৰভাইকা দে, আমার পেটটা ভারী কামড়াচে।

সঙ্গে হোমিওপ্যার্থ ওষুধও ছিল—নরেনের বাতিক। সে বললে,—যদি যাঁচ সহরের বাইরে তো দুঁচারটে ওষুধ নেওয়া যাক! ফস্ত করে যদি কারো পেটের অসুস্থ হলো, কি জরু হলো, কি মাথাই ধরলো, কাজে লাগ্বে। তাই সে কটা হোমিওপ্যার্থির শিশি, কুইননের পিল, আ্যাসপিরিণ আর স্ট্রেলিং সল্ট নিয়ে এসেছিল।

শোবামাত্র আমাদের ঘূৰ এলো। ঘূৰের অপরাধ কি? কতক্ষণ ঘূৰিয়েছি, জানি না,—হঠাতে নরেনের বিষম ঠেলায় ঘূৰ ভেজে গেল! ঘটকু সেই ঠেলার এখন বিশ্রী চীৎকার করে উঠলো যে, আমার মনে হলো, একটা সবৰ্বনাশ হয়ে গেছে! হয়তো কোথাও থেকে একটা বাষ এমে কাকেও টেনে নিয়ে গেছে, না হয় তো বাড়ীটার ডাকাত পড়ে কারও মাথা কেটে নিছে! ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। ব্যাপার কি?

নরেন বললে,—এই দ্যাখো—বলেই সে জাজিমের একটা কোণ তুলে খরলে। দেখি, মল্ল একটা গৰ্ত্ত, খৰ্চির মাপে চওড়া।

আমরা বললুম,—এ দেখে কি হবে?

নরেন বললে,—সরে পড় এখান থেকে। বুঝছো না, সাপের গৰ্ত্ত এটা?

ঘটকু বললে,—আবার ঐ কথা! না ভাই, নরেন যদি এখানে থাকে, তাহলে আমি কখনই থাকব না। ষত বলি, রাতে নাম করতে নেই, লতা বলতে হয়, তত থালি-থালি ঐ নাম।

খানিকটা তক্ত তুলে ফল হলো এই যে, সে-রাতে আটচালার শোওয়া হল না,
বাড়ীর বাইরে রোয়াকে গিয়ে সব গা গড়িয়ে দিলুম।

পথের দিন ভোর হলে ঘটকুকে ধরে রাখা গেল না। সে সকলের উপরোধ-মান
তুচ্ছ করে কলকাতায় চলে গেল। আমরা থেকে গেলুম। পাড়াগাঁটা দেখবো না?
রাতে ঘূর্ম হয়নি—না হোক, সকালের হাওড়াটকু ভারী যিঠে লাগছিল! নেউগাঁৰ
মামার পুরুরাটি চমৎকার—তার পরিষ্কার জল দেখে নাইবার বাসনা প্রবল হয়ে
উঠলো। পালিত বললে,—পুরুরে মাছ আছে অনেক—ঘাই দিছে, দেখে? ধরতেই
হবে!

তাছাড়া, খাবার উপন্থৰ ছিল না, পুজোবাড়ী থেকে নিম্নলগ এসেছিল। থেয়ে
সারাদিন টো-টো করে ঘূরে গ্রামখানি দেখা গেল।

আমাদের চোখে সবই বেশ লাগছিল। বড় বড় বাগান, আমের গাছ, কাঁচা আম
বেশ বেড়ে উঠেছে...পাথীর ডাক, নিরবিল ঘূর্মন্ত ভাব, ঘোমটা-চাকা ঘেরদের
কলসী কঁথে জল আনতে শাওয়া,—লোকজনের ছুটছুটি নেই, শান্ত কেমন সব—
আমাদের মনে ভারী যিঠা সুর বেজে উঠল চারিধারে।

সন্ধ্যার ঠিক আগে পুজোবাড়ীর ভাসান। ঠাকুরের সঙ্গে আর একবার সারা
গাঁ ঘূরে বিসর্জন সারা হলো। নেউগাঁ বলে দিলে,—আজ রাতে আর থেতে শাব
না, যে অশ্বকার পথ! খাবার পাঠিয়ে দেবেন।

তাই হলো। থেয়ে আমরা সে-রাতে দোতলার দাঁকপের দালানে বড় একটা
বিছানা পেতে মজলিস বসিয়ে দিলুম। অনেক রাণি অবধি গাম-বাজলা চল্লো;
তারপর ঘূর্মে চোখ ঢুলে এসে গড়া-গড়া শুরে পড়লুম।

ঘূর্মে সকলে আচ্ছম, এমন সময়ে এক কাণ্ড বাধলো। নরেন ঠেলা দিয়ে
ডাকলে,—ওরে ন্যাড়া, শীগঁগার ওঠ।

আমি ধড়াড়িয়ে উঠেই জিজ্ঞাসা করলুম,—কি, সাপ বেরিয়েছে নাকি?

নরেন কাঁচুমাচুভাবে বললে,—না।

দালানের দু'কোণে দু'টো বাতি জ্বলছিল—তারির আলোয় দৌখি, তার মুখের
রঙ—একদম সাদা ফ্যাকাশে!

আমি বললুম, সাপ নয়, তবে কি?

ব্রহ্ম চাপা গলায় ভরে ভরে নরেন বললে,—ঐ শোনো—

কাণ পেতে শুনলুম,—পাশের তালাবন্ধ ঘরে ছোট ছেলের গোঙানির ঘত একটা
শব্দ, তারপর সব চুপচাপ! তারপরই ভয়ানক একটা দাপাদার্পি—যেন ব্রহ্ম মারামারি
চলেছে! আর দোর-জনলায় কে লাঠি ঠুকছে!

গা ছম্বছম্ব করতে লাগলো। দলের সকলকে ব্যাপারখানা বলা হলো। অত-
বড় সাহসী যে নেউগাঁ, সে তো একেবারে আমাদের দু'-তিনজনকে জড়িয়ে ধরলো!

সকলে ছুপ—কারো মন্তব্ধে কথা নেই! —আর আমার বুকের মধ্যে? ওঃ, সে যেন দুর্ভূত মন্তব্ধের ঘা পড়ছে—এমনি প্রচণ্ড শব্দ!

মনে হচ্ছিল, প্রাণটা ব্যাখ্যা এখনি থেঁতো চুরমার হয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে! আশু—বললে,—দেখো, ওদের বাড়ীতে একটা লোক বলচিল, রাতে আপনারা ও-বাড়ীতে থাকবেন না, ও-বাড়ীতে ভয় আছে। শুনে আমি তখন হেসেচিলুম। এখন দেখছি, তার কথা শোনা উচিত ছিল।

গালিত বললে,—আমাদের তখন বল্লি না কেন?

কিন্তু তখন আর বলে ফল কি? খুব বট্টপট্ট আওয়াজের পর বাড়ীটা স্তম্ভ গুরু হয়ে থাকে—আর বাইরে বাতাসের সৌ-সৌন্দর্য গজর্ন! আকাশে মিট্টি টেকে তারা—মনে হচ্ছিল, ভৱস্কর একটা কাণ্ড ঘটে যাবে, তাই গাছপালা অধীর হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলছে!

অবস্থা শেষে এমন হলো যে, সকলে সে-বাড়ী ছেড়ে বেরিবো, তার উপায় রইল না। মনে হলো, আমরা বেরিয়ে পড়লে ওরাও দলসম্মত ছিটে এসে পাছ নেবে? তখন? কি যে হবে তখন, কে জানে! গাঁরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কোন-মতে জেগে সাহস করে বসে থাকাই যাক! একবারে উদ্যত হয়ে, যদি ওরা বেরিয়ে এসে আক্রমণ করে তো একবার লজ্জতে হবে—শেষ চেষ্টা!

এমনি করেই এক জায়গায় গুড়ি যেরে বসে সারা রাত্তিটা যে কেমন করে কাটলো, সে কথা আর বলে কাজ নেই। আমাদের সে দুর্দশা আর তখনকার মৃত্যু-চোখের ভাব দেখলে অতি বড় পাষাণ-শত্রুর চোখেও জল আসতো!

ভোর হলে আস্তে সব বেরিয়ে এলুম—ভারী সন্তর্পণে, ভারী হৃৎশয়ার হয়ে—পেছনে কেউ তাড়া না করে। জিনিসপত্র সেই দালানেই পড়ে রইল। আশু—তার বাজনাটা নিতে যাচ্ছিল। তাকে একচড় লাগিয়ে আমি বললুম—আগে প্রাণ বাঁচুক, তারপর বাজনার খেঁজ করিস! নেউগাঁৰির উপর রাগ হচ্ছিল যা, ওঃ! এমন হতভাগার সঙ্গেও দেশ-ভ্রমণে বেরোয়! যদি বন্ধু না হতো, তা হলে তার মাথাটাই এক চড়ে উড়িয়ে দিতুম।

নীচের রোয়াকে মালীটা ঘূর্মাচ্ছিল—তাকে দিলুম এক ঠ্যালা। ঠ্যালা খেয়ে সে জেগে উঠল। তারপর বাইরে পথে কতক্ষণে সবাই পায়চারি করে, খানিক সূস্থ হয়ে মালীকে নিয়ে উপরে এলুম—তাকে ঘর খুলতে বললুম।

মালী বধন ঘরের তালা খুলচিল, আমরা তার পিছন থেকে ঘরটার মধ্যে উঁকি যেরে দেখছিলুম,—মড়ার মাথার খুলি, কি কক্ষাল, কি কারো রক্তস্তুপ পড়ে আছে কি না!

কিছু নাঃ মালী ঘরে ঢুকলো, ঢুকেই জানলা খুলে দিলো—সকালকার রোদ্ধু অর্মানি ঘরের মধ্যে দৃঢ়িয়ে পড়লো,—ঘর আলোয় আলো হলো!

মরের ঘণ্টে আমরা ভয়ে ভয়ে পা বাঁড়িয়ে ঢুকলুম। তারপর যা কাষ্ঠ দেখলুম—ওঁ, হেসে আর বাঁচ না! মরের কার্নিশে একরাশ চার্চিকে আলো পেয়ে তাল পাকিয়ে ছিল, ঠিক যেন একরাশ কালো ঝুলের পুটলী!

দিলুম তাড়া।—ঝট্টট্ৰ করে তারা ঐ কার্নিশের হোকরেই ফের লেপটে রইল, ঠিক যেন শিক-ভাঙা ছাতার কাপড় খানিকটা।

নরেনকে বললুম,—দেখ দিক, ঐ চার্চিকের ভয়ে কাল ঘূর্ণতে দিস্তি!

নরেন বললো,—কেন, মশায়রা তখন দেখতে পারেন নি? তব শুধু আমার হয়েছিল,—বটে?

ঠিক দালানের দিকের জানলাটা আমরা দালানে ঢুকেই বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়েছিলুম—কাজেই বেচারীয়া বেরুতে না পেরে ডানা ঝট্টট্ৰ করে মরেছে সারামাত, আৱ আমাদের ভয় দেখিয়েছে।

বাই হোক,—দুর্গাপুর ব্যাপারে চোখ সকলের জৰলে লাল হয়ে উঠেছিল। আশুর জুন্দের মত হয়েছিল, নরেনের আমাশা দাঁড়ালো। তখন পঞ্জীয় আনন্দ পঞ্জীয় বুকেই গাছিত রেখে আমরা না খেয়েই বৈরিয়ে পড়লুম ছেশনের দিকে। তারপর যে টেনটা পাওয়া গেল, তাতে চড়েই একেবারে কলকাতায়।

ওৱে আমাদের গাঢ়ী-বোঢ়া, লোক-জনের ভিড়ে-ডৱা সহর কলকাতা। ওৱে আমাদের প্যাসের-আলোয় আলো-করা, গাছ-পাতার চিহ-ছাড়া কলকাতার পথ-বাট, বেঁচে থাকো, আমাদের ডয়-ভঙ্গা সহর! পাড়াগাঁ ষেখানে আছে, সেইখানেই থাকুক, ওধারে আৱ যাচ্ছ না অন্ততঃ সন্ধ্যাৰ পৰ!



ନମସ୍କାର

—ଶୈଳଜାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ

ଅନେକ ଦିନ ବୈକାର ସମେ ଥାକବାର
ପର ଚାକରୀ ପେଲାମ । କିନ୍ତୁ ଚାକରୀ
ସେଥାନେ ପେଲାମ—ସେ ଏକ ଭୀଷଣ
ଜାଗରା । ସହଜେ ସେଥାନେ ବଡ଼-ଏକଟା
କେଉଁ ଥାଯ ନା । ଆମାର ଆଗେ ଯାରା ଗେଛେ, ସକଳେଇ ମରେଛେନ ଏବଂ ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଘୃତ୍ୟ ! ରୋଗ ନେଇ, ବ୍ୟାଧି ନେଇ, ସାରାଦିନ କାଜକର୍ମ କରେ ରାତେ ଖାଓୟା-ଦାଓୟାର ପର
ବିଛାନାଯ ଶୁରୁରେଛେନ, ସକାଳେ ଦେଖା ଗେଲ, ତିନି ଆର ଉଠେଛେନ ନା, ବିଛାନାତେଇ ମରେ ପଡ଼େ
ଆଛେନ ! ମୁଖେର ଚେହାରା ହେଁ ଗେହେ— କିନ୍ତୁତ୍ତକିମାକାର ବିଶ୍ଵା ! ମନେ ହୟ, ଯେନ ମରବାର
ସମସ୍ତ ତିନି ଡର ପେରେଛିଲେନ ! କିନ୍ତୁ କେନ ଡର ପେରେଛିଲେନ, କିମେର ଡର—ସେ ସର
ତଥନ କେ ଆର ବଲବେ ?

ଆମାର କିନ୍ତୁ ଭର ବଲେ କୋନ କମ୍ତୁ ଛେଲେବେଳା ଥେକେଇ ନେଇ, ତାଇ ଏକଟ୍‌ଖାନ

ভরসা হলো। ভাবলাম—চোর-ডাকাত যদি খন করে দিয়ে যাব, সে এক কথা আলাদা, তাছাড়া আর-কিছুর ভয় আমি করি না।

যাই হোক, মরি মরব; অর্থাত্বে দিনে দিনে তিলে তিলে ঘরার চেরে সে বরং চের ভালো।

চাকরী নিলাম। জারগাটা বেশ দ্বরে নয়। বাংলা দেশের মধ্যেই। বড় একটা ষ্টেশনে গাড়ী বদল করে ছোট একটি গ্রাম লাইনের টেণে চড়লাম। কথা ছিল লাইন থেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেইখানেই আমার কাজের জাগরা। সম্ম্যার একটু পরেই আকাশে চাঁদ উঠেছে! শরৎকালের নীল নিশ্চল আকাশ। শূন্য সূন্দর জ্যোত্স্নালোকে উন্ভাসিত ছোট ছোট গ্রাম, সবজ ধানের ঘাস আর গাছপালার মাঝখান দিয়ে ছোট লাইনের ছোট ট্রেণখানি আমাদের এগিয়ে চলেছে। দ্বরে দ্বরে একটি করে ষ্টেশন। টিম-টিম করে দ্ব-একটি কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। দ্ব-একজন লোক নামছে, দ্ব-একজন উঠেছে; লোকজনের কোলাহল নেই, গোলমাল নেই, দ্ব-একটি ছোট-খাটো কথা, ইঞ্জিনের সাঁই সাঁই শব্দ আর গার্ড-সাহেবের হইশ্চল।

জনালার হাত রেখে বাইরের পানে তাকিয়ে ছিলাম। ট্রেণের বাটী নিয়ে পামের পথে কোথাও-বা একটি গরুর গাড়ী চলেছে, কোথাও-বা অঁকা-বঁকা ছেট একটি শুরুনো নদীর সাদা বালি চাঁদের আলোর চিক চিক করছে! দ্বরের অস্পষ্ট গ্রাম ধৈঁয়ার মত কুয়াশায় ঢেকে গেছে, লাইনের ধারে ধারে শূন্য সূন্দর কাশের গুচ্ছ বাতাসে দ্বলছে, মাঝে-মাঝে দ্বরের গ্রাম থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি।

গাড়ী আমাদের কখনও দাঁড়াচ্ছে, কখনও চলছে।

মাঝে কোন সহয় আমি ঘূরিয়ে পড়েছিলাম। ঘূর যখন ভাঙলো, চেরে দেখি,—আমার কামরা একেবারে ফাঁকা। বাঁরা ছিপেন, কখন বৈ তাঁরা নেমে গেছেন, কিছু বুঝতেই পারি নি। পেছনে পারের শব্দ হতেই ফিরে দেখলাম—আপাদ্বন্দ্বিত সাদা চাদরমণ্ডি দিয়ে কালোমাত প্রকাণ্ড লম্বা এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কেন আসছেন বুঝলাম না। সে রকম লম্বা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। কাছে আসতেই আমি তাঁর মুখের পানে তাকালাম। কালো কিম্বত-কিম্বাকার সে এক অল্পত মুখ। মানুষের মুখ বলে মনে হয় না। ঠিক বেন ছাগলের মত। এক-একটা পাঁঠার যেমন দাঢ়ি থাকে তেমনি দাঢ়ি; গৌঁফগুঁলি একটি একটি করে গোনা যায়! আর সেই কালো মুখের ওপর অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল গোল-গোল সাদা দৃঢ়ো চোখ!

চোখে আমার ঘূরের ঘোর যদি-বা একটুখানি ছিল, লোকটাকে আমার সুমুখের বেশে বসতে দেখে সেটুকুও উড়ে গেল!

কারও মৃখে কোনও কথা নেই! শেষে তিনিই আমার দয়া করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাওয়া হবে?'

গলার আওয়াজও তেমনি! ঘনে হলো, যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরোচ্ছে।

বললাম, 'শালবুনি'

তিনি বললেন, 'চলুন, আসি ও যাব!'

বাধিত হলাম।

চাকরির জায়গায় পৌছাতে না পৌছাতেই এই!

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি শালবুনিতেই থাকেন?'

ঘাড় নেড়ে জানলেন, 'না!'

কোথায় থাকা হয়, সেকথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হলো না। বললাম, 'সম্মান কোম্পানীর যে লোহার কারখানাটা তৈরী হচ্ছে, ষেশন থেকে সেটা কত দ্রে অশাই?'

'কাছেই!'

শুনে আশ্বস্ত হলাম।

বললাম, 'আচ্ছা বলতে পারেন মশাই, শুনছি নাকি তিন-চারজন লোক সেখানে মারা গেছে? কেন মারা গেছে, জানেন আপনি?'

তিনি তখন অন্যদিকে মৃখ ফিরিয়েছেন। কোনও জবাব পেলাম না। সবর্বনাশ! তবে কি এইখান থেকেই সঙ্গ নিলেন নাকি? শালবুনি ষেশন আর কত দ্রে সেই কথাই ভাবতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে টেণের গাতি মন্ত্র হয়ে এলো।

ভদ্রলোক একক্ষণ পরে আমার দিকে মৃখ ফেরালেন। বললেন, 'কারখানায় চাকরী নিয়ে এলেন বৃক্ষি?'

বললাম, 'কি আর করি মশাই, পেটের দারে.....দ্রতিনাটি ছেলেমেয়ে—

তিনি বললেন, 'স্বাদ মারা যান?'

সেকথা নিজেও কতবার ভেবেছি, কিন্তু তাঁর মৃখ থেকে হঠাত এই কথাটা শোনবাত মাত্র বৃক্ষের ভেতরটা কেমন যেন ধৰক করে উঠলো। বললাম, 'তাহলৈ না থেতে পেরে সবাই মারা যাবে!'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেমেয়ে কৃটি?'

বললাম, 'তিনাটি। দ্রটি ছেলে, একটি মেয়ে।'

'সেলায়ে আর কে আছে?'

'বড়ো বাবা, মা, পিসী, মাসী, ভাগ্নে, ভাগ্নী—পোষ্যের আর অন্ত নেই মশাই!'

'হ্' বলে তিনি একবার বাইরের দিকে মৃখ বাঁড়িয়ে কি যেন দেখলেন! দেখেই

বললেন, 'বুড়ো মা-বাপকে থেতে দেওয়া ভালো! আজকাল অনেকে দেয় না। আমিও বুড়ো হয়েছিলাম যশাই, কিন্তু এম্বিন পাজি ছেলে—'

বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চেলেন এসে গেছে।'

গাড়ী কিন্তু তখনও থামে নি। তাঁর জীবনের গল্পটা শোনবার কৌতুহল হলো। বললাম, 'বস্ন না! গাড়ী ত আর এগোবে না।'

এই বলে পকেট থেকে একটা বিড়ি আর দেশলাইটা বের করে বললাম, 'খান।'

ভাবলাম, তাতেও যদি বসে তাঁর জীবনের গল্পটা বলেন! কিন্তু বিড়ি-দেশলাই তিনি হাত বাড়িয়ে নিলেন যাত, দেশলাইও জরুরলেন না, বিড়িও থেলেন না; গাড়ী আমাদের চেলেনে পেঁচে গেল এবং পেঁচেছোমাত্র দরজা খুলে তিনি নেমে পড়লেন। যাবার সময় একটা নমস্কার করে বিদায় দেওয়া দূরে থাক, আমার দেশলাইটাও ফিরিয়ে দেবার সময় তাঁর আর হ'ল না!

তৎক্ষণাত আমি তাঁর পিছু পিছু দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। তিনি ঠিক কোন দিকে যান দেখবার উদ্দেশ্যে যে ছিল না, তা নয়; অবশ্য আমার অন্য প্রয়োজনও ছিল। আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্মে কারখানা থেকে লোক আসবার কথা।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি—গাড়ী তখনও ঠিক প্ল্যাটফর্মে এসে পেঁচেয়ানি, তখনও গাড়ীখানা ধীরে ধীরে চলছে।

লোকটি কি তবে টিকিট করে নি? তাই টিকিট দেবার ভয়ে তাড়াতাড়ি নেবে গেল? কিন্তু অত বড় লম্বা চেহারা সহজে 'ত' চোখের আড়াল হবার যো নেই! জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক ঠিক দিনের মত স্পষ্ট পরিষ্কার, অথচ এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনদিকেই তাঁকে দেখতে পেলাম না! মানুষ বলে মনে-মনে ঘাঁই-বা একটুখানি সন্দেহ হয়েছিল, সেটুকুও এবার ঘুঁতে গেল। মানুষ কখনও এত সহজে চোখের স্মৃতি থেকে অদ্ব্য হয়ে থেতে পারে না।

বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল! একে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ন্তুন জায়গা, তাঁর আবার পেঁচেতে না পেঁচেতেই এই অভিজ্ঞতা! পেটের দায়ে চাকরী করতে এসে কি যে অদ্বিতীয় আছে কে জানে?

কারখানা থেকে দ্বিজন গুরুত্ব চাপুরাসী এসেছে, আর একজন বাঙালী ভদ্রলোক। গাড়ী থেকে আমার জিনিসপত্র তারাই নামালো।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একবার চারিসিকে চেরে দেখলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু শালের জঙ্গল। ছোট ছোট কয়েকটি পাহাড়ও দেখলাম।

ট্রেনের লাইন এইখানে এসেই শেষ হয়েছে। গাড়ীতে ওঠবার সময় লক্ষ্য করি নি, এখন দেখলাম—ট্রেনখানার দুর্দিকে দুটো ইঞ্জিন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একটা স্মৃতি, একটা পিছনে। এইবার পিছনের ইঞ্জিনটা পিছু হটতে স্বৰ্দু করলে। গাড়ীটা যেদিক থেকে এসেছিল, হস্ত হস্ত করে ধোয়া ছাড়তে আবার সেইদিকেই চলে গেল।

চারিদিক্ নিষ্জর্ণ! মাঝখানে ইস্পাতের বক্বকে লাইন চাঁদের আলোয় চিক্চিক্ করছে, এপাশে ছোট্ট একটি ষ্টেশন, আর ওপাশে আমাদের কারখানা। কারখানা হ'তে তখনও অনেক দুরি। প্রকাশ্ব বড় বড় লোহার ঘন্টপাতি এসে পেঁচেছে। অনেকটা জ্যায়গা জুড়ে নানান রকমের লোহালুকড় ইত্স্ততৎ ছড়ানো, আর তারই একপাশে আমাদের থাকবার জন্যে টিনের ছোট ছোট করেকৃটি অস্থায়ী ঘর তৈরি হয়েছে।

শুনলাম নাকি ওই টিনের ঘরেই আমার আগে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের জীবন-লীলার অবসান হয়ে গেছে। তবু সে-রাত্তির যত আমাকে সেইখানেই থাকতে হলো।

বাঙালী ছোক্রাটি জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমার জন্যে সে রাত্তা করে বেঁধেছিল। ঠিক হলো— নিজের হাতে রাত্তা আমায় কোনদিনই করতে হবে না, সে-ই রোজ আমার রাত্তা করে দেবে। সেদিন রাত্তে তাকে আর আমার কাছ ছেড়ে যেতে দিলাম না। খাওয়া-দাওয়ার পর সে আমারই কাছে ছোট্ট একটি বিছানা বিছিয়ে শুয়ে রাখলো। কাছাকাছি কোন্ একটা গ্রামে তার বাড়ী। নাম—যতীন।

প্রথমেই সে জিজ্ঞেস করলে, ‘আপনি ব্রাহ্মণ?’

বললাম, ‘হ্যাঁ।’

যতীন বললে, ‘বাস্, তাঁহলে আর আপনার ভয় নেই।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘ব্যাপার কি, বল দৰ্দি যতীন?’

যতীন বললে, ‘যারা মরেছে, তাদের ভূত মেরেছে কিনা! গেছো ভূতে। ভূত কখনও বাধ্মনকে মারে না! ওরা বাধ্মন কেউ ছিল না।’ বললাম ‘বাধ্মনকে মারবে না, তা তুমি কেমন করে জানলে যতীন?’ যতীন একটুখানি হাসল। হেসে বললে, পৈতৈ ছঁয়ে একবার যদি গায়ত্বী জপ করে দেন ত’ ভূতের বাবার সাধা নেই যে, আপনার কাছে এগোয়! তা নইলে ওদের তিন-তিনটেকে মেরে ফেললে, আর আমাকে মারতে পারতো না?’

ব্যাপারটা সত্তাই রহস্যজনক। কিছুই ব্রহ্মবার উপাস নেই। রাত্তে ভাল ঘূর্মও হলো না। অতি প্রভুষে শ্যায়াত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখন সবে স্মর্ম্যেদয় হচ্ছে। প্ৰবৰ্দ্ধিকে স্বৰ্জ বনের মাথার উপর আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া বইছে। জারগাটি বড় চমৎকার!

আমার বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখেই গুরু চাপুরাশী দু'জন সেলাম করে আমার কাছে এসে দাঢ়ালো। জিজ্ঞেস করলে, কাজ আরম্ভ হবে কি না এবং তা যদি হয়, তাহলে ওরা আশ-পাশের গ্রাম থেকে লোক ডাকতে যাবে।

বললাম, ‘যাও, তোমরা লোক নিরে এসো। কাজ আরম্ভ হবে।’

এখন আমাদের কাজ শুধু জঙ্গলের গাছ কাটা। কোম্পানী তার জন্যে আমার মঙ্গে দিয়েছে একশটাকা। তাছাড়া, টাকার দরকার হলৈই হয় হেড-আপসে জানাতে হবে, আর না হয় এখানকার জংশন-ষ্টেশনে কোম্পানীর যে চুণের কারখানা

আছে, সেখানে জানালেই তারা তৎক্ষণাত টাকা পাঠিয়ে দেবে। আমার ওপর হত্তুম—এক মাসের মধ্যে অন্ততঃ হাজার বিষে জমি সাফ করে ফেলা চাই।

চাপ্রাপীদের বলে দিলাম, ‘লোক তোমরা যত বেশ পারো নিয়ে এসো।’

তারা লোক আনতে চলে গেল।

ভাবলাম, আমার একমাত্র প্রতিবেশী ষ্টেশন-হাউটারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়েই করে আসিস। কিন্তু এত সকালে ভদ্রলোক দ্ব্য থেকে উঠেছেন কি না, কে জানে? একটু পরেই যাওয়া বাবে ভেবে, পারে-চলা যে সরু পথটি জঙ্গলের ভেতর গিরে ঢুকেছে, সেই পথ ধরে হাঁটতে সুরু করলাম। দ্বিপাশে শাল আর মহুর ছোট-বড় নানা ব্রকমের গাছ সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে। কিছুদ্বাৰা এগিয়ে ঘেতেই দোখ, শাখায়-প্রশাখায়, চিকণ কৰ্চ লতায়-পল্লে ক্রমশঃ তারা এমানিভাবে ঘন সুন্নিবন্ধ যে, বেশীদ্বাৰা দ্রষ্টি চলে না। যেদিকে তাকাই—শুধু গাছ আৰ পাতা, পাতা আৰ গাছ। মড়মদ বাতাসে পাতাগুলি ঝিৱ্ ঝিৱ্ ক'রে কাঁপছে, নানাবৰকমের অসংখ্য পাখী উড়ে উড়ে বেড়াছে। কোথায় হয়ত কেন, বনে গাছে বনে ফল ফুটেছে; তাৰই রিঁষ্ট সুগন্ধে বাতাস যেনে ভৱে আছে। চিঠি-বিচিত্রিত চমৎকাৰ একটি প্ৰজাপৰ্বত উড়তে উড়তে হঠাতঃ আমার গায়ে এসে বসলো। ইচ্ছে কৰলেই তাকে আৰ্ম ধৰতে পাৰতাম, কিন্তু ধৰলায় না। হাতীটি আমার চোখেৰ কাছে এনে যেই তাকে আৰ্ম ভাল ক'রে দেখতে গেলাম, রঙিন পাখা উড়িয়ে তৎক্ষণাত সে আমার হাতেৰ ওপৰ থেকে উড়ে পালালো। ছায়াপীতিৰ স্নিগ্ধ সেই অৱগেৰে মাঝখান দিয়ে ঘনেৰ আনন্দে অনামনস্ক হয়ে অনেক দূৰে গিরে পড়েছিলাম, পেছনে হঠাতঃ একটা ট্ৰেণেৰ শব্দে যেন আমার চৈতন্য হলো! এবাৰ ফিরতে হবে! ফেৱাৰ পথে বতই আৰ্ম সেই সতেজ সৰুজ গাছগুলিৰ পানে তাকাই, ততই আমার ঘনে হ'তে থাকে,—আৰ্ম যেন ওদেৱ পৰম শত্ৰু! কড়কাল ধৰে এৱা এইখানে এই ধৰিয়া-মাতার বুকেৰ ওপৰ সবজপালিত সৰ্বতনেৰ মত ধীৱে ধীৱে বেড়ে উঠেছে, বিশ্বেৰ বিস্ময় প্ৰাণবন্ত এই সব বিশাল মহীৱৰ,—আৰ্ম এসেছি তাদেৱ সম্মৈ উৎপাটিত ক'রে সবৎশে নিধন ক'ৰে দিতে! নিবিড় ঘন অৱগ্যানীৰ নয়ন-মনোহৰ এই স্নিগ্ধ শ্যাম রূপ আমাৰ নিশ্চিহ্ন ক'ৰে ঘূছে দিতে হবে, তাৰ পৰিবত্তে বসবে এখানে—এক বিৱাট কাৰখানা! —লোহা আৰ ইস্পাত, ইঞ্জিন আৰ আগণ!...আমার আগে থাঁৱা এলেম, নিজেৰ জৰীবন দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডেৰ প্ৰায়চিত্ত ক'ৰে গেলেন কি না, তাই বা কে জানে!

ট্ৰেণ এসেছে, আবাৰ চলেও গেছে। ষ্টেশন-হাউটার বসে বসে একটা মোটা খাতায় কি যেন লিখিছিলেন! মোটা-সোটা, বেঁচে-খাটো মানুষটি। পৰিচয় হতেই মুখখালি তাৰ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খাতা বন্ধ ক'ৰে তিনি গল্প জড়ে দিলেন।

বললাম, ‘কাজ কৰুন।’

তিনি বললেন, ‘ধূৎ তোরি কাজ! মানুষের মৃথ দেখতে পাই না মশাই, দুটো কথা বলৈ যে সুখ হবে, তা এই পাঞ্চব-বিজ্ঞার্ত দেশে তারও উপায় নেই! দিন না-মশাই চট্টপট্ট ওই গাছগুলোকে কেটে উড়িয়ে! তবু একটা কারখানা-টারখানা হবে, সহর বসবে, বাজার বসবে, লোকজন তবু দেখতে পাব।’

বললাম, ‘কিন্তু ওই গাছ কাটতে গিয়েই শূন্যছ, আমার আগে তিন-তিনজন—’

কথাটাকে তিনি আর শেষ করতে দিলেন না। টেবিল চাপ্টে চীৎকার করে বলে উঠলেন, ‘আরে দ্রু দ্রু! আমি ও-সব বিশ্বাস করি না মশাই, ভূত না আরও কিছু! ভূত না হয় মেরেই দিয়ে গেল, কিন্তু টাকাকাঁড়গুলো গেল কোথায়? সেগুলোও কি ভূতে নিয়ে গেল নাকি?’

কথাটা ভাল বুঝতে পারলাম না, তাই তাঁকে আর একবার ভাল করে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, তাঁর বিশ্বাস, ভূতে তাদের মারেনি, মেরেছে মানুষে। কুঁচি-বিদেয় করবার টাকাকাঁড়ি তাদের কাছেই থাকতো, সেই টাকার লোভে কেউ তাদের মেরে ফেলেছে!

তিনি বললেন, ‘আমার কিন্তু মশাই, ও গুরু চাপ্রাশী দুটোকে বিশ্বাস হয় না। বললে কথা শোনে না, ব্যাটারা যেন নবাব-পুরুর!’

বললাম, ‘কি জানি মশাই, কি করব, তাই ভাবছি।’

মাঞ্চারমশাই-এর টেলিগ্রাফ এসেছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। টেলিগ্রাফের কলটার কাছে গিয়ে টক্ টক্ করে কলটা বারকর্তক বাজিয়ে দিয়ে বললেন, ‘বলছি দাঁড়ান! আপনার আগে যে লোকটা এসেছিল, তাকেও বলেছিলাম; কিন্তু সে হিন্দস্থানী, বাঙালীর কথা শুনলে না, ভাবলে—বুঝি আমি ওর টাকাগুলো বাগাবার ঘতলবে আছি।’

কাজ শেষ করে তিনি আবার আমার কাছে এসে বসলেন। বললেন, ‘টাকাকাঁড়ি নিজের কাছে রাখবেন না দাদা, আমি ভাল কথা শিখিয়ে দিছি, শূন্যন।’

বলে তিনি ষ্টেশন-ঘরের দেওয়ালের গায়ে-লাগানো একটা আয়রণ সেফ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ওইখানে রাখতে পারেন। পরের টাকা ওখানে রাখতে অবশ্য আমি দিতায় না, কিন্তু আপনি একে বাঙালী, তায় বাঙ্গল; তাই বলছি, একবার রেখে দেখন দেখি—কি হব। রাত দশটায় আমার শেষ ট্রেনখানা পাই করে দিয়ে আমি আমার বাসায় চলে যাই, সেই সময় চাবি আমি সঙে করে নিয়ে চলে যাব। আপনি ইচ্ছে করলে রাতে এখানে শূরুও থাকতে পারেন। বেশ করে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে এই টেবিলের ওপর তোফা আরাম করে নাক ডাকবেন মশাই! টাকা থাকবে ওই আয়রণ চেষ্টের মধ্যে, দেখন ত’, দেখি ভূতে কেমন করে মারে?’

পরামর্শ মল্ল নয়।

ଯାବାର ଜୋଗାଡ଼ କରିବାର ଜଣେ ଯତୀନ ଆମାର କାହେ ଟାକା ଚାଇତେ ଏଲେ, ଟାକା ଦିଯେ ବଲଲାମ, 'ରାତ୍ରେ ଆମି ଏଇଥାନେ ଥାକବ ସତୀନ !'

ସତୀନ ହେସେ ବଲଲେ, 'ବୁଝାତେ ପେରୋଛ, ବାବୁ ଭୟ ପେଯେଛେନ । ତା ଆପନାର ଭୟ କି ବାବୁ, ଆପନି ବେରାଙ୍ଗ ମାନ୍ୟ—ଆମି ତ' ତଥନ ଆପନାକେ ବଲେଇ ଦିଲାମ !'

ଗୁର୍ଖୀ ଚାପ୍ରାଶୀ ଦୁଃଖନ ବେଶ କାଜେର ଲୋକ । ଗାଛ କାଟିବାର ଜଣେ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାଶଜନ କୁଳ ତାରା ଧରେ ନିଯେ ଏଲେ । ଏକଶ' ଟାକା ଆର କତଞ୍ଚି ! ଦିନେର ଶେଷେ କୁଳଦେର ମଜ୍ଜିର ଦିତେ ଗିଯେ ଦେଖି—ଅନେକଥାିନ ଜ୍ଞାନଗ୍ରହ ତାରା ପରିଷକାର କରେ ଫେଲେଛେ ।

ରାମଲାଲ ଗୁର୍ଖୀ ବଲଲେ, 'ବାବୁ, ହେଟ୍-ଆପିସ୍-ସ୍ମେ ବହୁଟ୍ ରୂପେଯା ମାନ୍ୟା ଲେନ !'

ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ, 'କାଜ କି ତାହାଲେ ଏତଦିନ ହୟାନ ରାମଲାଲ ?'

ରାମଲାଲ ବଲଲେ, 'ଠୋଡ଼ା ଠୋଡ଼ା ହେସେ ବାବୁ !'

ଶିଉଶରଗ ବଲେ ରାମଲାଲର ସର୍ଜିଟି ପାଶେଇ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଛିଲ । ଦେ ବଲଲେ, ଉଠାବିଲୋକ ବହୁଟ୍ ରୂପେଯା ଚାରି କାରିଯେମେ ବାବୁ !'

ତା ହୟତ ହବେ । କିନ୍ତୁ ସେ-ଟା ତାଦେର କାଜେ ଲାଗେନି । ଟାକା ତ' ସମେର ବାଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଠୋଯା ନା !

ଯାଇ ହୋକ—ସେଇଦିନଇ ହେଡ-ଆପିସେ 'ତାର' କରେ ଦିଲାମ—ଏକସଙ୍ଗେ ଘୋଟା ରକମେର କିଛି, ଟାକା ଆମାଯ ପାଠିଯେ ଦେଓଯା ହୋକ, ନଇଲେ କାଜେର ଭାରି ଅସ୍ଵାଧି ହବେ ।

କିନ୍ତୁ ଟାକା ଆସତେ ଆସତେ ଅନେକ ଦେଇ ହେସେ ଗେଲ । ଆମାର ଆଗେ ସାରା ଏସେ-ଛିଲେନ, ତାରାଓ ହୟତ ଏମିନ କରେ ଟାକା ନିଯେଛେନ, କିନ୍ତୁ କାଜ ବେଶିଦ୍ଵାର ଏଗୋଯନି; ଅଥଚ ଟାକାର ହିସେବ ନା ଦିଯେଇ ତାରା ଘରେ ଗେଛେନ । ଏମିନ କରେ କୋମ୍ପାନୀର ଅନେକ ଟାକା କ୍ଷତି ହେସେଛେ । ତାଇ ଟାକା ନା ଏମେ କଳକାତାର ହେଡ-ଆପିସ ଥିକେ ଏଲେନ ଏକଜନ ଇଲ୍‌ପେଟ୍ରାର ।

କାଜ ଦେଖେ ତିନି ଖଣ୍ଧୀ ହଲେନ । ଅମ୍ବିକ୍ ଗାଛ ତଥନ ଆମି କାଟିଯେ ଶ୍ତୁପାକାର କରେ ଫେଲେଛି । ବନେର ଶ୍ୟାମଳ ତ୍ରୀ ଏକେବାରେ ନିର୍ମିଶ୍ଵଭାବେ ନଷ୍ଟ କରେ ଦିଯେ ଅନେକ-ଥାିନ ଜ୍ଞାନଗ୍ରହ ତଥନ ଫାଁକା କରେ ଦିଯେଇଛି । କିନ୍ତୁ କୁଳରା ବେତନ ପାରୀନ ପ୍ରାୟ ମୁକ୍ତାହ-ଥାନେକେର, ତାରା ଆମାଯ ତଥନ ଛିଁଡ଼େ ଥାଇଁ । ବଲଲାମ, 'ଟାକା ଆପନି ଗିରେଇ ପାଠିଯେ ଦେବେନ, ନଇଲେ କାଜ ହୟତ ଆମାର ବନ୍ଦ କରେ ଦିତେ ହବେ !'

ଇଲ୍‌ପେଟ୍ରାର ବଲଲେନ, 'ଟାକା ଆପନାର ପରଶ୍ରୀ ପେଣ୍ଠେ ଥାବେ । ଏଥନ ଏକ ହାଜାର ଟାକା ପାଠିରେ ଦିନିଛି, ଫୁରିଯେ ଯାବାର ଆଗେଇ ଜାନାବେନ ।'

ତାଙ୍କେ ଆମି ଟେଣେ ଚାଡ଼ିଯେ ଦିଯେ ଏଲାମ । ଶିଉଶରଗ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଗିଯେଛିଲ । ଫେରବାର ପଥେ ଶିଉଶରଗ ବଲଲେ, 'ଆରା ବେଶୀ ଟାକା ମାନ୍ୟା ଲେନ ବାବୁ, ଏକ ହାଜାର ଟାକା ଆରି କୋତୋଦିନ ଥାବେ ।'

বললাম, 'ফুরোলেই আবার পাঠাবে।'

যতীনকে প্রায়ই বলতাম, 'কই যতীন, মরলাম না ত?' বড় বড় গাছগুলোকে ত'প্রায় সবই কেটে ফেললাম।'

যতীন হেমে জবাব দিত, 'আমি ত' বাবু আগেই সে কথা বলে দিয়েছি। বায়নের কোনও ভয় নেই।'

বলতাম, 'ঠিক বলেছ। কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করিনি, এখন দেখছি, সেই কথাই সত্য।'

যতীন বলতো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ও-সব অনেক জানা আছে।'

বাতে সেদিন থেতে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভূত তুমি নিজে কোনোদিন দেখেছ যতীন?'

যতীন বললে, 'তা, আজ্ঞে, দেখেছি বই কি!'

এই বলে সে তার ভূত-দেখার গল্প আরম্ভ করলে। এমন গল্প ষে, সে আর সহজে থামতে চায় না। এদিকে রাত্রির শেব-গাড়ীটা তখন টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ীটা ছেড়ে গেলেই টেশন-মাটোর বাসায় চলে যাবেন। তার আগেই আমার সেখানে যাওয়া দরকার। কারণ, বাতে আমার শোবার বন্দোবস্ত সেইখানেই। কাজেই বাধ্য হয়ে যতীনকে বললাম, 'বার্কটা কাল শৰ্নূব যতীন, আজ থাক্।'

কিন্তু এখনি তার গল্প বলবার সখ যে, সে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে টেশন পর্যন্ত গল্পটা তার বলতে বলতে এলো।

গাড়ী চলে গেছে, মাটোরমশাই তখন বসে আছেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'যদে আছেন যে এখনও?'

বললেন, 'আস্তুন, আপনারই জন্য বসে আছি।'

বললাম, 'এবার আপনি যেতে পারেন।'

তিনি বললেন, 'যাব কি মশাই, জংশন থেকে তার এলো, আপনার একহাজার টাকা নিয়ে লোক আসছে।'

'কেমন ক'রে আসবে? গাড়ীত' চলে গেল।'

তিনি ঝুঁৎ হেমে বললেন, 'একি আর আপনার-আমার কাজ মশাই, অত বড় সায়েব-কোম্পানীর কাজ,—খাতির কত! জংশন থেকে একখানা পাইলট ইঞ্জিন দিয়েছে, তাইতেই লোক আপনার এলো বলে।'

যতীন বললে, 'তাহলে এই অবসরে গল্পটা আমার শেষ করে নিই বাবু, শৰ্নূব।'

বলে সে তার গল্প শেষ করতে বসলো।

গল্প শেষ হতে না হ'তেই হস্স হস্স করে ইঞ্জিন এসে দাঁড়ালো! ইঞ্জিন থেকে নামলো এক সাহেব। একহাজার টাকা—অন্য কারণও হাতে পাঠাতে হয়ত' বিশ্বাস হয়নি, তাই চুণের কারখানার ছোট সাহেব নিজে এসেছেন।

টাকা দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নিয়ে, তিনি আবার সেই ইঁজানেই ফিরে গেলেন।

টাকাগুলো লোহার সিল্ডুকে বন্ধ ক'রে মাষ্টার-শাহী বললেন, ‘আস তবে, নমস্কার।’

বললাম, ‘আসুন।’

যতীন বললে, ‘আমিও তাহলে আস বাবু! আপনি শুয়ে পড়ুন।’

বললাম, ‘যাও।’

ব'লেই দরজা-জানালা বন্ধ করছিলাম, যতীন ফিরে এলো। বললে, ‘অত অত টাকা এলো, আপনি একা থাকবেন বাবু, গুরু দৃষ্টিকে পাঠিয়ে দেবো?’

ঘাড় মেড়ে বললাম, ‘না।’

যতীন চলে গেল।

দরজা-জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকলে দম আমার বন্ধ হয়ে আসে। সেৰ্দিনও তাই একটা জানালা আমি খুলে রাখলাম। রেল-ষ্টেশনের জানালা, খ'লে রাখা মানে সবই খোলা। ইচ্ছে করলে ও-পাশ থেকে টপ্পকে বে-কেউ এসে ঘরে ঢুকতে পারে। আসুক-না! এলেই বা কি করবে? টাকা আছে লোহার সিল্ডুকে। সিল্ডুক একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা। আর ভূত ষাঁড়ি আসে, তাদের ত' শুনেছি সবৰ-গুই অবাধ গাত। তাদের কাছে খোলাই বা কি, আর বন্ধই বা কি! তারা অবশ্য টাকা নিতে আসে না। তাছাড়া, এলে এতদিন আসতো। এখনও যখন আসেনি, তখন সম্ভবতঃ আর আসবে না।

এম্বিন সব নামান কথা ভাবছি, আর সেই খোলা জানালার পানে তাঁকিরে আছি। আকাশে চাঁদ উঠেছে। দিনের মত পরিষ্কার জ্যোৎস্নার ছটা জানালার পথে ঘরে এসে পড়েছে।

ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ পরে জানি না, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাত মনে হলো, কাপড় দিয়ে কে যেন আমার ঘুর্থখানা চেপে ধরেচে। ঘুম ভেঙ্গে গেল, জেগে দেখি, সত্যিই তাই। হাত তুলতে গিয়ে দেখি, হাত দৃষ্টি দড়ি দিয়ে বাঁধা, পায়ের অবস্থাও তাই। ঘুমের ঘোরে কখন যে এহন ক'রে আমায় আটেপ্পেষ্টে বেঁধে ফেলেছে, কিছুই ব্যবতে পারিনি! কথা কইবার উপায় নেই। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ চোখ দৃষ্টি দৃষ্টি খোলা। জানালার পথে যে জ্যোৎস্নার আলো ঘরে এসে পড়েছে, তাতে শুধু সেই জাগ্রগাটাই দেখা যায়। যে-লোকটা আমার ঘুর্থে কাপড় চাপা দিয়ে সজোরে বেঁধে ফেলেছে, তাকে আবুছা আবুছা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু চিনবার উপায় নেই। ঘুর্থ খুলতে পারছি না, তবু কেনোৱকমে অস্পষ্ট-ভাবে গৈঁ গৈঁ ক'রে বললাম, ‘টাকা নিয়ে যাও, কিন্তু আমার তোমরা মেরে ষেয়ো না বাবা!'

ওদিকে আমার মাথার পেছনে দেওয়ালের গায়ে সিল্ডুক খোলার শব্দ পেলাম। আর করি কি! মড়ার ঘত চুপ ক'রে পড়ে আছি। ঘৃত্য অনিবার্য। এতক্ষণে

ব্ৰহ্মাম, আমাৰ আগে ঘাৰা গেছে তাৰাও ঠিক এম্বিনি কৱেই গেছে। বৃক্ষেৰ ভেতৱটা ধৰ্ক্ ধৰ্ক্ কৱাছে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! সে যে কি ভীষণ অবস্থা, তা আৰি লিখে বোৱাতে পাৰব না! চোখেৰ স্মৃথিৰে আমাৰ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তিনটিৰ কঢ়ি শুধু তেসে উঠলো, আমাৰ স্তৰীৰ কথা মনে হলো। হায় হায়, কেন আৰি তাদেৱ ছেড়ে এখানে এলাম। চোখ দিয়ে আমাৰ দৰ, দৰ, কৱে জল গাড়িয়ে পড়তে লাগলো। —হে ভগবান! এৱে যেন আমাৰ প্রাণে না মাৰে। বেঁচে যাবি থাকি ত' কালই আৰি এ চাকৰীতে ইলক্ষ্মী দিয়ে চলে যাব। টাকাগুলো মাথাৰ কাছে ঝন্ট ঝন্ট কৱে উঠলো। খলেটা তাহলে ওৱা দৰে কৱেছে!

এহন সময় মনে হলো যেন জানালার পথে আৱ-একটা লোক দৰেৱ মধ্যে লাফিয়ে পড়লো! চোখেৰ জলে দৃঢ়িত তখন আমাৰ বাপসা হয়ে এসেছে, তবু যেন অনে হলো, আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা প্ৰকাণ্ড জন্মা দেই লোকটা—বাকে আৰি প্ৰথম দিন ছেঁগে দেখেছিলাম।

গলাটা তখন কে যেন আমাৰ দৃঢ়াত দিয়ে চেপে ধৰেছে! এইবাৰ মৃত্যু! অনুরোধ কৱবাৰ শৰ্কি নেই। মৃত্যুৰ কাপড় তখন তেমনি বাঁধা!

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড! মৰতে মৰতে আৰি যেন বেঁচে গেলাম! লোকটা আমাৰ গলা ছেড়ে দিয়ে দৰেৱ মধ্যে কাৰ সঙ্গে যেন হাতাহাতি সৰু, কৱে দিয়েছে!

তাৰ পৱেই ভীষণ শব্দ! তাৰ পৱেই চীৎকাৰ! মানুষ মৰবাৰ সময় বেভাবে চীৎকাৰ কৱে, এও যেন ঠিক তেমনি! কঠম্বৰ শনে চিনতে পাৱলাম, এ আমাৰ গৰ্বী চাপৱাশী রামলাল!

মারামাৰি কিন্তু তখনও থার্মেনি; টাকার খলেটা মনে হলো একবাৰ ঝন্ট ঝন্ট কৱে যেৰেতে পড়ে গেল! তাৱপৰ কে যেন জানালা টপ্কে বাইৱে বেঁৰিয়ে গেল! তাৰ পিছু-পিছু আৱ একজন! বাইৱেও শব্দ হ'তে লাগলো। নিৱুপায় ও অসহায় অবস্থায় আৰি শুধু মড়াৰ মত সেইখানে চুপ কৱে পড়ে রাইলাম।

খানিক পৱে সব নিষ্ঠৰ হয়ে গেল!

কি যে হলো, কিছুই ভাল ব্ৰহ্মতে পাৱলাম না। তখনও বৃক্ষেৰ ভেতৱটা আমাৰ কেমন যেন কৱেছে! যে-কোন মৃহূর্তে মৃত্যু হ'তে পাৱে, সে কথাই ভাৰাই।

এহন সময় বক্ বক্ শব্দ কৱতে কৱতে ঘৱেৱ বাইৱে একথানা ইঞ্জিন এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো পায়েৱ শব্দ! বলু দৱজাৰ ঘা পড়তে লাগলো। কিন্তু কে খুলবে? আমাৰ ত' ষষ্ঠিবাৰ উপায় নেই। শুখখানা টেনে বাঁধা! কথাও বলতে পাৰাছনে।

পায়েৱ শব্দ ঘুৱে এদিকেৱ খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। একজন সাহেবে জানালা টপ্কে ঘৱে ঢুকে দৱজা খুলে দিলৈন। ঘৱে আলো জৰুলা হলো।

জংশন থেকে তাঁরা ইঁজিনে চড়ে চারজন এসেছেন। কোয়ার্টার থেকে টেশন-মাস্টার এলেন।

ধরের মেঝে রঙে ভেসে গেছে! গুর্ধ্ব চাপ্রাণী রামলাল মেঝের উপর মরে পড়ে আছে। তারই কোমরের ডোজালী তারই গলায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সোহার সিল্ক খোলা। কিন্তু টাকার থলে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে।

ব্যাপারটা কিছুই ভালো বোবার উপায় নেই। কে যে আমার মেরে ফলে টাকা নিয়ে উধাও হবে ভেবেছিল, আর কেই-ব্য আমার বাঁচিয়ে রামলালকে মেরে গেল, কে জানে!

সাহেবদের জিঞ্জেস করলাম, ‘আপনারা খবর পেলেন কেমন করে?’

যিনি এখানে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বললেন, ‘জংশনে ইঁজিন আমাদের পেঁচাবামাত্র এখান থেকে তার গেল, ‘ডাকাত পড়েছে, জল্দি আসুন’!’

এখান থেকে তার করবে কে? টেশন-মাস্টার টেলিগ্রাফের কাছে উঠে গিয়ে হাত দিয়ে তুলে আমাদের দেখালেন, কনেক্শন তিনি কেটে দিয়েই বাসাৰ গিয়েছিলেন।

অবাক হয়ে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়া করতে লাগলাম।

হঠাৎ আমার মনে হলো, ঝগড়াটা বাইরে পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বাইরে দেরিয়ে একবার দেখা ষাক্।

সবাই মিলে বাইরে বেরিয়ে গোলাম। জ্যোৎস্নার আলো তখন স্লান হয়ে এলেও দেখা গেল, দূরে প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ সীমানায় সাদামত কি ঘেন একটা পড়ে রয়েছে!

কাছে গিয়ে দেখি, শিউশুণ! আমাদের দেখে সে শুধু কাঁদতে থাকে। মৃদ্ধে কোনও কথা বলে না।

শেষে অনেক কষ্টে মেঝে তাকে কথা বলানো হলো। সাহেবের লাখি খে়েন সে কাঁদতে কাঁদতে সব কথাই বলে ফেললে। আমায় মেঝে ফেলে সে আর রামলাল, দৃঢ়নেই এসেছিল টাকা চুরি করতে। এর আগে যে তিনজন ঘরেছে, তারাও তাদেরই হাতে ঘরেছে। কিন্তু এবার তার ফল হলো বিপরীত। ধাকখান থেকে কে একটা লোক এসে রামলালকে ‘ত’ মেরেই ফেললে, আর তার হাত থেকে টাকার থলেটা কেড়ে নিয়ে পা-দুটো তার উল্টো দিকে মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল।

বুরুমাম, সেই ভাঙ্গা পা নিয়ে অতি কষ্টে বুকে হেঁটে শিউশুণ পাশাবার চেষ্টা করছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘লোকটা দেখতে কি রকম বল দেখি?’

শিউশুণ বললে, ‘সে ঘানুষ নয় বাবু; তার গায়ে বহুৎ জোত। ইয়া সম্ভা তালগাছের মত, আর ছাগলের মত মুখ।’

আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। মাথাটা তখন আমার কেমন বেন দ্বারাছিল বলে সেইধানেই বসে পড়লাম। রামলাল যখন আমার গলাটা চেপে ধরে আমার ঘেরে ফেলবার উদ্যোগ করছিল, তাকে তখন আমি জানলা টপ্পকে ঘরে বস্কর্তে দেখেছি। এমন সময় টপ্প করে আমার পায়ের কাছে কি যেন একটা পড়লো। তুলে দেখি—একটা দেশলাই-এর বাক্স। এইটোই সেদিন আমি তাকে ট্রেণের কামরায় দিয়েছিলাম, কিন্তু ফেরত দিতে সে ভুলে গিয়েছিল। এদিক-ওদিক বহুদ্রুণ পর্যন্ত তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। সমস্ত শরীর তখন আমার বোমাপিণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কে সে?

যে-ই হও, তৃষ্ণ আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। তোমার নমস্কার!



ভৌতিক

—সৎকুমার দে সরকার

চাকরীর অভাবে প্রতোক বেকার ঘূরকই যা করে থাকে, আমিও তাই করতে বাধ্য হয়েছিলাম; অর্থাৎ ইন্সিগ্নেন্সের এজেন্সী। চাকরীর সঙ্গে ইন্সিগ্নেন্সের সম্বন্ধটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ—যথা, চাকরী থাকলে লোকে ইন্সিগ্নেন্সের করে, আর চাকরী না থাকলে করে ইন্সিগ্নেন্স-এজেন্সী। আমিও সেই ফরমুলা অনুযায়ী যথানিয়মে এজেন্ট হয়ে গেলাম। দেখতে দেখতে যত প্রয়োগ ব্যবহার দল শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াল। জীবন-বৈমাকারীর বদলে খেতাব পেয়ে গেলাম জীবন-বিষয়মাকারী। কাজে কাজেই বুরতে হবে, আমি বেশ কৃতকার্য্য হয়েছিলাম এ লাইনে, এবং শেষ পর্যালত এই শেষের কার্জটিতে এমন পাকা হয়ে উঠলাম যে, আমার কোম্পানী ঠিক করল—আমার মত পাকা লোকের মাত্র শুধু একটা সহরের লোকের জীবন বিষয়ে করে ক্ষান্ত হলৈ চলবে না, সারা বাংলার লোকেরই জীবন বিষয়ে করে ছাড়তে হবে। ঘূরে বেড়াতে লাগলাম সারা বাংলাময়। অখ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

জীবন-বৈমা নিয়মটা খুবই সুন্দর; কিন্তু এই যে কোন-কিছু না পেয়ে, ভবিষ্যতের আশায় নির্যামিত টাকা দিয়ে ধাওয়া অন্যান্য অভাব অপূর্ণ রেখেও—এটা সাধারণ লোক সহজে বরদাঙ্গত করতে পারে না।

যখনকার কথা বঙাছি, তখন বর্ষাকাল; মাত্র আগেরদিন মেদিনীপুর পেঁচেছি। হোটেলের জোক তখনও আমার পরিচয় জানে না। মেদিনীটা

সকাল থেকেই ঝুঁপ্ ঝুঁপ্ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হোটেলের 'হল' ঘরটায় নানা রকমের লোক জড়ো হয়েছে। যানেজারকে বলে-করে সকলে সেবন খচুড়ীর ব্যবস্থা করেছিল। রাস্তারের আহারটা আশাপাদ, তাই আঞ্চাটাও জমেছে মন্দ নর।

একজন বলল—এখন একটা ভূতের গঢ়প হ'লে মন্দ হোত না।

হোটেল-বাসীরা জীবনের পোড়-খাওয়া লোক। সকলকেই ব্যবসা বা অন্য কোন কাজের খাতিরে ঘৰে বেড়াতে হয়। সকলেরই অভিজ্ঞতা পাকা, জীবনকে নিষের হাতে নিয়ে ঘৰে বেঁড়িয়ে ভয় জিনিসটা আলোর সামনের অধিকারের মত প্রাপ্ত সকলের মন থেকেই অল্পতর্হীত।

প্রথম বক্তা উন্নরে অন্য একজন জবাব দিল—আপনি ভূত মানেন রমেশবাবু?

ভূত কথাটার আর কিছু না থাক, একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। দেখতে দেখতে ভূতের গঢ়প নয়, ভূত-মানা নিয়ে তক্টা জমে উঠল।

রমেশবাবু—বিন প্রথম কথাটা তুলেছিলেন, তিনি—ভূতের অস্তিত্বের স্বপক্ষে ভোট দিলেন, আর ঘরের সকলেই প্রায় বিপক্ষে। অনেকে রমেশবাবুকে টিট্কিরী দিতে শুরু করলেন—হাঁ, এই টোয়েলিটেখ সেগুরীতে আবার ভূত? ভূত বলে কোন কিছু আছে নাকি?

আমি একপাশে চৃপচাপ বসে ছিলাম। কারো সঙ্গে পরিচয় নেই, তাই আলোচনায় ঘোগ দিইনি। একজন হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কিছু বলছেন না বৈ?

আমি বললাম—কি বল্ব?

—আপনি ভূত মানেন?

প্রথমেই বলেছি, লোকে ভূত মানুক বা না মানুক, ভূত-সম্বন্ধে একটা কৌতুহল কিছুতেই ঘন থেকে থায় না। বাইরে ঝুঁপ্ ঝুঁপ্ বৃষ্টি, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; কোন বিদ্যুতের বলকটার পরই যে বাজের ভীষণ শব্দে প্রথমবৰ্ষী কেঁপে উঠবে, বলা থায় না। অর্থন আবছা রহস্যময় আবহাওয়ায় মনটা ঘনিয়ে থাকে। এর্থাণ একটা ঘনীভূত আবহাওয়া আমাদের ঘরে ঘনিয়ে রয়েছে। সকলেই ভূতের বিপক্ষে, শুধু রমেশবাবু ছাড়া। এখন আমার মতটা বিপক্ষে পেলেই সকলে রমেশবাবুকে কোণঠাসা করে ছাড়তে পারে। একজন মানুষের অনবস্থাত অভিমতের একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে।

সকলেই তাই উৎসুক দৃষ্টিতে আমার ঘৰের দিকে তাকাল। প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞাসা করল—আপনি ভূত মানেন?

আমি দমটা টেনে নিয়ে বললাম—মানি।

সহস্র ঘরে ঘেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলে গেল! রমেশবাবুর ঘৰে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর, যে আলোচনা থেমে থাবার উপক্রম হয়ে উঠেছিল, তাকে

পুনর্জীবিত হ'তে দেখে সকলেই যেন স্বচ্ছতার নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। প্রশ্নকারী
বলল—ভূত মানেন আপনি?

—নিশ্চয়!

—আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন?

—দেখেছি বৈক!

রমেশবাৰু তাঁৰ কোন্ মামাত ভাইয়ের অভিজ্ঞতা বলতে ঘাঁজলেন, সকলে
একজোটে তাঁকে নিরস্ত কৰলেন। তার পৱে আবাৰ আমাকে প্ৰশ্ন হলো—আপনি
নিজেৰ চোখে দেখেছেন?

গম্ভীৰভাৱে বললাম—হ্যাঁ। (বাইৱে কড় কড় ক'ৱে বাজেৰ আওয়াজ গজেৰ
উঠল।)

—আপনাৰ কোন রকম চোখেৰ ভুল হ'য়ে থাকবে।—আশাজনক কষ্টে একজন
বললেন।

বললাম—না।

—না মানে?

—ভূতেৰ সঙ্গে আমি কথাও বলেছি।

—আা?

—সত্য?

—কি রকম?

—বলছি। এক কাপ চা হ'লৈ...

একজন সঙ্গে সঙ্গে হৃকুম কৱল—ওৱে জগা, এক কাপ চা নিয়ে আয় ত'!
সিগারেট থাবেন? —একজন সিগারেট বাঢ়িয়ে দিল। বাইৱে ব্ৰিটিষ্ট আৱণ
চেপে এসেছে। পথেৰ আলোয় বৰ্ষা মিশে বাইৱেটা রহস্যময়।

শুনুৰ কৱলামঃ—

কাজেৰ খাতিৱে সেৱাৰ রাজীবগঞ্জ যেতে হয়েছিল।

একজন প্ৰশ্ন কৱল—কি কাজ?

—শুনুন না...ৱাজীবগঞ্জ একটা পাট-কেনাৰ আড়ৎ। নানা রকম ঘহাজন নানা
জায়গা থেকে আসে। কিছুদিনেৰ জন্যে গ্ৰামটা বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। আৰ্ম
হাট জমবাৰ কয়েকদিন আগেই গিয়েছিলাম। মৌকো ক'ৱে যখন গাঁৱে পেশীছিলাম,
তখন সধ্যে হয়ে গেছে। খুঁজে-পেতে উইয়ে-খাওয়া ডাক-বাংলোটা বাৱ কৱতে
ৱাত হয়ে গেল। ডাক-বাংলোগুলো সাধাৱণতঃ লোকালয়েৰ বাইৱে হয়। চৌকিদারকেও
অনেক কটে গ্রাম থেকে আনালাম।

—চৌকিদার ডাক-বাংলোয় ছিল না?—একজন জিজ্ঞাসা কৱল।

—তবে আৱ বলছি কি?...চৌকিদার এলে পৱে তাকে ধৰকে বললাম যে, এৱ
মানে কি?...ডাক-বাংলো ছেড়ে সে অন্য কোথাও থাকে কেন? সে কোন জবাব

দিল না, বকুনী হজম ক'রে গেল। আমার খাওয়া-দাওয়া সারিয়ে দিয়ে সে বলল—
বাবু, এবার আমার ছুটি?

জিজ্ঞাসা করলাম—তার মানে? তুই এখানে থার্কিব না?

—না বাবু।

—কেন?

—ভয় আছে।

—ভয়? কিসের ভয়? চোর-ডাকাত?

—না বাবু!...লোকটা আমতা আমতা করতে লাগল।

—কিসের ভয়?...আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

—তেনাদের কি রেতের-বেলা নাম করা থার?

আমি হো হো ক'রে হেসে উঠলাম—ও! ভৃত? তাই বল! ভৃত আবার
আছে নাকি? আমিও আপনাদেরই মত ছিলাম তখন। কিন্তু বাক্ সে-কথা,
মোটের ওপর কোনমতেই চোরিদারকে ধরে রাখা গেল না। সে সকালেই খবর নেবে
বলে চলে গেল। আমি দরজা-জান্মা ডাল ক'রে দেখে-শুনে বন্ধ ক'রে শূরে পড়লাম।
পাড়াগেঁয়ে অশ্বকার, কালো রাত বাইরে ঝিম-বিম করছে। নিকটেই নদীর
ইসরা।

একজন বলল—আপনার ভয় করল না?

—কিসের ভয়?

—কেন, ভূতের?

—ভূতের আবার ভয় কি? ঘৰ্ময়ে পড়েছিলাম, হঠাতে ঘৰ্ম ভেঙে গেল। তখন
কত রাত, খেয়াল নেই; হ্যারিকেনটা জৰালিয়ে শুয়েছিলাম, বোধ হয়, তেল ভরে
দিতে মনে ছিল না; দেখলাম, পোড়া পলতের ঘূথে নীল এক টুকরো শেষ শিখা
খাবি আছে। ঠিক যেন কে তার গলা টিপে ধরেছে! ঘৰ্মটা কেন ভেঙে গিয়েছিল,
জানি না। তখন শীতকাল, হঠাতে একটা ঝোড়ো হাওয়ায় গা-টা কন্ কন্ করে
উঠল। প্রান্মো জান্মাটা খট্ খট্ ক'রে উঠল বাতাসে। জান্মা দিয়ে অজস্র
তারা উৎক মারছে; আর আকাশের টুকরোটা মিশ-কালো। হঠাতে মনে হলো—
জান্মা ত' আমি বন্ধ ক'রে শুয়েছিলুম, খুলল কে? হ্যারিকেনের আলো শেষ
একবার দপ্ দপ্ ক'রে নিবে গেল। আর মনে হলো, জান্মা দিয়ে যেন একটা
ছায়া ভেসে এসে ঢুকল ঘরে।

দম নিতে থামলাম। বাইরে আবার বাজের আওয়াজ। ঘর নিস্তব্ধ—ছুট
পড়লেও শোনা যায়। হঠাতে আমার খাটের কোণের দিক্ থেকে আমার লাঠিটা পড়ে
গেল সশব্দে। স্পষ্ট মনে হলো, ঘরে কে যেন রয়েছে! খাটের ওপর উঠে বসে
হাঁকলাম—কে? কে ওখানে?

জবাব এল—আমি।

—তুমি কে ?
 —আমি আমি !
 —চমৎকার ! তা, তুমি কে ?
 —বুঝতে পারছ না ?
 —পারলে আর জিজ্ঞাসা করছি ?
 —আমি ছৃত !
 —আমি বললাম—ও !
 সে যেন চম্কে জবাব দিল—ও—মানে ?
 —মানে আবার কি ? ও—মানে ও ! অন্ততঃ ডিঙ্গনারীতে আর কোন মানে
 আমি পাইনি ! তা, তুমি কি মনে ক'রে ?
 —কি আবার মনে ক'রে ?
 —মানে, কি করতে এসেছ ?
 —ভয় দেখাতে !
 —কেন ?
 —কেন আবার কি ? ভৃত ভয় দেখাবে না ?
 বললাম—ঠিক ঠিক ! লাগাও লাগাও—দেখিয়ে দাও ; তবে বেশী দেরী করো
 না, আমার ঘূর্ম পাছে।
 —তা, তুমি ত' দেখিছ মোটেই ভয় পাওনি !
 —না দেখালে পাব কি ক'রে ?

মনে হ'ল, ভৃত্যা বেশ ঘাবড়ে গেছে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সেই একটু
 থেমে বলল—আমি এসেছি।

—বেশ করেছ, বোস। তামাক খাবে ?
 ভৃত্যা গুঁড়িয়ে উঠল।
 জিজ্ঞাসা করলাম—কি হ'ল আবার ?
 অত্যন্ত করুণ সুরে সে বলল—তুমি যে মোটেই ভয় পাচ্ছ না !
 —বাঃ রে, আমার কি দোষ ? তুমি ভয় না দেখালে ভয় পাব কি ক'রে ?
 —আবার কি ক'রে ভয় দেখাব ? আমি এসেছি, তাইতেই ত' তুমি ভয় পাবে !
 —উঁহ, সে পাস্তুর আমি নই।
 —তবে তুমি কি পাস্তুর ?
 —জবর একটা কিছু কর ! অমন ভৃতের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকো না।
 —ভৃত আবার ভৃতের মত নয় ত' কিসের মত দাঁড়িয়ে থাকবে ?
 বললাম—ঠিক, আমারই ভুল। দাঁড়িয়ে থাকো তুমি !—ব'লে আমি পাশ ফিরে
 শুলাম।

হঠাৎ থাটটা দূলে উঠল। প্রথমে একট, তারপরে আর একট, জোরে, তারপর
বেশ দূলতে শুরু হল। তন্মা এসেছিল, ঘূর্ম-জড়ান সুরে আস্তে আস্তে বললাম
—কি হ'ল আবার?

—কি করছ? দাঁতকপাটি লেগেছে বুঝি?

ভূতের গলার আওয়াজ এবার বেশ স্প্রেস। বললাম—না, ঘূর্ম এসে গিয়েছিল।

—আঁ, তুমি ঘূর্মোচ্ছলে?

—তা, অমন চৰ্কার দোলালে ঘূর্মোব না?

ভূতটা এবার হাউ হাউ ক'রে কে'দে উঠল।

—আঁ, কি হ'ল? কামা কেন?

—আমি কি ক'রি গো—ও—ও? আমি এসেছি টের পোলেই ত' সবাই ভৱ পায়,
তার ওপর থাট দোলালে ত' রক্ষেই থাকে না! অনেকে আধমরা, কেউ কেউ মরেই
যাব। ভূত-সমাজে আর আমার মান-সম্ম কিছু রইল না—ভূতের ফৌগানি আর
থামে না!

তাকে শাস্ত করবার জন্য বলজাম—দৈথ ভূত, আজকালকার ছেলেরা ভূতকে
ভয় করা দূরে থাক, ভূত মানেই নি...

—আঁ, বল কি?

—হ্যাঁ, সত্যি কথা। আমি ত' তবু তোমায় মানিছি, খাতির করাছি!

—তুমি কে?

—কে আবার! মানুষ।

—না-না, তা নয়, তুমি কি কর?

—ইন্সিগ্নেশন-এজেন্ট, খুব ভাল কোম্পানী, প্রিয়ঘৃণ খুব কম...

গড় গড় ক'রে আমার কোম্পানীর সব গৃহগুলো বালে গেলাম।

বাস্ত! এক চীৎকার ক'রে ভূত লাফিয়ে উঠল—আঁ, জীবন-বিষমাকারী?
ওরে বাপ্ত!

হৃড়মৃড় ক'রে দরজা খুলে গেল। ভূত একদম হাওয়া! একটা দমকা হাওয়া
মাঠের ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ ক'রে বয়ে চলে গেল নদীর দিকে। প্রথিবী অশ্বত রকম
নিম্নতর্থ!

থামলাম।

ঘরের মধ্যে একটা হাঁসির রোল উঠল;—জীবন-বিষমাকারী!—হোঃ হোঃ হোঃ!
আর একজন বলল—ভূত পালায় বাবা, কম নয়!

—সত্যি জৰালাতনের একশেষ!

আর একজন জবাব দিলে—কিন্তু আখেরে কাজ দেয়। আর স্বীবধেও দেখন...

—তা সত্যি! হ্যাঁ, আপনার কি কোম্পানী যেন বললেন?

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর রমেশবাবু আমার ঘরে ঢুকে বললেন—পায়ের ধূলো
দিন দাদা ! চমৎকার ফল্দীট করেছিলেন কিম্তু !

বললাম—তার মানে ?

—আমারও ওই ব্যবসা দাদা, অন্য কোম্পানী ; তবে আপনার কাছে আমার অনেক
শেখবার আছে ।

রমেশবাবুকে পায়ের ধূলো দিলাম ।



—সরোজকুমার রামচৌধুরী

অনেককাল আগের কথা।

তখনও গ্রামে গ্রামে পাশ-করা

ডাঙ্গারের এত প্রাদুর্ভাব হয়নি,—অস্তিত্ব কুমারহাটিতে হয়নি। এখানে বড়-বড় কাৰ্বৰ-জ্বল থেকে ছোট-ছোট ঘা-ফোড়া পৰ্যন্ত সকল বকল অস্ত্ৰ-চৰ্চিকসা কৱতো মধু পৰামাণিক। আৱ জৱ-জৱলায় ওষুধ দিতেন হংসেশ্বৰ ডাঙ্গাৰ।

পাশ-কৰা ডাঙ্গাৰ তিনি ছিলেন না, কিন্তু পসার ছিল ঘথেষ্ট। কাৰণ, এদিকে দশ-পনেরো ঘাইলোৱ মধ্যে তিনিই একম্ এবং অনিবারীয়ম্। বেঁটেখাটো মানুষ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ছোট-ছোট কৱে ছাঁটা। তাৱ মাৰখানে একটি পৰিপূৰ্ণ শিখ। গলায় তুলসীৰ মালা। গ্রামের রোগী দেখতে একজোড়া মৃচে চাঁট এবং একখানা চাদৱাই ঘথেষ্ট। বাইৱে বেৱুতে হ'লে একটা পিপান নিতেন। সৃতিৰ চাদৱাটো বৰ্দ্ধে মটকা ব্যাবহাৰ কৱতেন। আৱ পায়ে দিতেন চীনেবোড়ীৰ জৰ্তো।

এত পসার সত্ত্বেও ভদ্রলোক কিন্তু বিশেষ টাকা জমাতে পাৱেন নি। প্ৰথমত, তাৰ 'ফী' বলে কিছু ছিল না। দৃ-পাঁচজন ধনী রোগী ছাড়া বাকী প্ৰায় সবৰ-ই আল-টা-বেগ-নটা নিয়েই সন্তুষ্ট হ'তে হতো, ওষুধটা পৰ্যন্ত বিনামূল্যে। এ হেন ভালো মানুষ ভদ্রলোক একদিন কি বিপদে পড়েছিলেন, সে যদি শোনো, তোমাদেৱ গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবৈ।

সন্ধিবেলায় পাশেৱ গ্ৰাম থেকে একটা ডাক এলো, না গেলেই নয়। রোগীৰ অবস্থা শুনে ডাঙ্গাৰবাবু 'না' বলতে পাৱলেন না। দূৰ অবশ্য বেশী নয়। দৃঢ়ি গ্রামেৱ মধ্যে ঘাইল চাৱেকেৱ একটা বিলেৱ ব্যবধান। এই বিলটা-সম্বন্ধে চাৰি-পাশেৱ লোকেৱ অনেককালেৱ ভয় আছে। বিশেষ কৱে, বিলেৱ মাৰামারিৰ জায়গায়

যে বহুকালের বড়ো বটগাছটা আছে, সেখানে বে অসংখ্য ভূতের বাস, তাতে আর কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু রোগীর বাড়ীর লোক যথন ভরসা দিলে ষে, তারা নিজেরা তাঁকে পেশেছে দিয়ে যাবে, তখন আর তর করবার কি আছে? তিনবার দুর্গানাম শ্মরণ ক'রে হংসেশ্বর ডাঙ্গার ভর-সম্বৰ্ধেবেলাতেই বেরিয়ে পড়লেন।

রোগী দেখে, ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে যথন ফিরলেন, তখন রাত দশটার বেশী নয়। ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। তার ওপর সঙ্গে আলো নিয়ে আসছে দুজন বিখ্যাত লাঠিয়াল। ডাঙ্গারবাবু, নির্ভরয়ে খোস-গল্প করতে করতে চলে আসছেন,—বরং বেশ ভালোই লাগছিল। যে বটগাছটার সম্বন্ধে সকলেরই ভয়, তাই নাঁচে দিয়ে আসতে, তয়ে তাঁর গা ছয়, ছয়, করলেও কেমন একটু গবর্ব'ও বেধ করছিলেন।

এমনি ক'রে আসতে আসতে যথন প্রায় গ্রামের সীমানায় এসে পেশেছেন, আর মাত্র মাইলখানেক বাকী, হঠাত একটা মস্তবড় ঘোড়া ছুটতে ছুটতে এসে প্রায় তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লো। এত রাতে হঠাত একটা ঘোড়া দেখে এ'রা তিনজনেই চম'কে উঠলেন।

ডাঙ্গারবাবু, অবাক্ হয়ে সঙ্গের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, কার ঘোড়া হে? চমৎকার ঘোড়াটি তো!

একজন ঘোড়াটিকে ভাল ক'রে দেখে বললে, সম্ভব যদনপুরের বাবদের। তাঁরা একটা নতুন ঘোড়া কিনেছেন শুনেছি। বোধহয়, সেইটে।

আর একজন বললে, জিন-লাগাম পরানো! হয়তো ব্রাহ্মণ কোথায় সওঘার ফেলে দিবেছে!

ডাঙ্গারবাবুর ঘোড়ার খ্ৰ সখ। তিনি ঘোড়াটার গায়ে আস্তে আস্তে হাত ব্যলিয়ে বললেন, কিন্তু দৃষ্ট ঘোড়া বলে তো বোধ হচ্ছে না!

একে ঘোড়ার সখ, তার উপর সমস্ত দিন হেঁটে হেঁটে তাঁর পায়ের আর কিছি ছিল না। ঘোড়াটি দেখে লোভ হচ্ছিল। এটায় চড়ে ষেতে পারলে আর এই মাইল-খানেক হাঁটার দুর্ভোগ ভুগতে হয় না।

একজন সঙ্গী তাঁর মনের ভাব ব্যৱে বললে, যাবেন নাকি এইটাতে চড়ে? কাল সকালে খৈঁজ করতে এলে ফিরিয়ে দিলেই চলবে।

ডাঙ্গারবাবু, মনে মনে লোভে উস্খেস করলেও প্রকাশে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, সে কি হয়? কার-না-কার ঘোড়া! হয়তো বলবে—

চোখ পার্কিয়ে লাঠিয়াল সঙ্গী বললে, বললেই হ'ল! আমরা কি চুরি করছি নাকি? যান, তো চলে, যা হয়, সে আমরা ব্ৰহ্ম।

ব'লে ছাঁতি ফ্যালিয়ে দৃঢ়ো ঘৰ্সি মারলে। আসল কথা—এতে তাদেরও স্বাত্ম ছিল। এইখান থেকে ডাঙ্গারবাবুকে ঘোড়ায় উঠিয়ে বিদায় করতে পারলে আর তাদের গ্রাম পর্যালৃত যেতে-আসতে হয় না।

ডাঙ্গারের নিজের তাঁগিদও কম নৱ। সকাল সকাল বাড়ী ফেরা নিতালত

প্রয়োজন। দৃঢ়জন বিখ্যাত লাঠিয়ালের ভরসা পেয়ে তিনি আর স্বিধা করলেন না। টপ্ট করে ঘোড়ায় উঠে বসলেন। ঘোড়া আস্তে আস্তে শামের দিকে চলতে লাগল। তা দেখে লাঠিয়াল দৃঢ়জন স্বচ্ছতর নিশ্বাস ফেলে নিজেদের প্রমের দিকে ফিরে চলল।

* * * *

ডাঙ্কারবাবু এককালে বেশ ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলেন। এখনও ঘোড়া দেখলে তাঁর পা সন্দৃঢ় সন্দৃঢ় করে। অনেক দিন পরে ঘোড়া পেয়ে তাঁর ইচ্ছা হ'ল, একটা ভাণ্ডা ভালো ছান্তক দেন। হাতে চাবুক ছিল না, ছিল একটা ভাণ্ডা ছান্ত। সেইটা দিয়ে আঘাত করতেই ঘোড়টা তাঁরের মত ছুটলো! বহু ঘোড়ায় এককালে তিনি ছড়েছেন, অনেক বদ্ধেয়ালী তেজী ঘোড়া সারেস্তা করেছেন। কিন্তু কোনো ঘোড়া যে এত জোরে ছুটতে পারে, এ তাঁর ধারণাই ছিল না। প্রাদ্বাৰাৰ জন্যে তিনি বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই থামানো বায় না। ঘোড়া তাঁরের মতো হাওয়া কেটে ছেটে। মনে হ'ল, মাটিতে যেন তাঁর পা টেকছে না। এক-একখনা গ্রাম চক্ষের নিমিবে পাশ কেটে চলে যাচ্ছে!

বিলের রাস্তা—অর্থাৎ রাস্তা বলে কিছু নেই। কেবল বাবলার বন। তারই মধ্য দিয়ে ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে কোন দিকে যে ছুটছে, ডাঙ্কারবাবু কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। কেবল বাবলার বনের মধ্য দিয়ে ছুটতে দেখে মাথা নাচু করে ঘোড়ার গলাটা জাঁড়য়ে ধরলেন। হঠাৎ একটু ভরসা হ'ল কিছুদূর আগে নদী দেখে। তিনি অনুমান করলেন, রূপসী নদী। কারণ, এদিকে আর বড় নদী নেই। চাঁদের আলোতে নদীর জল চক্চক করছিল। ও দেখে ভরসা হ'ল, এইবার ঘোড়াকে থাহতে হবে। রূপসী প্রকাণ্ড বড় নদী। জলও যথেষ্ট। কিন্তু এটুকু ভাবতে তাঁর অত্যন্ত সময় লাগল, ততক্ষণে ঘোড়া নদীর ওপারে পেঁচেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত ডাঙ্কারবাবুর জ্ঞান ছিল। কিন্তু ঘোড়া লাফিয়ে নদী পার হ'ল কি করে বুৰতে পারলেন না। ভয়ে তাঁর সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেল। তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

এমনি করে কতক্ষণ চলেছিলেন, জানেন না। হঠাৎ এক সময় দেখলেন, প্রকাণ্ড বড় এক রাজবাড়ীর দেউড়ীর ভিতর দিয়ে এসে গাড়ীবারান্দায় ঘোড়া থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন চাকর এসে ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরলে এবং আর একজন তাঁকে পরম সমাদরে নামতে ইঁগিত করলে। ডাঙ্কারবাবুর তখন জ্ঞান ছিল বসা চলে, ছিলও না বলা চলে। তিনি চোখ মেলে সব দেখেছিলেন এবং কান দিয়ে সব শব্দনাছিলেন, কিন্তু কিছুই পরিষ্কার করে বুৰতে পারছিলেন না। চাকরের ইঁগিত মত তিনি তাঁর পিছু পিছু বড় হল-ঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন চাকর পা ধোয়ার জল, গাছাচা নিয়ে এল। ডাঙ্কারবাবু হাতমুখ ধূয়ে অনেকটা সুস্থ হলৈন। তারপরে হল-ঘরে গিয়ে বসলেন।

মস্ত বড় হল্। নীচে ঘরজোড়া ফরাস পাতা। অনেকগুলো তাঁকিয়া এখানে-ওখানে ছড়িনো। ওপরে ঝাড়ের আলোয় সমস্ত ঘর যেন ঝলমল করছে। আর সেই ঘরের মধ্যাখানে একটি বৃক্ষ ভদ্রলোক চোখ বৃক্ষ করে নীরবে আলবোলা টানছেন। তাঁর মাথায় প্রকাণ্ড বড় টাক ঝাড়ের আলোয় চক্রমক্ করছে। পাকা আমের মত ট্র্যাক্টরকে রঙ। গায়ে একটা ফিন্ফিনে হাত কাটা বেনিয়ান—বাঁ হাতে সোনার তাগাটা দেখা যাচ্ছে। পরগে দামৰ্দী একখানা ধূর্ত। কেবল যেন বিমর্শভাবে বসে আছেন! তিনি ডাঙ্গারবাবুর দিকে একবার তাঁকিয়েই নীরবে ঘাড় নেড়ে বসতে বললেন। তাঁর চোখের দিকে তাঁকিয়ে ডাঙ্গারবাবু, নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলেন। মরা ছাগলের মত এমন ঘোলাটে চোখ মানন্দের দেখা যায় না। সে ন্যূনতে তাঁর হাড়ের ভিতর পর্যন্ত বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল! তিনি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

ঘর নিষ্পত্তি!

কেবল দেওয়ালের বড় ঘীড়টা অশ্রাল্তভাবে টিক্ টিক্ করছিল। ডাঙ্গারবাবু চেয়ে দেখলেন, রাত্রি মোটে বাবোটা বেজে পাঁচ।

ভয় করবার কিছু নেই। এতক্ষণ মাঠে মাঠে ঘৰছিলেন, এখন বরং লোকালৱে ভদ্রলোকের আশ্রয়ে এসে পেঁচেছেন। তবু কেবল একটা অজানা ভয়ে তাঁর গলা শুরুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এক ল্লাস জলের জন্য কাকে বলা যায় ভেবে এদিক্-ওদিক্ চাইতেই একটা চাকর এসে রূপার ল্লাসে এক ল্লাস শরবৎ এনে তাঁর সম্মুখে নামিয়ে দিলো। ডাঙ্গারবাবু খুশী হয়ে তার দিকে চাইতেই তার চোখে চোখ পড়ে গেল। ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। তাঁর হাত কেঁপে উঠল। আশ্চর্য! এরও চোখ তেমনি ঘোলাটে!

কিন্তু তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। তিনি ঢক্ ঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে শরবৎটা পান করে ফেললেন। আঃ! এমন চমৎকার শরবৎ তিনি কখনও খাননি। শরীর যেন জ্বরীয়ে গেল! তখনই আর একজন পান-তামাক নিয়ে এল। ডাঙ্গারবাবু, তার চোখটা কি-রকম দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লোকটা যেন তাঁর মনের মতলব বুঝতে পেরে ফিক্ করে একটু হেসে চোখ নামিয়ে সরে গেল। ডাঙ্গারবাবু, আর কিছু না বলে একটা পান মুখে দিয়ে তামাক টানতে লাগলেন। কোথাকার তামাক এটা? চমৎকার তামাক! খেতে খেতে চোখ বুজে আসে।

সেই বুড়ো ভদ্রলোক তখনও একমনে তামাক টেনেই চলেছিলেন। কিন্তু একটা কথাও বলাছিলেন না। বাইরে বহু লোক-জন যাওয়া-আসা করছিল। কিন্তু তাদের কারও মুখে হাসিও নেই, কথাও নেই। আরও একটা আচর্যের বিষয়, ডাঙ্গারবাবু যাইছে দিকে চেয়ে দেখেন, সবাই চোখ নামিয়ে ছলেছে! এতগুলো লোক যে এ-বাড়ীতে রয়েছে, তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। কথা তো কেউ বলছেই

না, এমন কি, তাদের পায়ের শব্দ পর্যালত পাওয়া থাছে না! ডাঙ্গারবাবুর ঘনে হল, এ-বাড়ীতে হয়ত কারও কঠিন অসুখ করেছে। হয়ত এখন-তখন অবস্থা! ব্যাপার দেখে কর্তৃ বাইরে এসে গালে হাত দিয়ে বসেছেন। লোক-জনের মূখ দিয়ে আর কথা সরছে না!

কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না এ-বাড়ীটা কাদের হতে পারে! এ'রা যে রাজা-বিশেষ লোক, তাতে আর সলেহ নেই। এদিকের বিশ-পর্ণিশ মাইলের ভেতর প্রত্যোক গ্রাম কখনো-না-কখনো কেনো-না-কেনো উপলক্ষে তিনি দেখেছেন। গোড়া তাঁকে দৃশ্যটির মধ্যে এখানে এনে ফেলেছে। যত জোরেই ছুটুক, দৃশ্যটায় আর কতই বা রাস্তা থাওয়া যায়? বহু চেষ্টা করেও এ-বাড়ী ডাঙ্গারবাবু, আর কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। ব্যাপারটা বুঢ়ো ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করবেন মনে করছেন, এমন সময় খাবার ডাক এল। ডাঙ্গারবাবু খেতে গেলেন।

খাবারের আয়োজন দেখে ডাঙ্গারবাবুর চক্ষপ্রিধি! প্রকাশ্ব বড় সোনার থালায় খান-করেক ফলকো লুচি। আর তার চারাদিকে কত যে তরকারী থেরে থেরে সাজান, গরীব ডাঙ্গারবাবু কখনো তা চক্ষে দেখেননি। রাত হয়েছে, অর্তিরিষ্ট পথগ্রামে ক্ষণ্ঠাও কম লাগেনি। তিনি আর কালবিলুক্ত না করে বসে পড়লেন।

খেতে বসেই ঘনে হল, সবই আছে বটে, কেবল এক টুকরা লেবু, আর ন্যূন নেই। কথাটা তাঁর ঘনে উদয় হওয়া মাত্র ঠাকুর এসে একটা রেকাবীতে করে ন্যূন আর লেবু রেখে গেল। সব রামাই চমৎকার হয়েছিল, বিশেষ করে তপ্সে মাছ ভাঙ্গা বড় ভাল লাগলো। এদিকে তপ্সে মাছ পাওয়া যায় না। ভদ্রলোক কি করে কোথা থেকে যোগাড় করলেন, কে জানে?

ডাঙ্গারবাবুর ঘনে ঘনে হাসি পেল যে, ভদ্রলোক এত কষ্ট করে দৃশ্যপ্রাপ্ত তপ্সে মাছ যোগাড় করেছেন আর গল্দা চিংড়ী যোগাড় করতে পারেননি! চিল্ডা করা মাত্র গল্দা চিংড়ীর মালাই-কারি এল। ডাঙ্গারবাবু কিন্তু এ-কথা ভেবে দেখলেন না যে, তিনি ঘনে ঘনে চিন্তা করা মাত্র কি করে এক একটা জিনিস এসে উপস্থিত হচ্ছে। ভাবলেন, বোধ হয় দিতে ভুলে গিয়েছিল, এখন এনে দিছে। ফলের থালাটা কোলের কাছে টেনে এনে দেখলেন, ফলের আর বাকী কিছু নেই, এক আম ছাড়া!

তা এবাবে এদিকে আম মোটেই হয়নি। গোড়ায় মুকুল ভালোই হয়েছিল। কিন্তু ফাল্গুনের গোড়ায় কাঁদিন কী যে কাল-ব্রত হল, একটি মুকুলও রইল না,—সব করে গেল। আম নেই সেইজনেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে মালদহের ভালো ফজলী আম স্থন তাঁর সামনে এল, তখন আর তাঁর বিস্ময়ের সৌম্বা রইল না। অবাক হয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে চাইতেই,—সেই চোখ!—মরা ছাগলের ঘত ঘোলাটে! ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে যেন অপ্রস্তুত হয়ে, হেসে চোখ নাখিয়ে চলে গেল

বটে, কিন্তু সেই এক মৃহূর্তের দৃষ্টিই তার হাড়ের ভেতর পর্যন্ত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপিয়ে দিলে।

ডাক্তারবাবু, পরম পরিতোষ-সহকারে আহার করেও কেমন যেন ঢাক্ত পেলেন না। তাঁর মন তখন বিজ্ঞান্ত হয়ে উঠেছে। কি যে করবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না! কম্পুরী-স্বার্সিত পান মুখে দিয়ে সুগন্ধি তামাক টানতে টানতে একবার মনে হল পালিয়ে যান! এই থ্যাথ্মে বাড়ী, বিশেষ ওই বুড়ো ভদ্রলোকটিকে তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। ভদ্রলোক এখনও ঠিক সেই জায়গায় ঠিক তের্ণিন করে বসে। মুখে গড়গড়ার নল। মাঝে মাঝে ডাক্তার-বাবুর মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোকের মাথাটা আসল মাথা নয়,—শ্বেত পাথরের কিংবা অর্ধনির্মাণ কোনো কিছু। কেবল থেকে থেকে ধ্যাপান করে প্রমাণ করছিলেন, না মাথাটা নকল নয় আসলই। কিন্তু ভদ্রলোক চোখ তুলে তাকান না কেন? কথাই বা বলেন না কেন? এ কি রকম ভদ্রতা?

এখন সময় ভিতর থেকে ডাক্তারবাবুর ডাক এল রোগী দেখবার জন্যে। রোগীর নামে ভদ্রলোক চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তাই বটে, বাড়ীতে কঠিন রোগী না থাকলে লোকে এখন বিহুর্ব হয়ে চুপচাপ থাকে না। ডাক্তারবাবু উৎসাহের সঙ্গে ভিতরে গেলেন। কত ঘর, কত বারান্দা বে পার হলেন, তার আর ইয়েন্তা নেই। এত বড় বাড়ী রাজা-রাজী ছাড়া কারও হয় না। কিন্তু কোথাকার রাজা এ'রা? তিনি কি এণ্ডের নামও শোনেননি? কি জানি, এ কোন দেশ!

অবশেষে রোগীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রকাশ্ম বড় হল-ঘরের এক প্রান্তে একখানা মেহাগনী খাটের উপর রোগী আপাদমস্তক একখানা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে। তার মাথার একরাশ চুল খাট থেকে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। মাথার শিয়ারে একটি মোমবাতি মিট মিট করে জ্বলিছিল। সে আলোয় এত বড় হল-ঘরের কিছুই আলো হচ্ছিল না, কেমন অন্তর্ভুত ধরণের ঝাপসা দেখাচ্ছিল! খোলা জানালা দিয়ে ঘরের স্থানে স্থানে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। ডাক্তারবাবু অবাক, হয়ে দেখলেন, সেই বুড়ো ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই কি করে তাঁর আগে এসে ঘরের মাঝখানে বসে আছেন। এ ঘরেও মেঝেতে জার্জিম পাতা। আর ভদ্রলোক —নীচের ঘরের মতো অবিকল তের্ণিন করে বসে,—চোখ নামানো, মুখে সেই গড়গড়ার নল, নিঃশব্দে বসে।

কিন্তু অভ্যন্তর নিরীহ ডাক্তারও রোগীর সামনে চটপটে হয়ে পড়েন।

ডাক্তারবাবু, একবার ঘরের চারিদিক তাঁকিয়ে যেন কোনো কিছুই ঝুক্ষেপ না করেই রোগীর পাশের খালি চেয়ারটায় বসলেন। কারো দিকে না চেয়েই যেন দেওয়ালকে লক্ষ্য করে বললেন,—কান্দন থেকে অসুখ হয়েছে? অসুখটা কী?

কেউ জবাব দিলে না।

ডাক্তারবাবু, আবার জিজ্ঞেস করলেন,—কই দোখ যা, আপনার হাতটা?

এতক্ষণে যেন রোগীর দেহে স্পন্দন দেখা গেল। কিন্তু মৃথের ঢাকা খুললে না, বোধ হয় শ্রীলোক বলে।

ডাঙ্গার আরও এগিয়ে এসে আর একবার বললেন,—দোষি হাতখানা।

বলল হাত বাড়াতেই আর একখানা হাত চাদরের ভিতর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর হাতে এসে ঠেকল,—মাংসহানি হাত, আস্ত একখানা হাড়!

ডাঙ্গারবাবুর সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল! ভরে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঁচি গেল নিবে! হা হা করে চারিদিক থেকে একটা বিকট আওয়াজ উঠল। মনে হল, সে-শব্দে সমস্ত বাড়ীটা বোধ হয় হৃদযুক্ত করে তাঁর মাথায় ভেঙ্গে পড়বে! আর চোখ বন্ধ করেও তিনি দেখতে পেলেন, হাজার জোড়া ঘোলাটে চোখ চারিদিকে হাওয়ার নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, আর ছিটি ছিটি হেসে ইস্মারা করে তাঁকে যেন ডাকছে!

ডাঙ্গারবাবু, অজ্ঞান হ'লে চেয়ার থেকে সশ্বে ঘোরেয়ে পড়ে গেলেন।

যখন তাঁর জ্ঞান হল, তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। দেখলেন বাড়ীটা বড় বটে, কিন্তু রাত্রে যে ঝুঁক্বর্যা দেখেছেন, তার কিছুই নেই। দেওয়ালের চুন-বালি খসে খসে পড়েছে। ঘুলঘুলিতে হাজার হাজার চার্মাচকে বাসা বেঁথেছে। আর ঘরের ঘণ্যে ভীষণ একটা দুর্ঘন্ত উঠেছে। ঘেরেতে কাল যে জাজিম দেখেছেন, তার চিহ্নমূল নেই; সে লোকজনও কোথায় অদ্ব্য হয়েছে। ঘরের এক প্রান্তে একটা খাট আছে বটে,—কিন্তু মেহেগিনীর নয়, একটা সাধারণ পাস্তা-ভাঙা তন্তপোষ! তার ওপরে যে ছেঁড়া তোষকটা আছে, তার থেকে ইঁদুরে তুলো বের করে ঘরময় ছাঁড়িয়েছে। ডাঙ্গারবাবু, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসে বসলেন। চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার ফলেই হোক অথবা বহুদিন পরে ঘোড়ায় চড়ার জন্যেই হোক, সর্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হচ্ছিল। চারিদিকে তাঁকয়ে তাঁকিয়ে দেখতে লাগলেন, বাঁদি কারও দেখা পাওয়া যায়। এমন সময় দেখা গেল, একটি আধবুড়ো লোক আপন মনে হল, হন্ত করে আসতে আসতে হঠাত তাঁকে দেখে থম্কে দাঁড়িয়ে গেল। এইবার ছুট দেবে বোধ হয়!

ডাঙ্গারবাবু, তাড়াতাড়ি ডাকলেন—শুনুন মশাই, শুনছেন? এটা কোন জায়গা বলতে পারেন?

মানুষের গলা শুনে লোকটি যেন আশ্বস্ত হল। তবে দ্রু থেকেই বললে,—মহেশপুর,—মালদ' জেলা।

—বলেন কি! সে বে অনেক দ্রু!

—তা বোম্বাই থেকে অনেক দ্রু বই কি। এখান থেকে কাছেই।

লোকটি অতক্ষণে কাছে সরে এল। হেসে বললে,—কোথেকে আসছেন? ডাঙ্গার বৰ্তা?

ଅନ୍ତୁତ ସତ ଭୂତେର ଗପ୍ପି —

ମେଟ୍ରୋତେ ବୁଡ଼ି



— ଆମାଦେର ସାମନେ ଏମେ ଦୀଢ଼ାଲୋ ମେଇ ବୁଡ଼ି, ମେଇ ତାର କାଦାର
ଗଡ଼ା ହାତଥାନା ବାଡ଼ିଯେ ଧରଲୋ, ଆମାଦେର ସାମନେ !

অন্তুত যত ভূতের গন্ম—

ভৌতিক কাহিনী



কস্তুরাকে পেলাম, কিন্ত এবাব আৱ কস্তুৰ সৱছে ন।—

[পৃঃ ৮৯]

—ইঠি, ডাঙ্গার। আসছি শুর্ণিদাবাদ থেকে। জঙ্গীপুরের কাছে আমার বাড়ী।

—বুঝেছি!

—কি বুললেন বলুন তো? এইখানে বসুন।

লোকটি তাঁর কাছে বসে বললে—এই যে বাড়ী দেখছেন, এ'রা এককালে রাজা ছিলেন। ইদানীং অবস্থা খারাপ হয়ে আসছিল। কিছুদিন আগে গ্রামে হঠাত কলেরা লাগে। কলেরা জোর লাগতেই এখানকার হাসপাতালের ডাঙ্গার একদিন রাতে প্রাণের ভয়ে স্ট্রী-প্ল্যাট নিয়ে সরে পড়েন। ঠিক সেই রাতেই রাজবাড়ীতে কর্তৃব্যব্র একমাত্র মেয়ের কলেরা হ'ল। গ্রামে ডাঙ্গার নেই। চারিদিকে ঘোড়া নিয়ে লোক ছুটলো যেখান থেকে হোক ডাঙ্গার আনতে। কিন্তু ডাঙ্গার আর পাওয়া গেল না। কর্তৃব্যব্র বড় ফেয়ারের ঘোড়া, মশাই—অমন ঘোড়া আমার চোখে আজ পর্যন্ত পড়েনি,—যাব থেকে সেটারও যে কি হ'ল, রাস্তাতেই মারা গেল। আর ভোর হতে না হতে রাজবাড়ীর সমস্ত লোকও শেষ হয়ে গেল। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার মশাই, বেন ভোজবাজি।

কর্তৃব্যব্র কথা উঠতেই ডাঙ্গার শিউরে উঠলেন। বললেন,—তারপর?

—তারপর আর কি মশাই! আঠে কোনো ডাঙ্গারকে রাতে একা পেলে তাঁর আর রক্ষে নেই। আপনি একা নন, এর আগে আরও দু'-তিনজন ডাঙ্গার এমনি বিপদে পড়েছিলেন।

উঠতে উঠতে লোকটি বললে,—যাকগে, সে-সব কথা মশাই! একশো মাইলের ফেরে পড়েছেন। এবেলা আমার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করবেন চলুন, ওবেলা আপনার যাওয়ার যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

ডাঙ্গারব্যব্র, উঠতে উঠতে বললেন—তাই চলুন।

ভৌতিক কাহিনী



—গোৱাঞ্চপ্ৰসাদ বসু—

কলকাতা থেকে দারঞ্জিলিং
শিয়ালদা থেকে দারঞ্জিলিং মেলে
শিলগড়ি—

শিলগড়ি থেকে ভাড়া-মোটরে দারঞ্জিলিং।

পৃজোৱ ছুটিতে কলকাতা ছেড়ে আমাদেৱ দারঞ্জিলিং আসা। আমাদেৱ
মানে—আমাৰ ও আমাৰ বন্ধু কমলেৱ।

শিয়ালদায় রাত নটায় ঝোঁখে চেপে ভোৱ আটায় শিলগড়ি পেঁচলাম।
শিলগড়িতে দশটাৱ সমৰ ভাড়া-মোটরে উঠে বসলাম—ঘণ্টা তিন-চাৰেৱ ঘৰোই
দারঞ্জিলিং পেঁছে যাবাৰ কথা। কিন্তু ঠিক সময়ে দারঞ্জিলিং পেঁচানো গেল না।
ভাড়া-মোটৱ আমাদেৱ সব রান্তা নিয়ে যেতে পাৱেনি, বৰং তাকেই আমাদেৱ ঠেলে
নিয়ে আসতে হয়েছে মাইল-কয়েক। কাৰ্সিয়াং-এৱ কিছু আগেই মোটৱ কল
খাৰাপ হয়ে গেল। পাহাড়ে-ৱান্ডা ভেঙে আমাদেৱই মোটৱ ঢেনে আনতে হল
কাৰ্সিয়াং-এ। তাৱপৰ ওখানে মোটৱ সাৰিয়ে দারঞ্জিলিং-এ আগমন।

দারঞ্জিলিং-এ যখন পেঁচলাম, তখন সন্ধ্যে পেৱিয়ে গৈছে। ছুটাৱ আগেই
এখানে সন্ধ্যে হয়।

মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে আগেই চিঠি লিখে জায়গার বাবস্থা করেছিলাম। গিয়ে নাই বলতেই ঘ্যানেজার আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। ঘরখানা বেশ—দুর্দিকে দৃঢ়ানা খাট—বিছানা-পন্তর—সে সব হোটেলের! ও-সব কিছুই আমাদের আনতে হয়নি।

জিনিষ-পন্তর রেখে হাতমাথ ধূয়ে নীচে খেতে গেল কম্বল—আমার আর খাওয়ার উৎসাহ ছিল না—পাহাড়ে-পথ মোটরে আসতে এবং ঘোটার ঠেলে নিয়ে আসতে, দ্বৰাৰ বার্ম করেছি। ভাৱী ঘূৰ পাঞ্চল—আলো নিৰ্বায়ে কম্বল টেনে শুৰু পড়লাম—শোওয়া মাঝই ঘূৰ!

কতক্ষণ ঘূৰিয়েছি জানি না—হঠাতে আমার ঘূৰ ভেঙে গেল—দৈৰ্ঘ্য, গায়ের কম্বল গায়ে নেই—আমি শীতে কাঁপছি। কম্বলটা সরে গেছে বোধ হয়! পা দিয়ে অনেক খুঁজলাম—শেষে হাতড়াতে স্বৰূপ কৱলাম। কিন্তু কম্বল কই?

হাতটা একটু বাড়াতেই কম্বল পেয়ে গেলাম। সরে গেছে বোধ হয়! কম্বল ধৰে টান দিলাম—কিন্তু কম্বল এলো না—কি ব্যাপার? জোৱে আৱ একবাৰ এক টান লাগাতেই কম্বলটা আলগা হয়ে আসছিল—কিন্তু পৱিক্ষণেই কে ষেন টেনে নিয়ে গেল কম্বলটাকে—টাগ-অব-ওয়াৱে আমি হেৱে গেলাম—দম্ভুৱামত চমকে উঠলাম।

আবার হাতড়াতে স্বৰূপ কৱলাম—কম্বলটা পেলাম, কিন্তু এবাৱ আৱ কম্বল সৱছে না—হাতড়ে বুৰুলাম, একটা লোক কম্বলটা গায়ে শক্ত কৱে জড়িয়ে শুশ্ৰে আছে আমাৱ পাশে।

“এ আবাৱ কে?”—ভাবনা হ'ল। একটু ভয়ও পেলাম। “চোৱ-ডাকাত নাকি?—চোৱ-ডাকাত হ'লে শুয়ে থাকবে কেন? তোৱ ত' চুৱি কৱে”—আমি ভাবতে থাকি, “হয়ত খুৰ শীত লেগেছে—এ হচ্ছে দারিঙ্গিলিং-এৰ শীত—অল্ধকাৱ একটু ফৰ্মা হলেই উঠে আমাদেৱ ফৰ্মা কৱবাৱ ঘতলৰ বোধ হয় ওৱ!”

সাহস কৱে ফেৱ হাত বাড়ালাম, “এই যে দেখছি নাক—একটা নাক—হ’ব, একটা নাক-ই বটে!”

“হ্যাচ্চোঁ! ”

কেমন কৱে আমার একটা আঙ্গুল ওৱ ওই একমাত্ৰ নাকে ঢুকে বাওয়াতে এই বিপন্তি—আমার পাশেৱ লোকটি হেচে দিল। আমি বেজায় রকম চমকে গেলাম—ভয়ও পেলাম খুৰ।

“এই যে দেখছি কান—একপাটি কান,—ঘলা থাক্ তা হ'লে—” ঘনেৱ সৰ্বে আৱ হাতেৱ স্থে ওৱ কান ঘলতে থাকি—ৱাত-দুপুৰে ভদ্ৰলোকেৱ ঘৰে চুৱি কৱতে তোকাৱ ফল, আৱ আমাকে হেচে ভয় দেখানোৱ শাস্তি,—“আঃ—উ-ঊ—” ভাৱী আৱাম পাই আমি—ওৱ এটা কম্বল কেড়ে মেৰাব দণ্ড।

ভাৱী শীত। আমার এদিকে—গায়ে একটা গেঁজী ছাড়া আৱ কিছুই নেই।

ভাবলাম, ডাকা শাক্ কমলকে, তারপর দুঃজন মিলে ওকে মেরে তাড়াব; ডাকাই
শাক্!

“কমল—কমল!” খুব নীচু স্বরে ডাকলাম।

কমলের সাড়া নেই।

“কমল—কমল!” আগের চেয়ে একটু উচু পর্দায় ডাকি।

কোন উত্তর নেই। ছেলেটা ভারী ঘুম-কাতুরে। ঘুমলে ওর আর জ্ঞান
থাকে না—একেবারে ঘড়ার ষত ঘুমোয়।

“কমল—কমল—!” একটু গলা তুলি।

“উঃ!” কমলের খাট আমার বাঁ দিকে—সেখান থেকে উত্তর আসে খুব নীচু
স্বরে।

“শোন্ত—!”

“কি?”

“দ্যাখ্ ভারী...!”

“কি দেখব—আর কেমন করেই বা দেখব—বা সুচীভোদ্য অন্ধকার!”

“দেখতে হবে না—শোন্ত...” আমি চটে উঠি।

“কি?”

“ভারী ঘুম্কিল—একজন লোক এসে আমার কম্বল কেড়ে নিয়ে খাটে আমার
পাশেই শুয়ে আছে; আমি এদিকে শীতে শর্ষিছু!”

“আমারও খাটে একজন এসেছে—কিন্তু কম্বল কাঢ়তে পারে নি—একবার টেনে
নিয়েছিল কেবল—ফের টেনে এনেছি—পাশে শুয়ে ভারী অতাচার শুরু করেছে!”

“ভারী শীতে করছে ভাই,—কি করিব?”

“আমার এখানেও দুঃজন—তা না হলে এখানে শূতে পার্বতিস—আমার কম্বলটা
ভাগাভাগি করে গায়ে দিতাম!”

“এখন কি করিব তবে?—তোর খাটের সেই লোকটি ত’ আমায় জায়গা ছেড়ে
দেবে না!”

“এক কাজ কর্...!”

“কি?”

“কাতৃকৃতু দিয়ে তোর পাশের লোকের কাছ থেকে কম্বল কেড়ে নে!”

“ও ভাই আমি পারব না—কোথায় বগল কে জানে?...কম্বলের ভিতর আমি
হাত ঢোকাতে পারব না—যাদি হাত কামড়ে দেয়!”

“তবে এক কাজ কর্...!”

“কি?”

“তোর পাশের লোকটাকে তুই এক লাঠি মেরে খাট থেকে ফেলে দে—আমিও
আমারটাকে দেখিছি!”

“আমি ভাই পারব না—আমার চেয়ে ওর গায়ের জ্বেল চের বেশী—কম্বল নিয়ে টাগ-অব-ওয়ার করতে গিয়ে আমি তা টের পেয়েছি। ও তাহলে আমার ঘেরেই ফেলবে!—কাছে যে ছোরা-ছুরি নেই, তাই বা কে বললে?”

“চেষ্টা কর...!”

আমার খাটের অপর বাসিন্দা বোধ হয় আমাদের কথাবাস্ত্ব শুনছিল—সে আমাদের দুঃজনার ঘণ্ট্যে ছিল—অর্থাৎ আমার বাঁ পাশে। ইঠাং এক প্রকাণ্ড লাঠিতে আমি খাট থেকে পড়ে গেলাম!

“বাবাগো”—বলে আমি আস্ত্রনাদ করে উঠি ব্যথায়। আমার পিলে বোধ হয় ফেটেই গেছে ওর লাঠির ঢোটে।

কম্বলের গলা শোনা যায় এতক্ষণে, “হ্যাঃ—হ্যাঃ—আমার সাথে চালাকি!—দিয়েছি ব্যাটাকে এক লাঠিতে ফেলে, হ্যাঃ!”

“কম্বল—কম্বল!—” আমি কে'দে ফেলি।

“কিরে, তোর কি হল?”

“আমাকে সেই পাঞ্জীয়া খাট থেকে ফেলে দিয়েছে!”

“ঘাবড়াস না—আম তুই আমার খাটে এসে শো—এই কম্বল দুঃজনে গায় দেওয়া যাবে!”

“ভাই কম্বল!—বে-কায়দায় পড়ে আমার পা মচকে গেছে—আমি আর উঠতে পারছি না—!”

“দাঁড়া, আমি আসছি—!”

ইঠাং আলো জরলে উঠল! কম্বল আমাকে পাঞ্জাকোলা করে নিয়ে তার বিছানায় শোয়ালে।

“সেই লোক দুটো কই?” আমি কম্বলকে প্রশ্ন করি, “ওদের ধরে পিটুনি দিতে হবে!”

“কই, দেখছি না ত’!” কম্বল আলমারীর পাশ, চৌকির তলা—সব খুঁজে দেখে।

“পালিয়েছে—বোধ হয়—”

“কোথা দিয়ে পালাবে?”

“কেন? দরজা!”

“দরজা? দরজা দিয়ে কেমন করে পালাবে? দরজা দেখছিস না ভেতর দিয়ে যাব!—পালাবাবু পর ভেতর থেকে কে দরজা বন্ধ করবে শুন?!” কম্বল চটে ওঠে!

“তবে তারা দেল কেথেরে? অদ্বুত অৱু হয়ৰি!”

“কি জানি—ব্যাপারটা ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে!”

“না—না—ভূত নয় কক্ষনো”—আমি তীব্র প্রতিবাদ করি, “ভূত কখনো অমন করে হাঁচতে পারে না—ও রীতিমত হেঁচেছে—তার উপর—আমি ওর কান মলে দেখেছি—ওর কান রীতিমত মানুবের কান!”

“মানুষ হলে তারা যাবে কোথায় শুনি? মানুষ ত' আর ভূত নয় যে, হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে!—ও ভূতই—নিশ্চয় মানুষ সেজে এসেছিল।”

হঠাতে আমার চোখ পড়ে আমারই পরিতাঙ্গ বিছানার উপর। বিছানা একেবারে টান করে পাতা—বালিশ সব ফোলানো—কম্বল পায়ের নীচে ভাঁজ করা—যেন কেউ শোয়ানি!

“কমল দেখছিস?” আমি কমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি বিছানার দিকে!

“এ সব ভূতুড়ে কাণ্ড!”

“তা হবে!” আমি আমার দৃঢ়থ ব্যঙ্গ করি, “শেষে ভূতের মার খেতে হল আমাকে...!”

“আমাকেই কি ছেড়েছে রে ভাই—!” কমল কাঁদ কাঁদ।

“তোকেও কি লাখি দিয়ে খাট থেকে ফেলে দিয়েছে নাকি?”

“না, তা দেয়ানি—তবে কান মলতে কসুর করোন—নাকে সৃঙ্খসৃঙ্খ দিয়ে হাঁচিয়েছে—ভূতটা কম বজ্জ্বাই!”

যাক, আমার ঘনটা এতক্ষণে আশ্বস্ত হলো কিছুটা,—ভূতের হাতে মার আমায় একলা খেতে হয়নি!





—ବ୍ୟକ୍ତିମୂଳର ବନ୍ଦୁ

ର୍ଯ୍ୟାବାର ଦୃପ୍ତିରବେଳା ବନ୍ଦେ-ବନ୍ଦେ ହାଇ ତୁଳାଛି । କୋନ କାଜ ନେଇ । ଗରମଙ୍ଗ ପଡ଼େଛେ ବନ୍ଦ ; ଆଶ୍ଵଲ ମାସେ ସଖନ ପ୍ରଚନ୍ଦ ରୋଦ ଓଠେ ଆର ଏକଟ୍ ହାଓଯା ଦେଇ ନା, ମେହି ଦୟ-ଆଟକାନୋ, ପିନ-ଫୋଟାନୋ ଗରମ । ଭେବେଛିଲୁମ, ଆନକୋରା, ଟାଟକା ମ୍ୟାଜଭେଣ୍ଟାର-ଗଲେପର ବିଥାନା ପଡ଼ିବୋ, କିନ୍ତୁ ଦୃପ୍ତା ପଢ଼େଇ ମନେ ହଜେ କୋଥାର ସେଇ ଆଗେ ପଡ଼େଛି ! ବନ୍ଦେ ଆଛି ଚୁପଚାପ ।

ଏହନ ସମୟ ପା ଟିପେ-ଟିପେ ଅନ୍ତରେର ପ୍ରବେଶ । ପା ଟିପେ-ଟିପେ—କେନଳା, ମେଜକାକା ପାଶେର ଘରେ ଦିବାନିଦ୍ରାଯ ସଚେତ ; ସେ-ବେଚାରାରା ନେହାବିହି ଛେଲେମାନ୍ୟ, ତାରା ଯେଣ କୋନ ବକରେଓ ତା'ର ମେହି ମହିଂ ଚେଷ୍ଟାଯ ବାଧା ନା ଦେଇ, ଏହି ହଜେ ତା'ର ତିନ ନମ୍ବର ଆଇନ । ଏକ ଆର ଦୃଇ ନମ୍ବର ଏଥିନ ନାଇ ଶୁଣିଲେ ।

‘କୀ ରେ ଅନୁତୋଦ, କୀ ମନେ କରେ ?’

କପାଳେର ଧାର ମୁହଁ ଅନୁତୋଦ ବଲିଲେ, ‘ଚଲ୍ !’

‘କୋଥାସ୍ ?’

‘ଚଲ୍, ସିନେମା ଦେଖେ ଆସି !’

‘ପାଗଳ ! ଏହି ରୋଷିରେ !’

‘କୀ ସେ ବୋକାର ଘରେ କଥା ବଲିଲୁମ୍ । ମେଟୋର ଭିତରଟା କେମନ ଠାଣ୍ଡା ! ଗରମେର ଦିନେ ଦୃପ୍ତର କାଟିବାର ଜ୍ଞାଯଗାଇ ସେ ଝାଇ !’

‘ଆଜ୍ଞା—ଚାପ କର୍ !’ ବାଗ୍ବିତନ୍ଦ୍ର କରିବାର ଉପାୟ ନେଇ, ପାଛେ ମେଜକାକାର ହୁର୍ମାକି

শনতে হয়! মনের মধ্যে নানা রকম প্রতিবাদ ফোস ফোস করছে, তব চুপ ক'রে থাকতে হ'ল।

‘তবে চল।’

‘পঞ্চসা?’

‘সেজনা ভাবতে হবে না। খঁট তুই। দেরী হ'য়ে থাক্ছে।’

মাকে ব'লে, এমন কি চার আনা পঞ্চসা আদায় ক'রে নি঱ে, (এটা দিয়ে ‘হ্যাপি বয়’ খাওয়া হবে) বেরিয়ে পড়লুম অনুভোবের সঙ্গে। খ'র্ষ খ'র্ষ রোদ, গাছের পাতা নড়ে না। এদিকে বালিগঞ্জের রাস্তার প্রায় তো আর সহজে আসবে না।

একটা গাছের ছায়ার দাঁড়িয়ে আছি দৃঢ়লে, এমন সময় একটা বৃক্ষী এসে আমাদের কাছে হাত পাতলো। ভিত্তিরীর জন্মায় কোনথানে কি শালিত আছে! আমরা একটু স'রে দাঁড়লুম, কিন্তু ছায়াট'কু ছেড়েও যেতে পারিনে। বৃক্ষীটা আমাদের খ'ব কাছে এসে দাঁড়ালো। এগুলিতেই ভিত্তিরী দেখলে আমার বড় বেশো করে, তার উপর ভিত্তিরীদের মধ্যেও অনন বৈভৎস কঞ্জালমণ্ডি চট্ ক'রে ঢোকে পড়ে না। ও কিছু বললো না, ওর নংয়ে-পড়া শরীর থেকে যেন একথানা কাদায়-গড়া হাত বেরিয়ে এসে শ্বেচ্ছা বুলে রইল। আমি ওর দিকে না-তাকাবার ষতই চেষ্টা করলুম, ততই আমার চোখ ওর ওপরে গিয়ে পড়তে লাগল। বিশ্রী!

অনুভোব বললে, ‘দ্যাখ, গরমে বৃক্ষীটা কেমন ধ'কছে! ঠিক কুভার মতো।’

আমি বললুম, ‘হাক, ঐ প্রায় এলো।’

‘চল, বৃক্ষীকে মেঝেতে নিয়ে যাই, খ'ব ঠাণ্ডা লাগবে’, ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো অনুভোব।

একটু পরেই আমরা প্রায়ে চেপে বসলুম। টিকস্ টিকস্ চলেছে বালিগঞ্জের প্রায়, সময় আর কাটে না। একস্থগ পরে এসে পেঁচানো গোল। রাস্তাট'কু পার হয়েই যেঁটো। আজ বস্ত ভিড়, জোর ছবি দিয়েছে। ন' আনা টির্কিটের জন্মায় ফিরিঙ্গি-বাঞ্চালী মিশিয়ে দশ-বারজন দাঁড়িয়ে। অনুভোবই আজ ‘বস্’ করছে; সে এগিয়ে গেলো টির্কিট আনতে, আমি একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

টির্কিট নিয়ে এলো অনুভোব, আমরা ভিতরে ঢুকতে যাবো, এমন সময় ভাবতে পারো!—আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো সেই বৃক্ষী, সেই তার কাদায়-গড়া হাতখানা বাঁড়িয়ে ধরলো আমাদের সামনে! আমরা তো হতভব!

‘এ কী! ও এখানে এলো কেমন ক'রে?’ বলে উঠলো অনুভোব।

আমি সেই কথাই ভাবাছিলাম। এই মেঝে সিনেমায়, সারেব, মেঝ আর অক'ক'কে বাঞ্চালীর ভিড়ের মধ্যে ওকে যে কী বেখাস্পা, কী বৈভৎস দেখাচ্ছেল তা আর কী বলবো! ওকে যে ওরা তাঁড়িয়ে দিচ্ছে না, সেটাই তো আশ্চর্য—এ-সব জ্যায়গায় তো আর কোনোদিন ভিত্তিরী দোধি নি!

আমি বললুম, ‘আমাদের প্রায়ে ক'রেই উঠে এলো নাকি?’

ଅନୁତୋଷ ବଲଲେ, 'ହାଁ ରେ, ଟାମେ ଏସେହେ ନା ରୋଲ୍‌ସ୍ ହାର୍ଫିକରେ ଏସେହେ!'

'ତବେ ଓ ଏଲୋ କି କ'ରେ? ଉଡ଼େ ତୋ ଆର ଆସେନ?'

'ନେ, ନେ, ଆର ମାଥା ଦ୍ୱାରାତେ ହବେ ନା। ଚଳ, ଭିତରେ ବସ ଗେ।'

ବୁଢ଼ୀଟା କିମ୍ବୁ ସେଇ ଏକଭାବେ ଠାର ଦାଢ଼ିଯେ ଆଛେ, ଏକଟି କଥାଓ ବଲଛେ ନା, ଏକଟି ନଜ୍ଦହେବେ ନା। ଚାରିଦିକେ ଏତ ଲୋକ—ଓକେ କେଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଛେ ନା କେନ? ଆଶର୍ଯ୍ୟ!

ଭିତରେ ଗିଯେ ବସେ ପଡ଼ିଲୁମ, କିମ୍ବୁ ମାଥାର ମଧ୍ୟେ କଥାଟା କେବଳଇ ଘରତେ ଲାଗଲୋ !
ଅନୁତୋଷକେ ବଲଲମ,—ଦ୍ୟାଖ, ଏ ବୁଢ଼ୀ ଠିକ ସେଇ ବୁଢ଼ୀଇ ତୋ ?'

'ମନେ ତୋ ହଲୋ ଠିକ ସେଇ ରକମିଇ। କେ ଜାନେ! କଲକାତାର କତ ଭିନ୍ଧିରମୀ ଆଛେ, ହତେଓ ପାରେ ଏ ଆର-ଏକଜନ। କିମ୍ବୁ ଏକେବାରେ ଏକ ରକମ !'

'ଯଦି ଓ-ଇ ହୁ—କୀ କରେ ଏଲୋ ବଲ, ତୋ! ଆଶର୍ଯ୍ୟ ନା ?'

ଅନୁତୋଷ ଚୂପ କରେ ରହିଲୋ ।

'ତା ଛାଡ଼ା', ଆମି ଚୁପ-ଚୁପି ବଲଲମ, 'ଆମାର ମନେ ହାଇଲ, ଆମରା ଛାଡ଼ା ଆର-କେଉ ଓକେ ଦେଖତେ ପାଞ୍ଚେ ନା !'

ଅନୁତୋଷ ହେସେ ଉଠିଲୋ । 'ତୋର ମାଥା ଖାରାପ ହଲୋ ନାକି ରେ ?'

'ତବେ ଓକେ ଓରା ତକ୍ଷୁଣି ତାଢ଼ିଯେ ଦିଲେ ନା କେନ ?'

'କୀ ସେ ବଲିସ—ଭିତରେ ମଧ୍ୟେ ଚୋଥେ ପଡ଼େ ନି ଆର କି! ନେ, ଚୂପ କର । ଆରମ୍ଭ ହଲୋ !'

ଏକଟା ବେଗ୍-ନି ରଙ୍ଗେ ଠାଣ୍ଡା ଅନ୍ଧକାରେ ମଧ୍ୟେ ବସେ ସିଲେମା ଦେଖତେ ଲାଗଲମ । ନିଉଝ-ରୀଲ ହରେ ଗେଲୋ, ଆରମ୍ଭ ହଲୋ, ଦିନିବଜନୀ ଛବି । ଅନେକକଷଣ ଏକ ଅନେ ଦେଖାଇ, ହଠାତ କୀ-ରକମ ଅନାମନମ୍ବ ହରେ ଗେଲମ । ଛବିର ପର୍ଦା ଥେକେ ଆମାର ଚୋଥ ନେମେ ଏଲୋ ପ୍ରେକ୍ଷାଗତେ । ଆଥେ ଚାଁଦର ଆକାରେ ଚୟାରେର ପର ଚୟାରେର ସାରି—କତ ରକମ ଲୋକ ବସେ—ଏ-ଓ ଦେଖତେ ମନ୍ଦ ଲାଗେ ନା । ତାରପର ହଠାତ ଯେନ ଆମାର ନିଃବାସ ବନ୍ଧ ହରେ ଗେଲୋ ।

ଠିକ ଆମାଦେଇ ସାରିତେ, ଆମାଦେଇ କହେକଟା ଚୟାର ପରେ, ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ବସେ । ଚପଟ ଦେଖିଲମ ସେଇ ରାଙ୍ଗିନ ଅନ୍ଧକାରେ । ଠିକ ମେ ବସେହେ ଚୟାରେ, ଶରୀର ନୂରେ-ପଡ଼ା, ଏକଥାଳା କାଦାୟ-ଗଡ଼ା ହାତ ସାମନେର ଦିକେ ବାଡ଼ାନେ ।

ଆମାର ସମ୍ଭାବ ଶରୀର ଅବଶ ହେସେ ଗେଲୋ, କିଛିତେଇ ଚୋଥ ସାରିଯେ ନିତେ ପାରିଲମ ନା ।

ଅନେକକଷଣ ପର ଆପଣେ ଏକଟା ଠେଲା ଦିଲମ ଅନୁତୋଷକେ । ଫିସ-ଫିସ୍ କରେ ବଲଲମ, 'ଓ ଦ୍ୟାଖ୍ !'

'କୀ ?'

'ଓ ହେ—' ଆମି ଆଞ୍ଚଳ ବାଡ଼ିଲମ ଓଦିକେ, କିମ୍ବୁ ତାର ଆଗେଇ ଅନୁତୋଷର ମୁଖ ଏକେବାରେ ସାଦା ହରେ ଗେଲୋ ।

ହେତୋ ଆମାଦେଇ ଚୋଥେର ଭୂଲ, ହେତୋ ଆମାଦେଇ ଦ୍ୟାଜନେରଇ ମାଥା-ଖାରାପ ହେଯାଇ ।

জোর করে আবার সিনেমা দেখতে লাগলুম; অর্থহীন কতগুলো ভৌক-বাঁজি নেচে যাচ্ছে চোখের সামনে। একটু পর-পরই আমরা তাকাচ্ছি ওদিকে—হাঁ, ঠিক বসে আছে বৃড়ী, শরীর ন্যুন-পড়া, একথানা কাদার মতো হাত সামনে বাড়ানো! মেট্রো সিনেমার ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে বসেও ঘেঁষে জল হ'য়ে গেলুম।

হঠাতে অন্তোষ বললে—‘আর না, চল।’

আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম। উঠে দাঁড়ালুম দু'জনে, ন্যুন-ন্যুনে কয়েকটা পা মার্ডিয়ে, দু'-একটা হাঁটুতে ধাক্কা দিয়ে বাইরে এসে মেন বাঁচলুম। পিছন ফিরে তাকালুম না একবারও। এক দৌড়ে একেবারে রাস্তায়!

বাইরে ঝাঁকাঁ রোদ, বিরাট সহর, আর লোক, কত লোক!

ফিরতি প্রায় ধরলুম। সারা রাস্তা দু' বৰ্ধ, একেবারে চুপ। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কেঁজন একটা ভয় যেন গলা আঁকড়ে ধরলো! আবার যদি সেইবানে, সেই গাছের ছায়ায় শুকে দেখি! কিন্তু না—কিছু নেই, কেউ নেই। বাড়ি ফিরেও শাল্প নেই, হঠাতে যদি আবার—। রাস্তারে ভালো ঘূর হ'লো না।

পরের দিন খেতে ব'সে মা বললেন, ‘কী কাঙ্গ! কাল দেখি, আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় গাছের নীচে একটা বৃড়ী মরে প'ড়ে আছে।’

বাবা বললেন, ‘কত হচ্ছে এ-রকম?’

‘ম'রে পড়েই আছে—কতক্ষণ পর কর্পোরেশনের লোক এসে নিয়ে গেলো।’

আমি বললুম, ‘কখন, বলো তো?’

‘এই তো দু'পৰবেলো—তুই বেরিয়ে গেলি, তার একটু পরেই। কী বিশ্বি দেখতে। ও কি? তোর খাওয়া হ'য়ে গেলো?’

আমি তাড়াতাড়ি পাতে জল ঢেলে বললুম, ‘আর খাবো না।’

‘কী হ'লো তোর?’

‘কিছু হয় নি’ বলে আমি উঠে পড়লুম।





—শ্রীঅংচলকুমার সেনগৃহ

নীচে প্রায় সদর দরজার কাছেই ছোট একটা ঘরে বিনোদ শোয়,—এবং একা শোয়, নীচেটা একদম ফাঁকা, তবু কিছুতে বিনোদের ভয় নেই। সেদিন তাদের পাশের বাড়ির ছাদে যে একটা জলজ্যান্ত খুন হল—এত হৈ-চৈ, এত কানাকাটি— এবং তারই ঘরের পাশের গালি দিয়ে যে সেই রক্ষাত্মক ম্তদেহটা ঘোটেরে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল—এতেও বিনোদের ঘৃণ ভাঙেনি। মা তাকে জাগাতে এলে বলোছল,—পায়ের দিকের জানালাটা খুলে দাও, যা গরম আজ!

মা বললেন,—তুই ওপরে চল, আমার কাছে শৰ্বি!

বিনোদ পাশ ফিরে বললেন,—কিসের তোমার ভয়! এত গোলমালে সেই খনেটা ত' আর ষ্পটি মেরে বসে থাকোন, কখন দিব্যি সরে পড়েছে। সে আবার এখানে ফিরে আসবে নাকি?

মা অবৈরের মত বললেন,—না, তুই চল ওপরে। তুই এ ঘরে একা ধার্কিস্ বলে রাখে আমার ঘৃণ হয় না। চাঁচালেও শন্তে পাবো না।

—চাঁচানি তোমাদের শন্তে দেব নাকি ভেবেছ? যদি ব্যাটা আসে, টুকুটি টিপে তার দম বন্ধ করে' দেব না?

তার দিদি বললেন,—কিন্তু যাকে মেরেছে, সে যদি জান্না দিয়ে এসে মৃথ বাঢ়ায়?

বিনোদ হেসে বললে,—তার মুখটা ভালো ক'রে দেখবার জন্যই ত' পারে

দিকের জান্মাটা খুলে রাখতে বললাম। ঘৃত্য যদি বাড়ায়-ই তবে নেহাঁ না হয় দুটো গল্প করা যাবে।

কিছুতেই বিনোদের ভয় নেই। তার স্কুলের বন্ধুরা কত ষড়বন্দ করে' তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে' রাণ্টিবেলা জানালা দিয়ে হাত বাঁড়িরে মশারির দাঁড় নাড়ে, তিল ছাঁড়ে, বিকট স্বরে হারিবোল দেয়, চাকরের হাতে পয়সা গঁজে দরজা খুলিয়ে ওর তত্ত্বপোষের তলায় গিয়ে সুকোয়,—গৌঁ গৌঁ করে, ঠুক-ঠাক, দুম, দায়, শব্দ করে, কিন্তু বিনোদের যেই ঘূর্ম সেই ঘূর্ম। শেষকালে আরশ্বলার উৎপাতে ওরাই বেরিয়ে আস্তে পথ পায় না, গায়ে ঠেলা দিয়ে জাঁগয়ে বলে, কিছুতেই তাকে তর দেখাতে পারলুম না বিনু!

বিনোদ হেসে বলে—দুবেলা যে নিয়মিত ডন-বেঠক করে, তার আবার ভয় কি? খেরে হজম করি আর গভীর করে' ঘূর্মাই—

শেষকালে অভয়কে বলতে হয়,—একা-একা বাঁড়ি ফিরে যেতে আমারই এখন ভয় ইচ্ছে!

বিছানা থেকে বাট্' করে' লাফিয়ে উঠে বিনোদ বলে,—চল, তোকে বাঁড়ি পর্যাপ্ত এঙ্গরে দিয়ে আসি।

রাত তখন প্রার বারোটা! রাম্ভা-ঘাট নিয়ম! বিনোদ তার বিছানায় অসাড়ে ঘুমোছে। এমন সময় সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো। কে যেন গলা খাঁখরে ডাকলে—বিনু, বিনু!

সাধারণতও এত সহজে বিনোদের ঘূর্ম ভাঙে না, কিন্তু সেই অস্ফুট কণ্ঠের ডাক শূনে চট্' করে' তার ঘূর্ম ভেঙে গেল। এমন অনেক কালা আছে চৈঁচয়ে কথা বললে তার এক বর্ণও যারা শুনতে পায় না, কিন্তু চলত প্রেনের শব্দের মধ্যেও আস্তে তাদের একটু নিল্দে করলে তেড়ে উঠে বলে,—কী বললে? ভাবো, আমি শুনতে পাই নি?...বিনোদেরও আজ সেই দশা! চুপ-চুপ কেউ তাকে ভয় দেখাতে এসেছে বৰ্ধি? কিন্তু সব সময়েই সে সাবধানী! জোরে ডাক্লে সে তের্বানি ঘুমোয় বটে, কিন্তু আস্তে ডাকলে জেগে উঠতে জানে।

পাছে লোকটা সাড়া পেয়ে পালায়, বিনোদ তাই কোনো কথা না বলে' হাতে একটা লক্জেকে বেত নিয়ে নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে দিল।

সির্পির উপর দাঁড়িয়ে অভয় হাসছে।

বিনোদ ত' অবাক! বললে,—তুই এই সময়? এত রাতে? কী দরকার? অভয় ভিতরে ঢুকে বললে,—সাড়ে ন'-টার শো-তে বারোক্ষেকাপে গিয়েছিলাম। এই ফিরিছি।

—বাঁড়ি ঘাস্ নি?

অভয় চাপা গলায় বললে,—বাঁড়ি আর ফিরবো না।

—কেন, কী হলো?

—বাবা-মা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন!

বিনোদ বিস্মিত হয়ে বললে,—তাড়িয়ে দিয়েছেন! কেন? কী অপরাধ?

—অপরাধ আবার কী! ও-বাড়ীতে আমার আর পোষাবে না।

তারপর ঘরের চৌকাটের দিকে পা বাড়িয়ে বল্লে—চল, ভেতরে, বলছি।

ঘরের এক কোণে ক্যানভাসের একটা ইঞ্জিনের, তার উপর বসে' অভয় বললে,—তোর এখানে আজ আমি শোব। দিবি ত' শুতে?

বিনোদ আলো জড়ালো। বললে,—স্বচ্ছলে!

আলোতে বিনোদ দেখলে অভয় অত্যন্ত অন্তর্ভূত মেজেছে। গায়ে গরদের পাঞ্জাবির ওপরে দামী শাল, পরশে নৈল সিল্কের ধৰ্তি, পায়ে ঝরির জুতো, হাতের কঙ্গিতে মোনার রিষ্ট-ওয়াচ বাঁধা। সারা গায়ে এসেলের গম্ফ ভূর-ভূর করছে—পরিপাটি করে' টোর বাগানো। ডান হাতের আঙুলে হৈরের একটা আংটি।

বিনোদ বললে,—এত মেজে-গৃহে বেরিয়েছিস! চেহারা দেখে ত' ত্যাঙ্গ-প্রত্যক্ষ হয়েছিস বলে মনে হয় না!

অভয় হেসে বললে,—বাবা-মা বাড়ি থেকে বার করে দিলেন বটে, কিন্তু যত-কিছু আমার জিনিস ছিল, সব সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বললেন,—এই নাও তোমার জিনিস-পত্র, আর এ-মুখো হয়ে না বাছাধন! যেখানে খুসি বেরিয়ে পড়। সেই যে জাপানি বাঙ্গাটার রোজ দু'আনা চার আনা করে' জমাতাম বিন, সেই বাঙ্গ ভেঙে সব খুচরো সিংকি-আধুনিক আমার পকেটে দিয়েছেন। বললেন—যেখানকার খুসি টিঁকিট কেটে ভেসে পড়, তোমার এই কালো মুখ আর দেখতে চাইনে।

বিনোদ বিছানায় বসে' অভয়ের ঘুর্খের দিকে একদল্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। পরে বললে,—কিন্তু কী তুই করেছিল শৰ্ণিন?

—বলছি। অভয় হাত বাড়িয়ে বললে,—তোর ম্যাপের বইটা দে ত'?

—কী করবি?

—একটা জায়গা খুঁজে বের করবো। খুব দূরে—যেখানে আনুষ সহজে যেতে চায় না। ধর, গ্রীন্ল্যান্ড—বছরে ছাটা মাস সেখানে রাত, কঠিন বরফের দেশ—পাড়িস্নি ভৃগোলে?

বিনোদ হেসে উঠলো। বললে,—কিন্তু পকেটে মাত্র ত' কয়েকটা টাকার খুচরো দেখতে পাওছি। এই নিয়ে তুই গ্রীন্ল্যান্ডে বাবি?

টোবলের উপর 'য্যাট্লাসটা' পড়ে ছিল, সেটা হাত বাঁধিয়ে তুলে নিয়ে অভয় পাতা উল্টোতে লাগলো। বললে,—এমন জায়গায় যাবো, যেখানে যেতে ভাড়া লাগে না।

বিনোদ হেসে বললে,—আপাততঃ দেখাই সে ত' আমার শোবার ঘর। তুই

ପାଗଲାମି କରିସନେ ଅଭୟ । ଚଲ, ତୋକେ ବାଡ଼ି ରେଖେ ଆସି । ବାବା ବକେ ଥାକେନ, ଏଥିନ ନିଶ୍ଚରଇ ସ୍ଵତ ହୈରେ ତୋକେ ଥିଲେ ବେଡ଼ାଛେନ ।

ଅଭୟ ବଲଲେ,—ଥୁର୍ଜନ ଗେ! କିମ୍ବୁ ଏକବାର ସଥିନ ବୈରିଯେଛି, ଆର ଆମି ଫିରାଇ ନା । ଜାହାଜେ କରେ' ଆମି କ୍ଷେତ୍ରେ ଯାବୋ, ମେଥାନ ଥେକେ କଲମ୍ବାସେର ମତୋ ନ୍ତନ ଅହାଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରତେ ବେରୁବ । ଜାହାଜ ନା ପାଇ, ସଙ୍ଗୀ ନା ଜୋଟେ, ତବୁ ଆମି ପେହୁ-ପା ହୁବ ନା । ନେ, ଆଲୋଟା ନେବା—ଆଜ ରାତଟା ତ' ଏଥାନେ ଘୁମୋଇ!

ବିନୋଦ ବଲଲେ—ଆମାର ବିଛାନାୟ ଉଠେ ଆୟ । ଦୁଃଜନେ ଥୁବ ଧରବେ ।

ଅଭୟ ବଲଲେ,—ନା, ନା, ଆମି ଚିଂ ହୈଁ ଆରାମ କରେ ଶୂତେ ପାରବୋ ନା, ଆମାର ମେରଦିନେ ଥୁବ ଚୋଟ ଲେଗେଛେ । ଏହି ବେଶ ଘୁମୋତେ ପାରବୋ ଏଥାନେ । ଏକଟା ବାଲିଶ ଏଗିଯେ ଦେ ଦେଖି । ...ବଲେ ସେ ନିଜେଇ ଆଲୋ ନିବିରେ ଏକଟା ବାଲିଶ ଟେନେ ପିଟରେ ତଳାୟ ରେଖେ ଆବାର ବଲଲେ,—ନେ ତୁଇ ଏଥିନ ଶୁଣେ ପଡ଼ । ଦେର ରାତ ହେବେ । କାଳ ଭୋରେ ଉଠେ ଚା ଥିତେ-ଥିତେ ନା ହସ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ କରା ଯାବେ ।

ବିନୋଦ ବଲଲେ,—ଏମିନ ତୋର ଘୁମ ଆସବେ? ହତଭାଗା, ଉଠେ ଆୟ ଓପରେ ।

ଅନ୍ଧକାରେ ଅଭୟ ଥିଲ୍-ଥିଲ୍ କରେ ହେବେ ଉଠିଲୋ, ବଲଲେ,—ପାଗଳ! ଘୁମ ଆସବେ ନା କୀ! ଇମ୍ବୁଲେ ବୈଷିର ଓପର ଦାଢ଼ିରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁମୁଇ, ଆର ଏ ତ' ଦିବ୍ୟ ମୋଲାହେମ ଏକଟି ଚୋଇର! କଲମ୍ବାସେର ମତୋ ସେ ଦେଶ-ଜରେ ବେରୁବେ, ତାକେ ଥାଲି ଗାରେ ଶୀତେର ରାତେ ଶୁକଳୋ କାଠର ଓପର ଶୁଲେଓ ବେହାନାନ ଦେଖାବେ ନା । ଥାମ, ତୋକେ ଆର ବକାବୋ ନା, ଘୁମୋ!

ବିନୋଦର ଏକଟିତେଇ ଘୁମ ଆସେ, କିମ୍ବୁ ଅନେକକଣ ଚୂପ କରେ' ଚୋଥ ବୁଝେ ଥେକେବେ କିଛିତେଇ ଆଜ ତାର ଘୁମ ଏଲୋ ନା । ଅଭୟରେ ସଙ୍ଗେଇ ଆରୋ ଖାନିକକଣ ଗଳ୍ପ କରା ଥାକ୍ । ଚୋଥ ନା ଘେଲେଇ ଡାକଲେ—ଅଭୟ!

ଅଭୟର କୋନ ସାଡା ନେଇ । ମେରଦିନେ ଚୋଟ ପେଯେଓ ଘୁମେର ତାର ଏକ ବିଲଦୁ ବ୍ୟାହାତ ହେବିନ । ଆବାର ଡାକଲେ,—ଅଭୟ!

ସେଇ ଅନ୍ଧକାର କାଲୋ ରାତି, ଆର ସେଇ ଥିଲ୍-ଥିଲ୍ ନିଃଶବ୍ଦତା!

ବିନୋଦ ଲାଫିରେ ଉଠେ ବସଲୋ । ସବେ କେଉ ନେଇ! ମ୍ୟାପେର ଖାତାଟା ମେବେର ଉପରେ ଉଲ୍ଟାନୋ, ଚୋରାରେ ଉପରେ ବାଲିଶଟା କୁଞ୍ଚକେ ପଡ଼େ' ଆହେ! ଦରଜାଟା ଥୋଲା ।

ବିନୋଦ ସବ ଛେଡ଼େ ସଦର ଦରଜାର କାହେ ଏଲୋ—ସଦର ଦରଜାଟାଓ ଦୁଃଖିକ । ଅଭୟ ଆବାର କଥନ ଦରଜା ଥିଲେ ବାହିରେ ବୈରିଯେ ଗେଛେ ।

ଦୁଃଖି ଛେଲେ ତାକେ ତର ଦେଖାବାର ନତୁନ ଫଳି କରେଛେ ବୁଝି! କିମ୍ବୁ ବିନୋଦ ଦମବାର ପାତ୍ର ନାହିଁ । ଗରମ କୋଟା ଗାୟେ ଦିଯେ ସେ ରାଜତାୟ ନାମଲୋ । କୋଥାଓ ଏକଟା ଜନପ୍ରାଣୀ ନେଇ, ନିଜେର ଦ୍ୱାତ ଓ ସଶକ୍ତ ନିଃଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ାନ ଛାଡ଼ା ଏକଟା ସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତି କୋଥାଓ ଶୁଣନ୍ତେ ପାଛେ ନା ।

ଆବାର ସେ ଡାକଲେ,—ଅଭୟ!

ମହାର୍ତ୍ତ-ଯଥେ ତାର ଥୁବ କାହେ ଥିଲ୍-ଥିଲ୍ କରେ, କେ ଥୁବ ଜୋରେ ହେବେ ଉଠିଲୋ

এবং সেই খন্দ-খন্দ হাসির ঢেউ মিলিয়ে ঢাখের সামনে ভেসে উঠলো অভয়।
বিনোদ বললে,—কোথায় গোছাল?

—বাঃ, এইখানে তোর পাশেই ত' দাঁড়িয়ে ছিলাম! ঘরের মধ্যে ভীষণ গরম—
অত গরমে কখনো ঘূঘ আসে!

গরম কি রে পাগলা? এই কন্কনে শীতের রাতে তোর গরম লাগছে?

অভয় হেসে বললে,—গরম বলে' গরম! চারিদিকে দাউ-দাউ করে আগন
জুলে উঠছে। টিকতে পাছি না! চল্, রাস্তায় একটু হাঁট!

বিনোদ ভাবলে, মন্দ নয়, বেড়াতে-বেড়াতে গল্পের ফাঁকে অভয়কে তাদের বাড়ির
দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে পূর্ণবাবুকে ডেকে তাঁর ছেলেকে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেবে।

বিনোদ বললে,—চল্, কিন্তু সদর দরজাটা যে খোলা থাকবে? দাঁড়া,
ভজ্জুয়াকে বলে' আসি বল্ব করে' দিতে! থাক-গে, ডাকতে গেলেই আমার মা টের
পাবেন। ভেজিয়েই আসি দরজাটা! খানিক বাদেই ত' ফিরে আসছি, কী বল?

অভয় বললে,—তোর ভাবনা কী! তোকে ত' আর বাপ-মা তাড়িয়ে দেয়ানি!
আমারই জন্য না হয় বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

দৃঃবন্ধু বড় রাস্তায় এসে পড়লো। কারূর মুখে কোনো কথা নেই! বিনোদ
ভয় পেরে বললে,—এবার ফের।

অভয় হেসে বললে,—কোথায়? এই ত' বেশ বাছি!

খানিক দূরে কয়েকজন লোক এদিকে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। একজনকে
বিনোদের ঘনে হল খালিকটা পূর্ণবাবুর মতো দেখতে। লোকজন নিয়ে ছেলের
খেঁজে বেরিয়েছেন নিশ্চয়! অভয়কে এবার স্বচ্ছলৈ ধরিয়ে দেওয়া যাবে। গায়ের
জোরে বিনোদের সঙ্গে কখনই এঁটে উঠবে না।

লোকগুলো না বেঁকে সামনে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে দেখে বিনোদ
ভরসা পেলো। অভয়কে বুঝতে না দিয়ে বললে,—হ্যাঁ, আরো একটু বেড়াই
আয়।

অভয় বললে,—কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। বাবা ঐ এসে পড়লেন। তোর কাছে
আমি সেই সাত আনা পয়সা ধারতুম না—সেই যে রেঞ্জিবেণ্টে খাইয়েছিলি? এই
নে, চট করে'—বলে, সে পকেট হাত-ডে কতকগুলো পয়সা বার করলে, বললে,—
গুণে নে, শীগ্‌গির! বাবা, মেজদা, ন'-কাকা, রাঘ খুড়ো—সব এসে পড়লেন যে!
দোর নয়, শীগ্‌গির তুলে নে পরসাগুলো আহাম্বক—বলে' পয়সা-ভরা হাত মেলে
অভয় কাঁপতে লাগল। এখনি সে যেন উন্ধর্ববাসে ছুটে পালাবে!

বিনোদ এরি জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত ছিল। গায়ের জোরে তার সঙ্গে তাদের
স্কুলের ছাত্র দূরের কথা, মাঝারাই পেরে ওঠেন না। সে তাড়াতাড়ি অভয়কে
দৃঃই শক্ত হাতে জাপটে ধৈরে বললে,—কিন্তু কোথায় তুই যাব? তোকে ধরিয়ে
দেব না আমি?

কিন্তু কোথায় অভয়? বিনোদ দৃঢ়াত দিয়ে নিজেরই বৃক্টা জোরে চেপে ধরে নিজের সঙ্গে অকারণ ধন্তাধ্যন্ত করছে।

অভয় কোথাও নেই। কখন ট্র্যু করে' সরে' পড়েছে! নিচয় এই পাশের গলি দিয়ে। এখনো ছুটলে তাকে ধরা যায়। দেখতে দেখতে পূর্ণবাবু দলবল নিয়ে কাছে এসে পড়লেন। বিনোদ তখন ফ্রটপাথে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

পূর্ণবাবুকে দেখে তার বুকে বল এল। সে এগিয়ে গিয়ে বললে, আপনারা অভয়কে ধূঁজতে বেরিয়েছেন ত?

পূর্ণবাবু তার দিকে ফ্লাক্ষ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

বিনোদ বললে,—সে এই গালি দিয়ে পালিয়েছে। আস্তুন আমার সঙ্গে। খুব জোরে ছুটলে এখনো তাকে ধরতে পারবেন। আমি তাকে জাপটে ধরেও রাখতে পারলুম না। খুব ঘ্যৎসুর পাঁচ শিখেছে যা হোক! আপনারা কেউ ও-দিক্ দিয়ে ঘূরে যান,—আমি এ-দিকে যাচ্ছি। ঐখানে কোথাও লুকিয়ে আছে নিচয়।

পূর্ণবাবু হঠাত তাকে বুকে জাঁড়িয়ে শিশুর মত ভেড়-ভেড় করে' কেঁদে উঠলেন, বললেন,—কৈ তোমার অভয়? ত্রু দেখ—বলে' চারজনের কাঁধে উভোলিত একটা খাটিয়ার পানে ইঙ্গিত করলেন।

বিনোদ কিছু বুরতে পারলে না। খাটিয়ার উপরে লম্বালম্বি কি একটা জিনিয় আগাগোড়া ঢাকা! কে একজন বললে,—আজ বিকেলে মোটর চাপা পড়ে' সে মারা গেছে—

বিনোদ সম্মত গায়ে একটা বাঁকুনি দিয়ে বললে,—মিথ্যা কথা। সে এতক্ষণ আমার সঙ্গে বসে' গল্প করলে, দুজনে বেড়াতে বেরোলুম—কেন আমায় মিছামিছ ডয় দেখাচ্ছেন? সে বললে,—আপনারা তাকে তাঁড়িয়ে দিয়েছেন, সে স্পেনে যাচ্ছে; সেখান থেকে জাহাজে করে' আমেরিকায়—কত কথা বললে! আমাকে পরসা দিতে চাইলে—গরদের পাঞ্জাবির উপরে ঘেরণার শাল—আস্তুন না আমার সঙ্গে এই গলিতে, তাকে বার করে' না দিই ত কী বলেছি—

পূর্ণবাবুরা এগোতে লাগলেন। বিনোদ হতভয়ের মত তেমনি দাঁড়িয়ে আছে! ব্যাপারটা সে স্পষ্ট করে, এখনো বুরতে পাচ্ছে না। সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে নাকি? নাত! রসা রোড, রাস্তার এক পারে ইলেক্ট্রিক ও অন্য পারে গ্যাস জরুরি—লাঠি-হাতে ঐ একটা কনষ্টেবল, দূরে ঐ পূর্ণবাবুদের দল চলেছে শয়শানে।

পূর্ণবাবু হেকে বললেন,—তুমি এবার বাঢ়ী যাও বিনু!

বিনোদ তবু নড়ে না। ভয়ে সে জয়ে গেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, পূর্ণবাবুরা কালীঘাটের দিকে ঘূরে গেলেই পাশের গলি থেকে অভয় বেরিয়ে

আসবে। অভয় আবার বেরিয়ে আসবে তাবতে বিনোদ হঠাতে আশ্রমৰে চেঁচিয়ে উঠলো।

কিন্তু আবার অমনি সেই খিলখিল হাসি! একেবারে তার কাছে—রাস্তার উপরে। কিন্তু অভয় কোথাও নেই! একটা ট্যাঙ্গ চলে যাচ্ছে মাঝ।

ট্যাঙ্গটা বিনোদ দাঢ়ি করালো। বাড়ি থেকে অনেক দূরে সে চলে' এসেছিলো, এখন পায়ে হেঁটে কিছুতেই সে যেতে পারবে না। পেছন থেকে অভয় এসে তার সঙ্গ নেবে; তার কাঁধে হাত রেখে গল্প করতে চাইবে, সাত আনা সে খেরেছিলো, এখনো সে ভোলেনি!

ট্যাঙ্গ চেপে বিনোদ বললে,—চালাও এলেনবি রোড।

কিন্তু কিছুদ্বাৰ থেকেই মনে হল ট্যাঙ্গটার আগে-আগে অভয়ও ছিটে চলেছে। কিছুতেই সে বিনোদকে ছেড়ে দেবে না। বিনোদ চেঁচিয়ে উঠলো,—খুব জোরে চালাও পাঁয়াজি।

শিখ ড্রাইভার গাড়ি খুব জোরে ছুটিয়েছে। অভয় ট্যাঙ্গির সঙ্গে সহানে চল্লতে পাৱছে না। হাত তুলে স্পষ্ট সে বললে,—আস্তে। কিন্তু ট্যাঙ্গ থাম্বল না, তার গায়ের উপর হৃত্তম্ভু করে পড়ল। বেচারা অভয় দলা পাঁকিয়ে চাকার তলায় চেপ্টে গেল!

বিনোদ চোখ বন্ধ করে' কক্ষণ গলায় চীৎকার করে' উঠল,—গেল, গেল,—বাঁধো গাড়ি, বাঁধো শীগ্রগিৰ বলাছি।

ড্রাইভার কিছু ব্যবতে না পেরে গাড়ি থামিয়ে বললে,—ক্যা হুম্মা?

বিনোদ খুঁকে পড়ে গাড়ির তলাটা দেখতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য কোথাও একবিলদ্বাৰ রাস্ত নেই!

অভয় তাড়াতাড়ি উঠে এসে খিলখিল করে হেসে গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে,—ভয় কি, আমাৰ কিছুই হয়নি! খালি এই মেৰাদুন্ডটায় সামান্য একটু চোট লেগেছে। খুব হাওয়া থেতে বেরিয়েছিল যা হোক! আজ্ঞা, গৃহনাইট!

আৱ তাকে দেখা গেল না।



ଖୁଡ଼ା ଯାହାଶୟ

—ପ୍ରଭାତକୁମାର ଘେରୋପାଣ୍ୟାମ

ପ୍ରଥମ ପରିଚେଦ

ଶରତେର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉତ୍ତରୀଂଶ୍ୟାର । ବଡ଼ଘରେର ବାରାନ୍ଦାୟ ଘାସର ପାତଙ୍ଗୀ ବିସର୍ଗ ଗଗନ ଚକ୍ରବନ୍ତୀ ତାମାକ ଖାଇତେହେବ । ଘରେର ମଧ୍ୟେ ତାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋଷ୍ଟ ଭାତାଟି ପରୀଢ଼ିତ, ଏଖାନ ଡାଙ୍କାର ଆସିବାର କଥା ଆଛେ ।

ଇହାରା ଦୁଇ ଭାଇ, ନବୀନ ଓ ଗଗନ । ଗାଁଯାଟି ନୈହାଟିର ନିକଟେ ଚଲୁଦେବପୂର । ଇହାରା ଏଖାନକାର ମଧ୍ୟବିଷ୍ଟ ଗ୍ରହି, କିମ୍ବୁ ଶଦ୍ଵା ଯାଇ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନବୀନର ହାତେ ନଗଦ ଦଶ ହାଜାର ଟିକା ଆଛେ । କେହ ବଲେ, ଇହା ବାଜେ ଗୁଜବ; କେହ ବଲେ, ଇହା ସତ୍ୟ କଥା; କିମ୍ବୁ କେହିଁ ସେ-ଟାକା ଯେ ଲୋହାର ସିଲ୍ଦ୍ରକୁଟିତେ ଆଛେ ଅଧିକ ନାହିଁ, ସେଇ ସିଲ୍ଦ୍ରକୁଟିମାତ୍ର ସକଳେ ଦେଖିଯାଇଛେ । ସେଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୟନକଙ୍କେ ଅବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଦେଇ ସେଇ ଘରେ ଥାରିଯା ସିଲ୍ଦ୍ରକୁଟି ଆଗଲାଇୟା ଥାରିକିତେନ । ତାହାର ପ୍ରତି ନବକୁମାର ପଞ୍ଚମେ ଚାକିର କରେ, ମେ ଅନେକବାର ପିତାକେ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମକ୍ଷତାନେ ଲାଇୟା ଥାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଇଛେ, କିମ୍ବୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଥନେ ଯାନ ନାହିଁ । ସକଳେ ବଲେ, ତିରି ସିଲ୍ଦ୍ରକୁଟି ଫେଲିଯା ଥାଇତେ ପାରେନ ନା ।

ଗଗନ ଚକ୍ରବନ୍ତୀ ବିସର୍ଗ ନୀରବେ ତାମାକ ଖାଇତେ ଲାଗିଲେନ । ତମେ ଡାଙ୍କାର-ବାବୁର ଲଞ୍ଠନେର ଆଲୋ ଉଠାନେ ପାଇଁଲ । ଡାଙ୍କାରବାବୁ ଆସିଯା ବାରାନ୍ଦାର ନିମ୍ନେ ଦାଢ଼ାଇୟା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ—“ଚକ୍ରବନ୍ତୀ ମଶାଇ ! ଥବର କି ?”

ଚକ୍ରବନ୍ତୀ ହଙ୍କାଟି ନାମାଇଯା ବଲିଲେନ—“ଡାଙ୍ଗାରବାବୁ? ଏସ, ଥବର ଭାଲ। ଏଥନେ ବେହୁଁ’ସ ର଱େଛେ—ବଞ୍ଚ ଜରଟା ର଱େଛେ କି ନା! କିନ୍ତୁ ନାଡ଼ୀ ବେଶ ଚଲିଛେ ଏଥନେ! ଉଠେ ଏସେ—ଏକବାର ଦେଖ ନା!”

ଡାଙ୍ଗାରବାବୁ ଉଠିଯା ଆସିଲେନ। ଚକ୍ରବନ୍ତୀ ହଙ୍କାଟି ସଥରେ ଦେଓଯାଲେ ଟେସ୍ ଦିଯା ରାଁଧିଯା, ଦ୍ୱାର ଖୁଲିଯା ରୋଗୀର କକେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେନ। ପିଲସ୍କୁଜେର ଉପର ଏକଟି ଘାଟିର ପ୍ରଦୀପ ଲ୍ଲାନଭାବେ ଝରିଲିଛି। ଏକଥାନ ଲଞ୍ଚା ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶ୍ଵରର ଉପର ମଳିନ ଶୟାୟ ଶଯନ କରିଯା ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀ ନିଦ୍ରା ଯାଇତେଛେ। ତାହାର ପଦତଳେ ବର୍ଷାଯା ତାହାର ପ୍ରତିବଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ପାଯେ ହାତ ବ୍ଲେଇତେଛେ।

ଇହାଦେର ପ୍ରବେଶ କରିତେ ଦେଖିଯା ସାବିତ୍ରୀ ଘୋଟା ଟାନିଯା ଦିଲ। ଗଗନ ଚକ୍ରବନ୍ତୀ ପ୍ରଦୀପଟା ଏକଟ୍ ଉଭ୍ୟରୁଳ କରିଯା ଦିଲେନ। ଡାଙ୍ଗାର ବୃଦ୍ଧର ନାଡ଼ୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେନ, —ଥର୍ମେରିଟାର ଦିଯା ଉକ୍ତତା ଲାଇଲେନ। ପରୀକ୍ଷାକୁନ୍ତେ ବଲିଲେନ—“ଏଥନେ ଥିବ ଜର। ମେ ଫିବାର-ମିକ୍ରଚାରଟା ଖାଓଯାନ ହଛେ?”

ସାବିତ୍ରୀ ଘୋଟାବ୍ରତ ମୁକ୍ତ କରିଲାନ କରିଯା ଜାନାଇଲ—ହାଇତେଛେ।

ଡାଙ୍ଗାର ବଲିଲେନ—“ଆଜ ସାରାରାତ୍ରି ଓଟା ଦେଓଯା ହୋକ୍। ଭୋରେ ଦିକେ ରିଯିଶନ୍ ଥବାର ମୂଳବନା!”

ବଲିଯା ଡାଙ୍ଗାରବାବୁ ବାହିରେ ଆସିଲେନ। ଗଗନଚନ୍ଦ୍ର ତାହାର ସହିତ ଦରଜା ଅବଧି ଯାଇଲେନ।

ଡାଙ୍ଗାରବାବୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ—“ନବୁକେ ଥବର ଦିଲେଛେଲା?”

“ନାଃ, ହିନ୍ଦିନି! କିଛି ତାବନା ନେଇ, ଦାଦା ଭାଲ ହେଁ ଉଠିବେନ। ଓରକମ ତ ହୟଇ ଓର ମାଝେ ମାଝେ। ନବୁକେ ଥବର ଦିଲେଇ ଏଥନେ ଖରଚପତ୍ର କରେ ବାଢ଼ୀ ଆସିବେ ତାଇ ଥବର ଦିଇନି!”

ଡାଙ୍ଗାରବାବୁ ବଲିଲେନ—“ଗାତିକ ବଡ ଭାଲ ବୋଧ ହଛେ ନା କିନ୍ତୁ। ଆଜ ପାଂଚ-ପାଁଚ ଦିନ ଜରଟା ଛାଡ଼ିଲ ନା, ଭାରି ଦ୍ୱରବଳ ହେଁ ପଡ଼େଛେନ। ଜରି ଛାଡ଼ିବାର ମହି ସାମଲାତେ ପାରିଲେ ହୟ!”

ଗଗନ ବଲିଲେନ—“ଆରେ, ନା ନା। ଆମ ଏତକାଳ ଦେଖିଛି। କିଛି ଭୟ ନେଇ!”

“ଦେଖା ଯାକ୍। ଅନେକ ବଯସ ହେଁଛେ କିନା, ତାଇ ଭୟ ହୟ!” ବଲିଯା ଡାଙ୍ଗାରବାବୁ ମଧ୍ୟମତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପେ ପ୍ରମଥାନ କରିଲେନ।

ଡାଙ୍ଗାରବାବୁର କଥାଇ ସତ୍ୟ ହିଲ—ଭୋରବେଲାଯା ପ୍ରାଣପାଖୀ ବୃଦ୍ଧର ଦେହପଞ୍ଜର ଛାଡ଼ିଯା ଗେଲ। ମଧ୍ୟର ପରେର ଦ୍ୱାରୀ ଏକ ମିନିଟେ ଜନ୍ମ ମାତ୍ର ତାହାର ଚେତନା ହିୟାଛିଲ। ତଥାନ ତିନି ଶ୍ରୀଦ୍ଵାରା ବଲିଯାଛିଲେ—“ନବୁ—ନବୁ ଏସେଛେ?”

ବାଢ଼ୀତେ କ୍ରମନେର ରୋଲ ଉଠିଲେ, ପାଡ଼ାର ଲୋକ ଦ୍ୱାଇଟି-ଏକଟି କରିଯା ଆସିଯା ମମବେତ ହାଇତେ ଲାଗିଲ। ସକଳେଇ ବଲିଲ—“ତା ବେଶ ଗେହେନ, ଥିବ ଗେହେନ। ବଯସ ହେଁଛିଲ—ତୋମାଦେର ସବ ରେଖେ ଗେହେନ,—ଏ ତ ଓର ସୌଭାଗ୍ୟ। ତବେ ନବୁ କାହେ ଥାକଲେ ଭାଲ ହାତ!”

সৎকারের সমস্ত আমোজন হইতে লাগিল। সেখানে সত্যচরণ নামে একটি ষষ্ঠবক দাঁড়াইয়াছিল—সে নবকুমারের একজন বিশেষ বন্ধু। তাহার হাতটি ধরিয়া গগনচন্দ্ৰ বলিলেন—“তুঁৰ যাবা গিয়ে, নবকে একধানি টেলিগ্রাম করে দাও; আমার আর হাত পা সরছে না।”

সত্যচরণ বলিল,—“আজ্ঞা, আমি আপিস যাবার সময় ষেশন থেকে টেলিগ্রাম করে দেব এখন।” সত্যচরণ কলিকাতায় চার্কার করে—ৱোজ নয়টাৱ ট্রেপে আপিস যায়।

চিত্তীৰ পরিছেদ

সেদিনটি শোকের মধ্যে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে সকলে দৃঢ়ধার্দি পান কৰিয়া সকালে সকালে শয়ন কৰিল। গগনচন্দ্ৰ বিপৰীক। তিনি একঘরে শয়ন কৰিয়াছিলেন। অনেক রাত হইল,—গ্রহের কুণ্ডাপ আৱ কেৱ সাড়াশব্দ নাই—কেবল গগনচন্দ্ৰ তাঁহার শয্যায় এপাশ ওপাশ কৰিতেছেন। শোকটা ইঁহারই সবৰ্বাপেক্ষা অধিক লাগিয়াছে বৰ্বৰ? ইহা শোক, না আতঙ্ক?—দুইটি নিকট সম্পর্কীয় বন্ধের মধ্যে একটি মৰিলে, অপৰাটিৰ সহজেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়,—তাহার মনে হয়, এইবাবে ত আমৰ পালা আসিল।

যাহা হউক, তথে রাত্রি গভীৰ হইল। গগনচন্দ্ৰ তখন ধীৰে ধীৰে শয্যাত্যাগ কৰিয়া উঠিলেন। অন্ধকারে অতি সম্পৰ্কে নিজেৰ ঘৰেৱ খিলাটি খুলিয়া, নম-পদে বাহিৰে আসিয়া দড়ায়মান হইলেন। জমাট অন্ধকার,—তাহার উপৰ আকাশে মেৰ কৰিয়াছে। ঘাটেৰ প্রান্তে শুগাল একটা ডাকিয়া উঠিল। গগনচন্দ্ৰ ক্ষণকাল নিস্তুৰভাবে দাঁড়াইয়া ধাকিয়া ধীৰে বড়-ঘৰেৱ বারান্দার দিকে অগ্রসৱ হইলেন। যে ঘৰে গতৱাবে বন্ধেৰ মত্ত্য হইয়াছে,—সে-ঘৰটি আজ তালাবেশ। গগনচন্দ্ৰ নিঃশব্দে তালাটা খুলিয়া সেই অন্ধকার ঘৰে প্ৰবেশ কৰিলেন। ভয়ে তাঁহার বৃক্ষটা দূৰদূৰ কৰিয়া উঠিল। হায় ভ্ৰাতৃস্মেহ! এত রাতে নিদাহীনচক্ষে ভাতা বৰ্বৰ ভ্রাতাৰ মৃত্যুশয্যাটি একবাবে দোখিবাৰ জন্য ও অশ্রুপাত কৰিবাৰ জন্য আসিয়াছেন!

গগনচন্দ্ৰ প্ৰবৰ্বৎ সাবধানভাৱে সহিত ঘৰেৱ দৃঃয়াৱটি প্ৰথমে বন্ধ কৰিয়া দিয়া একটি দিয়াশলাই জৰালিলেন। প্ৰদীপটি জৰালিয়া, প্ৰবৰ্বৰ্কীথিত লোহার সিল্ককাটিৰ নিকট অগ্রসৱ হইলেন। সিল্ককাটিৰ উপৰ হইতে একটি ভাণ্গা কাটেৰ হাতবাক্ষ, একধানি ছিম মহাভাৱত ও কয়েকটি খালি শুষধৰেৱ শিশি নামাইয়া, সিল্ক খুলিয়া ফেলিলেন। কয়েকটি কাপড়েৰ পৃষ্ঠালি তাহা হইতে নামাইবাৰ পৰ, নৌচৰে দিক্ হইতে প্ৰাৱতন লাল চেলী-বীধা একটি ছোট পৃষ্ঠালি বাহিৰ হইল। সেইটি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে তাড়াবন্দী অনেক মোট রহিয়াছে। তাহা দোখিবা-

মাত্র সেই ক্ষীণালোকে সেই অভ্যুক্তক্ষে গগনচন্দ্রের মসীকৃত মৃথমণ্ডলে শূন্ত-পংক্তির ছটা ক্ষণকালের জন্য উন্ভাসিত হইয়া উঠিল।

স্বরিতহস্তে অন্য প্ৰটুলিগুলি যথাস্থানে প্ৰসংস্কৰ্ষিবল্ল কৰিয়া গগনচন্দ্র সিল্পকৃটি বন্ধ কৰিয়া ফেলিলেন। মহাভারত, ভাণ্ডা বাঙ্গ ও ঔষধের শিখিগুলি তাহার উপর প্ৰবৰ্বৎ সাজাইয়া রাখিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া, দূয়াৱে তালা বন্ধ কৰিয়া, নিজ শয্যাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দূয়াৱাটি বন্ধ কৰিয়া, প্রদীপ জৰালিয়া, গগনচন্দ্র শব্দ্যার উপর উপবেশন কৰিলেন। বালিশের নিল্লে তাঁহার চশমার খোলাটি ছিল। চশমাটি চক্ষে লাগাইয়া নোটেৰ তাড়াগুলি নিৰীক্ষণ কৰিতে লাগিলেন।—কেবল দশটাকাৰ নোট—একখানিও নম্বৰৱওয়াৰি নোট তাহাতে ছিল না। একটি তাড়া খুলিয়া নোটগুলি সাবধানে গণনা কৰিয়া দোখলেন,—একশানিও আছে—হাজাৰ টাকা। প্ৰত্যোক তাড়াটি খুলিয়া একে একে গণনা কৰিলেন,—প্ৰত্যোকটিতেই হাজাৰ টাকা কৰিয়া। এৱং পুনৰ্শাটি তাড়া ছিল—দশ হাজাৰ টাকা।

একবাৰ গণিয়া তৃণ্টি হইল না,—গগনচন্দ্র নোটগুলি বারংবাৰ গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। এৱং কৰিতে কৰিতে ভোৱ হইয়া পাঢ়ল। তখন তিনি প্ৰটুলিটি নিজেৰ সিল্পকে বন্ধ কৰিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া, ঘৰেৱ বাহিৰে আসিলেন।

দুই-একটা কাক ডাকিতে আৱশ্যক কৰিয়াছে—অল্প অল্প আলো হইয়াছে। গাড়ুটা হাতে কৰিয়া বাটীৰ বাহিৰ হইয়া, আমবাগানেৰ ভিতৰ দিয়া গগনচন্দ্র প্ৰকৰিণীৰ তীৰে উপস্থিত হইলেন। তখনও কোথাও জনমন্তব্যেৰ দেখা নাই। প্ৰথমেই গগনচন্দ্র দাদাৰ লোহার সিল্পকেৰ চাৰিটি ছুড়িয়া প্ৰকৰিণীৰ মধ্যস্থানে নিক্ষেপ কৰিলেন। তাহার পৱ হস্ত-মৃৎ প্ৰকা঳ন কৰিয়া গাড়ুতে জল ভাৰিয়া, ধীৰে ধীৰে বাড়ী ফিরিয়া আসিলৈন।

তৃতীয় পৰিচেছদ

এই দিন বেলা নয়টাৰ সময় প্ৰবাস হইতে সদা-পিতৃহীন নবকুমাৰ বাটী আসিয়া পৌঁছল। সে ইতিমধোই নিজেৰ সাধাৱণ বেশ পৰিত্যাগ কৰিয়া, কাচা পৰিয়াছে, পদ নগ্ন কৰিয়া আসিয়াছে।

নবকুমাৰেৰ বাড়ী পৌঁছিবাৰ সঙ্গে-সঙ্গে আৱ একবাৰ কুলনেৰ ধৰ্মনি উঠিল। তাহা শ্ৰীনিৱাস প্ৰতিবেশীৰা আসিয়া সাম্প্ৰদা দিতে লাগিল। সকলে বলিল—“নবকুমাৰ কেন্দ না বাবা, চুপ কৰ। বাপ-মা কি আৱ চিৰদিন থাকে? এই তোমাৰ খুড়া অশায় বৱেছেন, ইনিই এখন তোমাৰ বাপ হ'লেন। চুপ কৰ বাবা!”

প্ৰতিবেশীৰা গ্ৰহণ্য কৰিবাৰ সময় পৰম্পৰেৰ মধ্যে বলাৰ্থলি কৰিতে লাগিল

—“আহা, গগন চক্ৰবৰ্ণী বুড়োৱ চেহারাটি কি হয়ে গেছে দেখেছ একদিনে! তোখ-টোক সব একেবাবে বসে গেছে!”

একজন বালিল—“আহা, ভাইয়ের শোকটা বস্ত লেগেছে বাম্বুনের!”—চক্ৰ বসার আসল কারণ বৈ, সারারাঠি জাগৱণ ও মনের অঙ্গনে শয়তানের তাঙ্ডবন্ডা, তাহা কেহই অনুমান কৰিতে পারিল না।

থথাসময়ে নবকুমার খৃঢ়া মহাশয়ের সহিত বসিয়া হৰিষ্যাম তোজন কৰিল। ভোজনাত্তে গগনচন্দ্ৰ মাদুৱ পাতিয়া বাসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন, নবকুমার তাহার কাছে বসিয়া ছিল। খৃঢ়া মহাশয় বালিলেন—“গ্ৰাম্যশান্তিৰ ত আয়োজন এইবেলা থেকে কৰতে হবে। টাকা-কড়ি কিছু এনেছ?”

নবকুমার বালিল—“টাকা-কড়ি আমি কোথায় পাব? বাবাৰ সিল্ক থেকে কিছু বেৱুতে পাবে বোধ হয়!”

“তা দেখ—বাদি কিছু থাকে!”

“চাৰিটা?”

“চাৰি? চাৰি কোথায়, তা ত বলতে পারিনে। হয় ত বউমাকে দিয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা কৰ দোখি?”

নবকুমার গিয়া সার্বিত্তীকে জিজ্ঞাসা কৰিল—সার্বিত্তী বালিল—“আমাকে ত দিয়ে যাননি। শেষ পৰ্যালত তাঁৰ কোমৰেৰ ঘন্সিতে ছিল দেখোৰি। খৃঢ়া মহাশয় হয় ত খুলে নিয়ে থাক্ৰেন।”

“না—তিনি ত বলিলেন—চাৰি কোথায়, কিছুই জানেন না।”

নবকুমার ফিরিয়া আসিয়া খৃঢ়ামহাশয়কে এই কথা বালিল। তিনি বালিলেন—“তাঁৰ কোমৰে ছিল? তা ত লঙ্ঘ কৰিনি। তবে হয়ত তাঁৰ চিতায় উঠেছে!”

নবকুমার একটু বিৱৰণি সঙ্গে বালিল—“ওঠা আপীল লঙ্ঘ কৰলেন না?”

খৃঢ়া মহাশয় হৰ্কা নামাইয়া কাঁদকাঁদ স্বৰে বালিলেন—“আৱে বাবা, সে সময় কি আমাৰ চাৰি, সিল্ক, টাকা-কড়ি ভাববাৰ হত মনেৰ অবস্থা ছিল? সে সব তোমৰা পাব।”

নবকুমার কিয়ৎক্ষণ নীৰবে রহিল। খৃঢ়া মহাশয় ধূমপান কৰিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে নবকুমার বালিল—“তবে এখন উপায়?”

“উপায় আৰ কি? কামাৰ ডাকিয়ে সিল্ক খোলাতে হবে।”

কামাৰ ডাকাইয়া সিল্ক খোলান হইল। তাহা হইতে কেবল গুটিগুশেক নগদ টাকা আৰ নবকুমারেৰ পৰলোকগতা জননীৰ খানকয়েক সোনার পুৱাৰতন অলঙ্কাৰ বাহিৰ হইল।

ইহা দেখিয়া নবকুমার ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল! তাহারও বৰাবৰ মনে ধাৰণা ছিল যে, তাহার পিতাৰ সিল্ককে নগদ দশ হাজাৰ টাকা আছে। তাহাৰ

মনে বিশ্বাস হইল, খুড়া মহাশয়ই সে টাকা সরাইয়াছেন। অথচ তাহার সাক্ষী-সাব্দ কিছুই নাই!

খোলা সিন্দুকের সম্মুখে নবকুমার বাসিয়া ভাবিতেছিল, এমন সময় খুড়া-মহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কিছু পেলে?”

সিন্দুক হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, নবকুমার তাহা দেখাইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল,—“দশ হাজার টাকা ছিল যে, কোথা গেল?”

গগনচন্দ্র আশৰ্থ হইয়া বলিলেন—“কত টাকা?”

“দশ হাজার!”

খুড়া মহাশয়ের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন—“দশ হাজার টাকা! পাগল! কোথা পাবেন তিনি?”

নবকুমার বলিল—“কেন, সকলে বলত, এই সিন্দুকে তাঁর দশ হাজার টাকা আছে!”

“সকলে ত সব জানে। কেন, দাদা ত সবর্দদাই বলতেন, তাঁর এক পঁয়সাও নেই। তুই পশ্চিম থেকে যা টাকা-কড়ি পাঠাতে মাঝে মাঝে, তাই খরচপত্র করতেন, আর দু-পাঁচ টাকা জমিয়েছিলেন। হাঁ—দশ হাজার টাকা! দশ হাজার টাকা কি সাধারণ কথা রে বাবা!”

নবকুমার আর কি করিবে! নীরবে মনের সন্দেহ ও রাগ হজম করিয়া, যথা-সময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। অল্পদিন পরেই তাহার ছুটি ফ্ৰাইল,—ভগ্নহৃদয় লইয়া কম্ভেসানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এতদিন তাহার পিতার সেবা-শুভ্ৰাব জন্য শ্রীকে বাটীতে রাখিয়াছিল। এবার সার্বিহীকে সে পশ্চিমে লইয়া যাইয়া নিজের কাছে রাখিবে। শ্রীকে বলিয়া গেল—পূজাৰ ছুটি হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই; ইতিমধ্যে একটি বাড়ী ঠিক করিয়া, পূজাৰ সময় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে।

চূর্থ পরিচ্ছেদ

নবকুমার কলিকাতায় আসিল। পূজাতন গহনাগুলি বিক্রয় করিবে, কিছু কাপড়-চোপড়ও কিনিবার প্রয়োজন আছে। সারাদিন বউবাজারে ও বড়বাজারে ঘূরিয়া, আড়াইশত টাকায় গহনাগুলি বিক্রয় করিল। বড়বাজারে একটা কাপড়ের দোকানে বাসিয়া কিছু কাপড় খরিদ করিল। তাহার পকেটবুকে নোট ছিল, টাকা দিবার জন্য পকেটবুক বাহির করিতে যাইয়া দেখে, পকেটবুক নাই—গাঁটকাটার কখন চুরি করিয়াছে, জানিতে পারে নাই!

বিপদের উপর বিপদ! সেই পকেটবুকে তাহার রিটার্ন টিকিটখানি পর্যন্ত ছিল, আড়াইশত টাকার নোট ছিল—খানকতক পূজাতন চিঠিপত্র ছিল।

দোকানের কাপড় দোকানে রাখিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল। আজ

পাঞ্জাব-মেলে সে কম্পন্ধানে ফিরিবে ভাবিয়াছিল, এমন টাকা নাই যে ন্তৰন টিকটি কিনিয়া ফিরিয়া যায়।

ভাবিল, পরদিন সত্যচরণ আসিলে, আপিসে তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া কিছু টাকা ধার লইয়া যাইবে। দৃশ্যে ত্রিয়মাণ হইয়া কোন রকমে নবকুমার বাসায় রাশ্চিযাপন করিল।

প্রভাতে তখনও নবকুমার শব্দাত্যাগ করে নাই, -বাসার একটি মোটা বাবু একখানি সংবাদপত্র হাতে করিয়া আসিয়া বালিলেন—“নবকুমারবাবু, দেখুন, দ্রুত যা করেন, তা ভালুর জন্যই করেন। কাল যে আপনার পকেটবুক চুরি হয়েছিল, সেটা একটা খুব মঙ্গল বলতে হবে!”

নবকুমার আশ্চর্য হইয়া বালিল—“কেন, বাপারটা কি?”

শুধু-কলেবর শুবুকটি সংবাদপত্র হাতে পাঠ করিলেন—“গতরাতে পাঞ্জাবমেল আসানসোলের নিকট পেঁচাইলে একটা মালগাড়ীর সঙ্গে ভীষণ কালিশন হইয়া যায়। দুই-তিনখানি ঘাতীগাড়ী চৰ্গ হইয়াছে। ড্রাইভার অত্যন্ত আহত হইয়া হাসপাতালে আছে। ঘাতিগণের মধ্যে ছয়জন মৃত ও বাইশজন সাধারিতক রকম আহত। শুতের তাঙিকা—”

ম্বতের ভালিকার মধ্যে “নবকুমার চক্রবর্তী”র নামও পাওয়া গেল।

শুধু-বাবুটি বালিলেন—“কি রকম? আপনি মরেছেন না কি?”

নবকুমার বালিল—“বৌধ হয়, আমার নামের অন্য কেউ?”

শুবুকটি হাসিয়া বালিলেন—“আপনি নবকুমারের ভূত নন ত? কি জানি মশাই, বিশ্বাস নেই।”—বালিয়া বাবুটি চলিয়া গেলেন।

একথা শুনিয়া নবকুমারের মিস্টেকে দুঃ একটা কথার উদয় হইল। সে সকাল-সকাল আহার সারিয়া, সত্যচরণের নিকট টাকা ধার করিয়া আসানসোলে চালিয়া গেল।

সেখানে গিয়া পুলিশ আপিসে সম্মান লইল। জিজ্ঞাসা করিল—“একজন নবকুমার চক্রবর্তী ব'লে যে মরেছে—আপনারা তাঁর নাম জানলেন কি করে?”

দারোগা বালিল—“তার পকেটবুকটি বেরিয়েছে।”

নবকুমার দেখিল, তাহারই পকেটবুক—তাহাতে তাহার নোট, চিঠি, রিটার্ণ-টিকট, সবই রহিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই—সেই গাঁটকাটাই তবে মারা পড়িয়াছে! পাপের এরূপ হাতে হাতে প্রতিফল আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—“আপনি কে?”

“আমি নবকুমারের একজন বন্ধু।”

“লাসের কি হবে? অ্যাক্সিডেন্টের পর আমরা খবরের কাগজে টেলিগ্রাফ করেছি। লাসের আঘাতেরে এসে কেউ জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে ত করবে, নইলে আমরা প্ৰত্যেকে ফেলব।”

নবকুমার একবার ভাবিল—“পূর্ণতরাই ফেলুক। তাহার মন্তকে এই সময়ে একটা মৎস্যের পাকা হইয়া আসিতেছিল। ভাবিল, যদি সংবাদ পাইয়া খুড়া মহাশয় আসেন, ত লাস দেখিয়াই জানিতে পারিবেন, আমি নাই।”

দারোগার নিকট লাস জবলাইবার অনুমতি চাহিল। দারোগা বলিল—“আর এ টাকা-কর্ড? লাসের ওয়ারিশান্ কে?”

“লাসের এক স্তৰী আছে, খুড়া আছে। স্তৰী ওয়ারিশ। খুড়াকে খবর দিলে আসিয়া টাকা লইয়া যাইবে।”

দারোগা খুড়ার ঠিকানা নোট করিয়া লইল। লাস জবলাইয়া নবকুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। স্থল-বাবুটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি মশাই? খবর কি?”

নবকুমার গভীরভাবে বলিল—“গিয়ে দেখলাম,—আমি নই,—আর একজনই মরেছে বটে!”

বাবুটি বলিলেন—“তবু ভাল।”

পরদিন সত্যচরণের আপিসে গিয়া নবকুমার তাহার সঙ্গে দেখা করিল। শ্বনিল, যদি পল্লীগ্রামে দৈননিক কাগজ যাই না, তথাপি লোকমধ্যে বাটীর লোক তাহার মতৃসংবাদ পাইয়াছে। সত্যচরণের সঙ্গে অনেকক্ষণ গোপন-পরামর্শ করিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল।

পশ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাকাল, গগনচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। পাড়ার দুই-চারিজন ব্যক্তি বসিয়া আছেন। গতকল্য নবকুমারের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষের শ্রাদ্ধ ঘেনন ঘটা করিয়া হয়। যেকের শ্রাদ্ধ সেৱণ হয় না। গগনচন্দ্র আসানসোল হইতে নবকুমারের মে আড়াইশত টাকার নোট আনিয়াছিলেন,—তাহারই মধ্য হইতে কেবল পশ্চাশটি টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। বাকী দুই শত টাকা নবকুমারের বিধবাকে দিয়াছেন।

সার্বত্রী যখন সধাৰ ছিল, তখন সবৰ্গত তাহার যে একটা স্তৰাম ছিল—সংপ্রতি তাহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। যেদিন স্বামীৰ মতৃ-সংবাদ আসে, সেই দিনযাত্র সে অত্যন্ত কাদাকাটি করিয়াছিল। যাতে সত্যচরণের স্তৰী আসিয়া তাহাকে অনেক সামৰণ দিল। পরদিন হইতে সে ঘৃথখানি বিমৰ্শ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সদ্যোবিধবার যেৱণ হওয়া উচিত, তাহার কিছুই দেখা যায় না। প্রায় রোজই ম্বিপ্রহে সত্যচরণের স্তৰীৰ কাছে যায়। এ অবস্থায় এৱ্প করিয়া পাড়া-বেড়ানো কি তাহার উচিত? এৱ্প অস্বাভাবিক বালিবিধবা ত হিন্দুগ্রহে দেখা যায় না!

সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইঁকাটি নিরামিতরূপে পর্যাক্রমণ কৰিতে লাগিল।

এ সভাটি অদ্য প্রায় নীরব, কেবল মাঝে মাঝে কেহ বালিয়া উঠিতেছেন—“সংসার অনিত্য, সকলই মায়া!” কেহ কেহ বলিতেছেন,—“আহা, নবকুমার বড় ভাল ছেলে ছিল;—আজকালকার দিনে ওরকম প্রায় দেখা যায় না।”

একটু পরে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। ঘৃণ্ণন্ত পরে বাড়ীর ঢাকাৰ চিনিবাস হাঁপাইতে হাঁপাইতে গলদঘৰ্ষ হইয়া, দুই চক্ৰ কপালে তুলিয়া বৈষ্টকখনার ভিতরে প্রবেশ কৰিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শুধু দুইবার বালিল—“কর্তা—কর্তা!” তাহার মুখে আৱ কোন বাক্যনিঃসরণ হইল না—লোকটা সেইখনে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া, প্রচলিত উপায়ে তাহার মুখে জন দিয়া, তাহাকে পাখা কৰিয়া, ক্রমে তাহার চেতনা সম্পাদন কৰিলেন। ক্রমে লোকটা সুস্থ হইতে লাগিল। সকলে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন—“কি রে চিনিবাস, অঘন কৰিল কেন?”

চিনিবাস তখন ভয়ে শিহরিয়া বালিল—“রাম রাম রাম! ভূত গো কর্তা!”

উহার মধ্যে যে বৃক্ষ বাল্যকালে কিংশ্চ ইংরাজী পঁত্তিয়াছিলেন, তিনি বালিলেন—“দ্বৰ বেটা চাষা—ভূত কি! ভূত আছে না কি?”

চিনিবাস চক্ৰ কপালে তুলিয়া বালিল—“ভূত নাই? এ পুকুৱধাৰে বাঁশতলায় দেখ গে ঠাকুৱ!”

অনেক প্রশ্নাদির পৰি ক্রমে ক্রমে চিনিবাস বালিল, কিছু পূৰ্বে যখন সে পুকুৱে বাসন ঘাজিয়া ফিরিতেছিল, তখন সেই পুকুৱের ঈশানকোণে বাঁশৰাড়ের তলায় অল্পকারে দৈখিল—আগামদস্তক শাদা কাপড়ে ঢাকা একটা-কি বেড়াইতেছে! নিকটকবৰ্তী হইবামাত্র পদার্থটা কাছে আসিল। ঠিক নবকুমারের যত চেহারা—আৱ বালিল—“ঞে চিনে—এ’কবাৰ খড়ো মশায়কেঁ ডে’কে দিংতে পাঁৰিস?” তাহা শুনিবামাত্র চিনিবাস সমস্ত বাসন ও পাথৰবাটি সেখনে আছাড়িয়া ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

ইহা শুনিয়াই খড়ো মহাশয় রামনাম উচ্চারণ কৰিতে লাগিলেন; বালিলেন—“ঠিক দেখেছিস্?”

“ঠিক না ত কি বেঠিক দেখেছি কর্তা? ওৱে বাবা রে! আৱ আমি সম্ম্যাবেলায় বাসন মাজতে যাব না।”

পুৰোঙ্গ নাস্তিক-প্রকৃতিৰ বৃন্ধানটি বালিলেন—“চক্ৰবৰ্তী মশায়, এ কথা আপৰি বিশ্বাস কৰছেন? বেটা অসাধানে বাসনগুলো ভেঙে ফেলেছে, তাই এসে ঐ কথাটা ওজৱ কৰছে!”—কিন্তু বক্তাৰ হৃদয়ের ভিতৰটা গোপনে দ্বৰ-দ্বৰ কৰিতে লাগিল।

সে-সম্যা ত কাটিল। তাহার পৰ, তিন-চারি দিন ধৰিয়া পাড়াৰ ভদ্রলোকেৱা আসিয়া গগন চক্ৰবৰ্তীৰ নিকট সংবাদ দিলেন, কেহ দৌৰ্যৱ ধাৱে, কেহ ভাঙ্গা শিব-ঘৰ্সন্দৰেৱ নিকটে, কেহ অন্য কোথাও ‘নবকুমার’কে দেখিয়াছেন। পুৰোঙ্গ

নাস্তিক-ব্যৰ্থিটিকে আর সম্মার পর বাহির হইতে দেখা যায় না। অন্যান্য ব্যক্তিগুলি—“শাস্তি ত মিথ্যে হবার নয়! অপসাতে-গুটুটা ইল কিনা,—ও-রকম ত হবারই কথা! বছরটা পূর্বক, গয়ার গিয়ে প্রেতগুলোর একটা পিণ্ডি দিয়েই দিন, উপ্যার হয়ে যাবেন।”

একদিন সম্মার পর খুড়া মহাশয় প্রকৃতিগুরুর তীর হইতে ঘুঁথ ধুইয়া, জলভরা গাড়ুটি হাতে করিয়া আমবাগানের ভিতর দিয়া ফিরিতেছিলেন। সহসা এক শ্বেতবস্ত্র-পরিধিত মণ্ডি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মণ্ডিটি ছাড়া সমস্ত গাত্র বস্ত্রে আবৃত ছিল। আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র সে বালিল—“খুড়ো মশায়,—সে” দশ হাঁজার টাঁকা—”

আর শূন্যবাবুর পুরোবৰ্ষী খুড়া মহাশয় সেইখানে গাড়ি আছাড়িয়া ফেলিয়া “রাম রাম” শব্দ করিতে করিতে উপর্যুক্তসে দৌঁড়িয়া পলাইলেন।

পরদিন অমাবস্যা,—সম্মার পর খুড়া মহাশয় আর বাটীর বাহির হইলেন না। রাত্রি নয়টার সময় আহার করিয়া শয়ন করিলেন। যখন তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন—রাত্রি আল্পাজ বারোটার সহয়, গাত্রে কাহার শীতল হস্তপশ্চে খুড়া মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। খুড়া মহাশয় চম্কিয়া ঘুমের ঘোরে বালিলেন—“কে—ও?”

অধ্যকারের মধ্য হইতে শব্দ হইল—“আমি ন’বকুমার।”

শূন্যবামাত খুড়া মহাশয়ের ঘুমের ঘোর চট্ট করিয়া ছাঁড়িয়া গেল।

ভৃত বালিল—“সে” দশ হাঁজার টাঁকা আঁমার বাটকে যত্তিন না দিচ্ছ, তত্তিন রেঁজ আস্ব।”

বালিয়া নবকুমার চুপ করিল। খুড়া মহাশয়ের নিঃশ্বাস তখন ঘন ঘন বহিতে লাগিল। কুমে তাঁহার দাঁত ঠক্কাতক করিয়া ঘৃচ্ছা উপস্থিত হইল। নবকুমার তখন মেঝের উপর হইতে বরফ-বাঁধা পৃষ্ঠাবিন্দি তুলিয়া লইয়া, খোলা ভানালার কাছে গিয়া একটি গরাদে সরাইয়া, বাহির হইল। বাহিরে কিয়ন্ত্রে সত্ত্বচরণ অপেক্ষা করিতেছিল।

পরদিন সম্মাবেসা সত্ত্বচরণ আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবকুমারকে সংখাদ দিল—খুড়া মহাশয় তাহার ট্রেণেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন—সার্বিশ্বীর নামে দশ হাঁজার টাঁকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া আনিয়াছেন। সত্ত্বচরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“এ টাঁকা কোথা থেকে এল?” গগনচন্দ্ৰ বালিয়াছিলেন—“টাঁকাটা ছিল আমার দাদুর। সকলে ষে বলত, তাঁর দশ হাঁজার টাঁকা আছে—তা দেখছি মিথ্যা নয়। কিন্তু তাঁর লোহার সিলুক থেকে বেরোয় নি। কালকে রাত্রে হঠাতে তাঁর একটা পুরনো টিনের বাজ্জ খুলে দেৰিৰ, এক টুকুৱো লাল চেলিতে

মোড়া দশ হাজার টাকার নোট! দেখে আমার হৃরিয়ে বিষাদ উপস্থিত হ'ল অৱক! আহা, আজ যদি নবু বেঁচে থাকত! পিতৃধন! যা হোক, বিধবাটার উপায় হ'ল!"

ইহার পৰ নবকুমার কলিকাতায় গিয়া, খুড়া মহাশয়কে এক চিঠি লিখিল—সে শৰ্ণিয়া দণ্ডিত হইয়াছে বৈ, তাহার ম্তুর একটা গুজব উঠিয়াছে এবং শ্রাদ্ধশান্তিও হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক সে বাঁচৰা আছে এবং একটু কার্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিল। অঘৃৎ তারিখে সে বাড়ী আসিবে এবং একদিন থাকিয়া স্তৰীকে লইয়া পশ্চম-শান্তা কৰিবে।

নবকুমার বাটী আসিয়া শৰ্ণিল, খুড়া মহাশয় কি-একটা জরুরি কার্য উপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছেন। স্তৰীকে লইয়া সে পশ্চম চৰিয়া গেল।



গল্পের শেষে

—প্রেমেন্দু মিশ্র

বর্ষাকাল, সূত্রাং বংশট ত' হবেই। কিন্তু সারাদিন সমানে জল পড়ার পর রাস্তারেও তার এমন বিরাম হবে না জানলে, আমরা বোধ হয় সেই কলকাতা ছেড়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে ফট্টবল খেলার লোভে আসতাম না।

জায়গাটা যে এমন পাঞ্চব-বাঞ্জার্ত দেশ, তাই-বা কে জানত! ধৰের কাগজে নসীপুরের নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের নাম দেখে ভবেশ একটা এণ্ট্রি করে দিয়েছিল। ভবেশ আমাদের দি আন্বৈটন্‌ ইলেভেনের অতলত উৎসাহী কম্পঠি সেক্টোরী। খেলাটা ফট্টবল এবং এণ্ট্রি-ফি আট আনার নাঁচে থাকলে সে ঢাখ বৃজে একটা চিঠি ছেড়ে দেবেই—তা সে-খেলা যথানেই হোক না কেন! আন্বৈটন্‌ ইলেভেন্ তার ছামাসের পরমায়তে এ পর্যন্ত কাউকে পরামর্শ করতে পারেনি। সেদিক দিয়ে আমাদের রেকর্ড আন্বৈটন্‌ সতী। চাঁদা দেওয়া ও একবার করে ঘাঠে নামাই সার। কিন্তু ভবেশের উৎসাহ তাতে দমবার নয়।

গোড়ার দিকে কলকাতার একটু-আধটু নামকরা 'শিল্ড' বা 'কাপেই' নামতে গিয়ে আমাদের একটু অসুবিধা হয়েছে, এ কথা স্বীকার করা ভালো। দর্শকেরা আমাদের খেলায় উৎসাহিত হয়ে এমন হাততালি দিতে স্বীকৃত করেছে যে, খেলা শেষ হয়ে গেলেও তা থার্মেনি, অনেকে হাততালি দিতে দিতে আমাদের পেছনে বাঢ়ি পর্যন্ত এসেছে, এ আমার নিজের চক্ষে দেখা। আমরা হেরে গেলেও থেব খারাপ খেলি না। কিন্তু ভাল খেললেও এতটা আমাদের নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করা ঠিক বরদাস্ত

করতে পারছিলাম না। শেষের দিকে তাই কলকাতা ছাড়িয়ে মফস্বলের শহর এবং মফস্বলের শহর ছাড়িয়ে পাড়াগাঁওয়ের দিকে আমাদের দুর্বাক একটু বেশী হয়েছে।

কিন্তু পাড়াগাঁওয়েও একটা সীমা আছে—নসীপুর তার বাইরে। নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের কর্মসূক্তারা আমাদের চাঁদা পেয়ে খুশী হয়ে জানিবেছিলেন বে, ষেশন থেকে এক-পা গেলেই তাঁদের ক্রাব বা খেলার মাঠ। আমাদের কোন কঢ়ই হবে না। ষেশনে তাঁরা লোকও রাখবেন। ‘লোক’ বলতে ষেশন-মাস্টার ও ‘এক-পা’ বলতে ঘটোৎকচের পা, সেটুকু তাঁর উহু রেখেছিলেন।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভেতর তিনটেনাগাদ প্যাসেজার ট্রেণে গিয়ে বখন নসীপুরে নামলাম, তখন প্রথমে ত মনে হল, গাড়ি বোধ হয় সিগন্যাল না পেয়ে মাঠের থাকে থামাতে আমরা ভুল করে নেবে পড়েছি। এ আবার ষেশন নাকি! প্ল্যাটফর্ম না থাক, মাটিতে থানিকটা লাল কাঁকরও ত বিছানো থাকে।

হড়মড় করে আবার ট্রেণে উঠে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় উদয় খবর পর্যবেক্ষণ করে বলে—‘না রে, ষেশনই বটে, দেখিছি, না দ্ৰ-একটা কাঁকর পড়ে রয়েছে! বাকী সব জলে ধূয়ে গেছে!’

কাঁকর দেখে আশঙ্কত হয়ে সামনে চাইলাম। বৃষ্টির ভেতর দূরে যেন একটা ভাঙা গাছও দেখা গেল। গাছ নয়, সেটা ষেশনের নাম-লেখা সাইন-পোষ্ট। বৃষ্টিতে নাচীর মাটি আলগা হয়ে একটু হেলে পড়েছে। সাইন-পোষ্টের পর দূরে একটা ঘর এবং তার ভেতরে একজন ষেশন-মাস্টার টিচ্কিট-কালেক্টরকেও পাওয়া গেল। তাঁর হাতে রিটার্ণ টিচ্কিটের অঙ্গৰেক দিয়ে রাস্তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি একটা কাটা খাল দেখিয়ে দিলেন মনে হ'ল।

“ওটা যে খাল মশাই, যাব কি করে নৌকা না হলৈ?”

ষেশন-মাস্টার বৃষ্টিয়ে দিলেন—খাল নয়, ওটাই রাস্তা, বৃষ্টিতে ওই অবস্থা হয়েছে। শুনলাম, সেই রাস্তা সাঁৎৱে ও কাদা ঠেলে ক্রোশ দ্ৰ-এক গেলে নসীপুর গ্রাম পাওয়া যাবে, যদি না বন্যায় সেটা ভেসে গিয়ে থাকে।

দলের অধিকাংশ লোক তৎক্ষণাত থেকেই বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে বাকুল দেখা গেল, কিন্তু ভবেশ ছাড়াবার পাত্র নয়। নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডটা না নিয়ে বেন সে এখান থেকে বাড়ি ফিরবে না! কোনমতই সকলকে বোবাতে না পেরে সে চৰম যুক্ত প্ৰয়োগ কৰলৈ। বাড়ি ত ফিরবে, কিন্তু যাবে কি হ'লে? সতীহই ত! খৈজ নিয়ে জানা গেল, রাস্তুর আট্টার আগে কোন ট্রেণ এই ঘাটে আৱ থামছে না। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে আমাদের ভবেশের কথাতেই রাজি হ'তে হ'ল।

নসীপুরে কেমন করে পেঁচোলাম ও সেখানে জলে জলময় ঘাটে ওয়াটার-পোলো ও রাগ্বিৰ মাঝামাঝি কি-ধৰনের ফ্র্টবল খেলা হ'ল, তাৰ আৱ বৰ্ণনায় কাজ নেই। নসীপুর আগমনের এই ভূমিকাটুকু সেৱে আসল কথায় এবাৱ নামা যাক।

এগাৰজন মিলে খেলতে এসেছিলাম। খেলা-ধূলার নয়, খেলা কাদার পৰ,

নসীপুর গ্রামের অবস্থা ও শিল্পের কর্মকর্তাদের আতিথেয়তার নমুনা দেখে ছ'জন কিছুতেই আর থাকতে রাজী হ'ল না। বৃষ্টির ভেতর খাল বা রাস্তা সঁওয়েই তারা দেশনে ফিরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ও খেলায় কয়েকটা অর্তিরিক্ত গোল খেয়ে আমরা একটু বেশী কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এর ভেতর বসন্তর আবার একটু জরু-ভাবও দেখা দিয়েছে। জরু ইওয়াটা আশ্চর্য নয়। কারণ ধারাটা তার ওপর দিয়েই একটু বেশী গেছে। সেই ছিল গোল-কৌপার! জরু অবস্থায় বসন্তকে এই জলের ভেতর ত যেতে দেওয়া যায় না! বসন্তর সঙ্গে ভবেশ, আমি, উদয় ও সূর্যেন—এই চারজন রাত্তির মত নসীপুরেই কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম।

ঠিক করলাম, কিন্তু থাক্ব কোথায়? নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্পের কর্তা নগেনবাবু, স্বয়ং আমাদের নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করলেন। নগেন্দ্র মেমোরিয়ালের কর্তা নগেনবাবু, স্বয়ং—শুনে একটু অবাক, অনেকে হবে সন্দেহ নেই, আমরাও হয়েছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নগেনবাবু, নিজের নামটা বেঁচে থাকতে থাকতেই শ্বরণীয় করে রেখে যেতে চান। পরে কে কি করবে, বলা ত যায় না! শিল্ড তৈরীর খরচ যখন তিনিই দিয়েছেন, তখন মেমোরিয়ালটা দুদিন আগে থাকতে হলে কার কি বলবার আছে! যাই হোক, নগেনবাবু, আমাদের নিয়ে একটু-আধটু ঘোরাফেরা করেও স্বীক্ষিত একটা থাকবার জায়গা থুঁজে পেলেন না। তাঁর নিজের বাড়তে আস্ত্রয়নস্বজন আসার স্থানাভাব। পাড়ার অপর বাড়তে আতিথেয়তার আদর্শ একটু নীচু বলেই মনে হল। নসীপুরে আরও একটি পাড়া আছে; কিন্তু তাদের ওখানে শুনলাম, ‘তজমোহন কাপ’ বলে আর একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলা হয়। নগেন্দ্র মেমোরিয়ালের সঙ্গে তাদের আদা এবং কাঁচকলার মত মধুর সম্পর্ক। এখানকার খেলুড়েদের তারা স্থান কিছুতেই দেবে না।

আশ্রয় পাওয়া সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, এমন সবয় উদয়ের বৃক্ষিতে একটা সুরাহা হয়ে গেল। গ্রামের একটিমাত্র চলান-সই রাস্তায় বার-কয়েক আসায়াওয়া করতে গিয়ে একটিমাত্র পাকা দোতলা বাড়ি সকলেরই চোখে পড়েছে! একটু ভগ্নদশা! কিন্তু আমাদের দশা ত তার চেয়েও খারাপ!

উদয় হঠাতে বলে ফেঁসে—“এ বাড়িটার খৈঁজ ত করেননি মশাই! ওদেরও একটা শিল্ড বা কাপ আছে নাকি?”

নগেনবাবু হন্ন হন্ন করে হাঁটিতে হাঁটিতে বলেন—“না, না মশাই, ও-বাড়ির দিকে তাকাবেন না!”

তাঁকে একরকম জোর করে থামিয়ে বল্লাম—“কেন মশাই, দোষটা কিসের! একজন বিদেশী লোক জরুরে পড়েছে শুনলেও এই বৃষ্টি-বাদলার রাতে আশ্রয় দেবে না এমন চামার কেউ আছে নাকি!”

নগেনবাবু একটু রেগেই বলেন—“আরে না মশাই! গ্রেট বেঙ্গল স্পোর্ট্ৰ

বারো গোল খেয়েছিল; তাদেরই ওখানে থাকতে দিইনি, আপনারা ত মোটে আট গোল!"

সামান্য চারটে গোলের তফাতের দরুণ এমন আশ্রয় থেকে বাস্তিত হতে হবে, এ বড় অন্যায় কথা। সুরেন একটু ক্ষুঁরস্বরে বলে,—“একটু চেষ্টা করলে আর চারটে গোল কি আমরাই থেতে পারতাম না!”

“আরে না মশাই, সে-কথা নয়! চলুন, চলুন।”

কিন্তু আমরা অমন বাড়ির লোভ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নই কিছুতেই। একবার জিঞ্জেস করলে দোষ কি, এই আমাদের বক্তব্য।

নগেনবাবু চটে উঠে বলেন, “কাকে জিঞ্জেস করবেন মশাই? ও-বাড়িতে কেউ থাকে?”

“থাকে না! তাহলে ত আরো ভালো! একটা দরজা খোলা পেলেই হবে। নেহাঁ তালা ভাঙতেই হয়, ত দামটা না হয় দিয়েই দেব।”

নগেনবাবু আমাদের বিমুক্ত করে দিয়ে বলেন—“তালা নেই মশাই, দরজা সব খোলা!”

“দরজা খোলা, বাড়িতে কেউ নেই, তবু এই বাঁচ্টির ভেতর আমাদের ঘূরিয়ে মারছেন!”

“ঘূরিয়ে মারছ না, আপনাদের মারবার ইচ্ছে নেই বলেই ত ঘোরাচ্ছ!”

উদয়ের বাঁচ্টিশুধু আমাদের চেয়ে একটু চূঁ করে খোলে। সে-ই প্রথম ব্যাপারটা আন্দজ করে বলে,—“ভৃতুড়ে বাড়ি নাকি মশাই?”

নগেনবাবু ঘূর্খে কিছু না বলে একটু শিউরে উঠলেন।

ভবেশ হেসে উঠে বলে,—“একক্ষণ বলতে হয়! ভৃত পেলে কি এদেশে মানুষের আশ্রয় বাঁজি?”

নগেনবাবু গম্ভীর হয়ে উঠলেন অত্যন্ত—“ও-বাড়িতে থাকা হাসির কথা নয় মশাই!”

আমি বল্লাম—“বাড়ির বাইরে থাকাও বিশেষ হাসির ব্যাপার মনে হচ্ছে না! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমরা ওখানেই জলাম। শুধু একটা হ্যারিকেন, কটা মাদুর ও একজোড়া তাস বাঁদি জোগাড় করে দিতে পারেন।”

নগেনবাবু তার পরেও আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমরা নাহোড়বাল্দা। অগত্যা অত্যন্ত হতাশ ও করুণভাবে আমাদের শেষ বিদার দিয়ে ভবেশকে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। এ ভৃতুড়ে বাড়িতে রাণ্ডিরবেলা জিনিষপত্র পেঁচে দিতে আসতেও তিনি নারাজ!

বস্তুতকে চামর-টাদের ঘূড়ি দিয়ে নিয়ে আমরা ভৃতুড়ে বাড়ির দেউড়ির নৌচে ভবেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বৃপ্ত বৃপ্ত করে সমানে বাঁচ্টি পড়ছে!

ଅନ୍ତୁତ ସତ ଭାତେର ପଳ -

ଗନ୍ଧାଧରେର ବିପଦ



“ମାକଡ଼ୁମାର ଜାଲ ସରବର “ମେଜୋଟା ମୁଁତମେତେ” କତକାଳ ଏବଂ
ମଧ୍ୟେ ଯେନ ମାନୁଷ ଢୋକେ ନି ।

অন্তুত ষত ভূতের গন্ধ -

ভৌতিক



খাটের উপর উঠে বসে হাকলাম 'বে ? বে ওখানে ?

বৃট-বৃটে অন্ধকারে পাড়াগাঁয়ের পথে একটা আলোর রেখা দূরে থাক, একটা জোনাকিরও দেখা নেই।

অনেক দিন বিনা ব্যবহারে পড়ে থাকার দরুণ বাঁড়িটা থেকে কেমন এক ভ্যাপ্সা গথ দেউড়ির তলাতেই পাঞ্চলাম! গাঁয়ের লোক বাঁড়িটা দেখে যে ভয় পায়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বাঁড়িটা একেবারে গ্রামের এক টেরে। ধারে-কাছে একটা সর্তাই নেই। দিনেরবেলা বাঁড়ির যে চেহারা দেখে গোছি, তা একটু অস্তুত। দোতালার একদিকের ঘরের জন্যে দেয়াল তোলার পর ছাদ আর সম্পূর্ণ হয়নি। ছাদহীন দেয়ালগুলো দরজা-জানালার শৃঙ্খল ফোকর নিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে বাঁড়িটার চেহারা সর্তাই কেমন যেন বদলে গেছে! বাঁচ্টিতে অন্ধকারে বাঁড়িটাকে এখন অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু কেমন একটা চাপা অস্বাস্তর আবহাওয়া টের পাঞ্চলাম!

ভবেশ একটা চাকরের মাথায় কিছু বিছানা চাপিয়ে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে খানিক বাংলে এসে হাঁজির হতে সত্যি খুশীই হলাম। চাকরটা আমাদের জিনিষপত্ত দেউড়ির কাছে নামিয়ে দিয়েই যেভাবে পাঁড়ি কি ঝরি করে দৌড় দিল, তা একটা দেখবার জিনিয়।

নিজেরাই বিছানাপত্ত ও লণ্ঠন নিয়ে এবার ভেতরের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠলাম। দোতালার একদিকে গুটিকয়েক ঘর ঠিক আছে। সিঁড়ির সাথলের প্রথম ঘরটিই বেশ বড়।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা তুলে ধরে ভবেশ অস্তুত সুর করে বললে—“কই বাপু ভৃত! অতিথি-সজ্জন এল, একটু সাড়া দাও!”

আমরা সকলে তার কথার সুরে শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপারেও হেসে উঠলাম। ভবেশের কথা শেষ হতে না হতেই ওধারের কোন ঘর থেকে লম্বা টানা কাঁচ-চু করে একটা শব্দ হ'ল। ভাঙা পুরাণ কোন জানালার পাণ্ডা বাতাসে নড়ার শব্দ নিশ্চয়, তবু শব্দটা ঠিক জ্বতসই ও ঘথাসময়ে হয়েছে বলতে হবে।

ভবেশ হেসে বল্লে,—“বেশ বেশ! এইত ভদ্রতা, নসীপুর গামে মানুষের চেমে ভৃত ভালো!”

সঙ্গে সঙ্গে তার কথা সমর্থন করবার জন্যেই যেন পাশের ঘরে ঘড় ঘড় বন্ধন করে একটা আওয়াজ! একটু চম্কে উঠলেও সবাই আবার হেসে ফেলাম। শব্দ বস্তু জরুরের রূপী বলেই বোধহয় একটু অপসম্ভাব্য বল্লে,—“ঠাট্টা-তামাসা আর ভাল লাগছে না বাপু! বিছানা-টিছানা একটা করতে হয় ত করো!”

স্তুরেন ও উদয়কে বিছানা পাতবার ভার দিয়ে আমি ও ভবেশ একবার পাশের ঘরে দেখতে গেলাম, ব্যাপারটা কি!

ভবেশ বল্লে—“সাড়া দিছেন যখন, সশরীরে একবার দেখা দেন কিনা দেখাই যাক না।”

পাশের ঘরটা আকারে ছেট। দেয়াল থেকে নোনা-ধরা চুণ বাঁলি খসে পড়ে ও পুরাণ কাঠ-কাঠার ভগ্নাংশ থাকার দরুণ অত্যন্ত নোংরা।

ঘরে ঢুকেই দৃঢ়জনেই অমন চম্কে উঠব ভাবিন।

বাঁচিটা ছিল ভবেশের হাতে পেছনে। দরজার গোড়ায় পা দিতে না দিতেই অধ্যকারে কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলার মত ফ্যাঁস করে একটা আওয়াজ শনে সাত্তি শিউরে উঠলাম নিজের অনিছায়। পেছন থেকে ভবেশও সেটা শুনতে পেয়েছিল, বাঁচিটা নিয়ে এঙ্গরে এসে বল্লে—“শুধু তোমার বাণী নয় বন্ধু, একটু দর্শনও দিও! কই তিনি?”

এবার তাঁকে দেখা গেল চাক্ষু। দেখে ভয় পাবাই কথা। অতবড় এবং অমন যিশকালো বেড়াল বাংলা মূলকে জন্মায় বলে জানা ছিল না। তিনি তাঁর বহু-দিনের দৰ্থিল স্বভৱের ওপর আমাদের চড়াও হওয়াটা অন্যায় উপদ্রব মনে করে জব্ল-জব্লে চোখে গায়ের লোম ফুলিয়ে এখন দল্তবিকাশ করছিলেন।

ভবেশ বাঁচিটা নামিয়ে হতাশার ভাঁগতে বল্লে,—“এটা কি ভালো হ'ল প্রতু! এত আশ্বাস দিয়ে শেষকালে বেড়াল-রূপ ধারণ করলেন! আপনার নিজমণ্ডি কই?”

বেড়ালটা আর একবার ফ্যাঁস করে উঠল। উত্তরেও আমরা হেসে ফেঝাম। পেছনের ঘর থেকে বসন্তের বিরক্ত গলা শোনা গেল—“আমার বাঁচিটা নিয়ে গেলি কোথায়, অধ্যকারেই থাকব নাকি?”

সে-ঘরে ফিরে ভবেশ হেসে বল্লে,—“তোর কি ভয় করছে নাকি! না জব্রের লক্ষণ!”

বসন্ত আরো ঘেন বিরক্ত হয়ে বল্লে,—“ভয়-টৱ জানি না বাপ্ত। আমার ভাল লাগছে না। খুঁজে খুঁজে আছা থাকবার জায়গা বার করেছ!”

আমরা সবাই যিলে তাকে অবশ্য ঠাট্টায় নাকাল করে তুললাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল অস্বীকৃত একা বসন্তরই হয়নি।

সামনে দীর্ঘ রাত। থাবার-দাবার নগেনবাবু চাকরের সঙ্গে যা পাঠিয়েছিলেন, তার সৎকার করে বসন্তকে একটা বিছানায় শুল্পে বলে, আমরা আর একটায় তাস খেলতে বসলাই। কেন বলা যায় না, সম্ভব দিন বৃষ্টিতে ভিজে ও ফুটবল খেলে ক্লান্ত হলেও ঘুমোবার জন্যে শুল্পে কেউ তেমন ব্যাকুল নয় দেখা গেল।

রাত্রের সঙ্গে বৃষ্টির বেগও ক্রমশঃ ঘেন বাড়তে লাগল! সেইসঙ্গে পুরাণ বাঁচিটির দরজা-জান্ম্লার নানারকম আওয়াজ ক্ষণে ক্ষণে!

তাস খেলাটা তার মাঝে কিছুতেই ঘেন জমল না। এক সময়ে সবাই তাস

ফেলে দিলাম। সুরেন বল্লে,—“এবার শুয়ে পড়লে হয়!” আমরা সবাই সাম্রাজ্য, কিন্তু কারূর ওঠবার নাম নেই!

হঠাতে ভবেশ বল্লে,—“সাধারণ লোক কেন তার পায় বুঝেছ ত? কি রকম আওয়াজটা হচ্ছে শুনছ? কে বলবে যে, ওঁ-ধরে একটা কাঠের পা ঠক্টকিয়ে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে না?”

আওয়াজটা আমরা সবাই শুনেছিলাম। এই প্রথম নয়, এর আগেও অনেকবার, কিন্তু মৃদু ফুটে কেউ কিছুই বলিনি।

ভবেশ আবার বল্লে,—“এসব থেকেই মানুষ ভূত তৈরী করে...”

ভবেশের কথা শেষ না হতেই, উদয় বল্লে,—“তা না হয় হোল, কিন্তু অমন আওয়াজটাই বা কিসের? ও ত' আর জানলা নড়ার শব্দ নয়।”

আমরা পরস্পরের মৃদু চাওয়াওয়া করলাম একবার। সকলেই একটু মেন হতভম্ব। হঠাতে সুরেন লাঞ্ছনিক নিয়ে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠে পাশের ঘরে গিয়ে হাঁজির হলাম। কই, কোথাও কিছু নেই ত!

ভবেশ হেসে উঠল,—“আমাদেরও তার ধরল নার্কি!” তার হাসিটা খুব আন্তরিক শোনাল না!

উদয় হঠাতে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে,—“কিন্তু ওটা কি?”

আমাদের সকলের দৃঢ়িত তখন সেদিকে পড়েছে! আমি গিয়ে সেটা হাত দিয়ে তুলে ধরলাম,—একটা কালো রঙের ধানিকটা ছেঁড়া কাপড়!

হেসে বল্লাম,—“রঞ্জনুতে সর্পভ্রম হচ্ছে নার্কি?”

এবার ভবেশই বল্লে,—“কিন্তু বেড়ালটা কোথায় গেল? ওইখানেই দেখেছিলাম না!”

তাও ত' ঠিক। বেড়ালটাকে ত' এইখানেই দেখা গেছল! এই কাপড়টাকে তুল করে নি...না, তাও সম্ভব নয়, স্পষ্ট তাকে দেখেছি, রাগের ফেঁসফেঁসানি শুনেছি নিজের কাণে!

তবু হেসে বল্লাম,—“বেড়াল কি তোমার জন্যে এতক্ষণ বসে আছে! সে কখন সরে পড়েছে!”

“কিন্তু কোথা দিয়ে? এ-ধরের একটিমাত্র জানলা, তাও বৰ্দ্ধ। ওধারের দরজায় খিল দেওয়া ত' দেখতেই পাচ্ছ!”

বল্লাম,—“আমাদের ঘর দিয়েই পালিয়েছে হয়ত!” মৃদু বল্লেও মনের খটকা গেল না। আমাদের ঘর দিয়ে কোন বেড়ালের পক্ষে আমাদের অজ্ঞাতে যাওয়া সম্ভব ত' নয়! একেবারে দরজার সামনেই আমরা তাসের আসর পেতে বসেছিলাম। একটা ধূম্রসো মিশকালো বেড়াল পেরিয়ে গেলো জানতে পারব না, এমন বেহুস আমরা ছিলাম কি?

ভবেশ বল্লে,—“থাক্কে, বেড়ালের অল্পধৰ্মন-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে আর...”

তার মৃথের কথা মৃথেই রয়ে গেল! আমাদের সকলের শিরদাঁড়া বেঘে একটা ব্যরফ-গলানো জলের ম্রোত নেমে গেল বিদ্যুৎবেগে!

ওধারের ঘরে বসন্তের মে কি আতঙ্কের চীৎকার! উত্তেজনার মৃথে আমরা সবাই তাকে অন্ধকারে একলা ফেলে এসেছি!

ছুটে সবাই এ-ঘরে এলাম। বসন্ত ছাইএর মত মৃথ করে উঠে বসেছে! তার কপাল-মৃথ অসম্ভব রকম যেমে উঠেছে!

“হয়েছে কি? কি হলো?”

বসন্ত হাঁপাবে, না কথা বলবে! অনেক কষ্টে থেমে থেমে যা বলে, তার মৃথ এই যে, তার মাথার কাছে বলে কে যেন বরফের মত ঠাণ্ডা নিশ্বাস তার মৃথে ফেলোছিল!

আমরা সবাই হেসে উঠলাগ জোর করে। “জরুরের ঘোরে তুই দৃঢ়স্বপ্ন দেখোছিস!”

বসন্ত তাঁরভাবে প্রতিবাদ করে বলে,—“না, না, আমি জেগে স্পষ্ট সে নিশ্বাস শুনেছি, মৃথের ওপর টের পেয়েছি অনেকক্ষণ, তারপর চীৎকার করেছি! তোরা ওরকম করে ছল যাসান।”

ভবেশ হাসবার ঢেঠি করে বলে,—“আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। এমন ভয়কাতুরে ছেলেও দেখিনি! আমরা এখানেই শুন্ছি এবার!”

উদয় একটু ইতস্ততঃ করে বলে,—“এক্ষুণি শুয়ে কি দরকার? জেগে একটু গল্প করা যাক্ না!”

ক্রান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও কারূর সে-কথায় আপ্তি দেখা গেল না, ভবেশেরও না।

“বেশ ত’!” ভবেশ বলে, “কিসের গল্প হবে? বল্ সুরেন, একটা ভূতের গল্পই বল, এ-বাড়িতে বেশ লাগবে!”

বসন্ত তাড়াতাড়ি বলে,—“না, না!”

“যাঃ, তুই একেবারে ভীতুর একশেষ! বল্ সুরেন!”

সুরেন স্মানভাবে একটু হেসে বলে,—“বল্ ব তাহলে? শোন্—‘আন্বিট্টন্ ইলেভেন্’ বলে এক টীম গেছল নসীপুরে...”

আমরা সবাই একটু হাসলাম। ভবেশ বলে,—“আহা, বলতেই দাও ওকে!”

সুরেন বলতে স্বীকৃত করলে,—আমাদের নসীপুরের আসা ও তার পরের ঘটনার সে যা বর্ণনা দিলে, তাতে অন্য সময় হলৈ হাসিই পেত নিশ্চয়, কিন্তু ঘরে এখন সাড়াশব্দ বিশেষ নেই। গল্প শেষে ভূতড়ে বাড়ি পর্যান্ত এসে পৌঁছিল, সেখানকার ঘটনাগুলো একে একে শেষ করে সুরেন বলে,—“ঘৃট-ঘৃটে অন্ধকার রাত, বাইরে বৃষ্টির অবিশ্রাম্য শব্দ, আরো নানারকম বিদ্যুটে আওয়াজ! ঘরে লাঞ্ছনের মিট্-মিটে আলোয় একজন গল্প বলছে,—ভূতের গল্প!”

কেউ সে-গল্পে বিশ্বাস করে না; গল্প যে বলছে, সে হঠাতে একটা তাস নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলে,—‘অশরীরী কেউ এখানে থাকে ত’ এ-তাস বাতাসে মিলিয়ে যাক।’

হাসতে গিয়ে আমরা স্তব্য হয়ে গেলাম।

উদয় বলে,—“আরে, তাসটা পড়ল কোথায়?”

সূরেন সাতি সাতিই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে একটা তাস ওপরে ছুঁড়ে দিল।

ভবেশ তাজ্জলোর সূরে বলবার চেষ্টা করলে,—“পড়েছে কোথাও ওদিকে!”

“ওদিকে কোথায়?” উদয়ের গলার স্বর তীক্ষ্ণ।—“ওদিকে ত” খালি ঘেৰো।
এ-ঘেৰে ত’ জিনিষ লুকিয়ে থাকবার মত জায়গা নেই!”

আমি তবু উঠে বসন্তের বিছানার আশপাশ সমস্ত ভাল করে খুজলাম! অন্য সবাইও তন্ম করে সমস্ত ঘর খুঁজে দেখল।

আশচর্য! আমাদের সকলের মৃখ গম্ভীর! শুধু বসন্তের নয়, আমাদের কপালেও ঘাম দেখা দিয়েছে!

ভবেশ হঠাতে অকারণে অভ্যন্তর রেঁগে উঠে বলে,—“কি তোমরা যা তা করছ! পাগল হলে নাকি সবাই? নাও সূরেন, গল্প বলো!”

শুক্কনো পাংশু মুখে আমরা বন্দুচালিতের ঘত আবার এসে বসলাই। সূরেনের মুখে বেন রঞ্জ নেই! সকলের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার একটা তাস তুলে নিলে, তারপর বলে,—“আগের তাসটা উড়ে গেল...”

ভবেশ শুধু বলে,—“হ্ৰস্ব!”

আবার একটা তাস নিয়ে গল্পের কথক বলে,—“উড়ে যাওয়াটা প্রদান নয়!”—সূরেনের স্বর অভ্যন্তর অস্ফুট—“এবারের তাস থেকে একটা মুস্ত কালো বেড়াল বৈরীয়ে...”

বসন্তের চৌৎকার বৃক্ষ সকলের ওপরে শোনা গেল! তার বিছানার ঠিক পায়ের কাছে...

* * * *

না, সেবার আমরা অক্ষত দেহেই তার পরদিন কলকাতায় ফিরেছিলাম। শুধু বসন্তের জুরটা বিকারে দাঁড়িয়েছিল কলকাতায় এসে। বেচারাকে ভুগতে হয়েছিল অনেক দিন।



ভূতের গান

—ডঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘূরের ঘোরে শুনছি যেন “কুহু ও কেকা”র ঠিক সেই পালকীর গানটা ! কিন্তু
কথাগুলো সব উল্লেপণাটা আর স্মরণও বেশাম্পা বেয়াড়া—বেজায় ভৃতুড়ে ! কেবল
হাড় খট্টট, দাঁত খিট্টমিট, গোঙানি আর কাতরানি শুনে যে গামে জবর এল।
মুমিরে আছি, কিন্তু তব শুনছি—

চলে চলে
হুমকি তালে
পংখী গালে
মাসিপাস
বাঘ বেড়ালে ।
ভৃত্পেরেতে
চলছে রেতে
ইন্হনিয়ে
ভৃত্পেরেতে ।
পালকী দোলে
উঠ্ঠাতি আলে
নাল্কি দোলে
নাম্রাতি খালে ।

আলো-আঁধারে
 শেওড়াগাছ
 কালোয়-সাদায়
 বেড়াল নাচ।

 সারা নদী
 বালির ঘাট
 মনসাতলায়
 মাছের হাট।

 ভূতের জমা
 ভূতের জমী
 ভূত্পেরেতে
 নাইক কর্মি
 উড়ছে কতক
 ভন্ভানিয়ে
 চলছে কতক
 ইন্হানিয়ে
 ইন্হানিয়ে
 ঢুলছে কতক
 গাছতলাতে
 দূলছে কতক
 তালপাতাতে
 দিমদুপুরে
 বাদুড় ঘুমায়
 রাতদুপুরে
 হতুষ ধূমোয়!
 ভৌদড় ভাম
 বেঙ-বেঙাচ
 টিক-টিকি আর
 কানামার্ছি।

 গঙ্গাফড়িং
 জোনাক-পোকা
 আরসোজ্জা
 ন্যাংটা খোকা।

ছ'চো, ই'দৰ
 খাঁকশেয়াল
 শুকনো পাতা
 গাছের ডাল।

সব ভৃতৃড়ে
 সব ভৃতৃড়ে
 ঘৰ্ণ-হাওয়ায়
 চলছে ঘৰে
 জগৎ জুড়ে
 ঘৰছে ধূলো
 চলছে ঘৰে।

জগৎ জুড়ে
 ঘৰছে ধূলো।
 বাতাস দিয়ে
 দুলছে কুলো!!

সব ভৃতৃড়ে
 সব ভৃতৃড়ে
 আলো-আলোয়া
 জুলছে দূরে।

সব ভৃতৃড়ে
 ভূতের খেলা
 খেজুরতলায়
 ই'টের ঢেলা.....

গান শুনছি একবার—“ছ'চো, ই'দৰ, কানামাছি, তৈদড়, পে'চা, টিক্টিকি,
 খাঁকশেয়াল।” গানটা শুনছি দ্বার, “গঙ্গাফাঁড়ি, ঝোনাক-পোকা, আরসোজা,
 বাদুড়—।” গানটা শুনছি তিনবার, “আলো-আলোয়া, ঘৰ্ণ-হাওয়া, খেজুর গাছ,
 ই'টের ঢেলা—।” একবার, দ্বার, তিনবার—বারবার তিনবার ই'টের ঢেলা পড়ছে কি,
 আর পাঞ্চক্ষণ্থ আমাকে ভৃতগুলো অপাং করে মাটিতে ফেলে খেজুর গাছের তলায়
 একটা মরা গরু পড়েছিল, সেটাকে নিয়ে লক্ষ্মতে লক্ষ্মতে দৌড় মেরেছে।

চুবিরু ভূত



—আণিক বশ্যে পাখ্যান

নিজের প্রকাণ্ড লাইরেরীতে বসে
একদিন সকালবেলা পরাশর ভাঙ্গার
চিঠি লিখছিলেন। চোরের মত নিঃশব্দে
ঘরে ঢুকে নগেন ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে
তাঁর টোবিল ঘেঁসে দাঁড়াল। পরাশর ভাঙ্গার মৃথ না তুলেই বললেন, ‘বোস,
নগেন।’

চিঠিখানা শেষ করে থামে ভরে চাকরকে জেকে সেটি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে
আবার নগেনের দিকে তাকালেন।

—‘বসতে বললাঘ বে? এরকম চেহারা হয়েছে কেন? অস্থ নাকি?’

নগেন ধপ্ত করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে,

সে চুরি করে কি না, এইরকম অতিমাত্রায় বিস্তৃত হয়ে সে বলল, 'না, না, অস্থি নয়, অস্থি আবার কিসের !'

গুরুতর কিছু যে ঘটেছে, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে পরাশর ডাঙ্গার দৃঢ়ত্বের আঙ্গুলের ডগাগুলি একত্র করে নগেনকে দেখতে লাগলেন। মোটামোটা হাঁসখুসী ছেলেটার তেল-চক্রকে চামড়া পর্যাল্পত যেন শৰ্করে গেছে, ঘূর্খে হাসির চিহ্ন-কুণ্ডলী নেই। চাউনি একটু উদ্ব্লাল্ট। কথা বলার র্তাঙ্গ কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে !

নগেন তার মামাবাড়ীতে থেকে কলেজে পড়ে। মাস দুই আগে নগেনের মামার শ্রান্তের নিম্নলিঙ্গ রাখতে গিয়ে পরাশর ডাঙ্গার নগেনকে দেখেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কি ঘটেছে, ছেলেটা যাতে এ-রকম বদলে যেতে পারে ? ছেলেবেলা থেকে মামাবাড়ীতেই সে মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু মামার শোকে এ-রকম কাহিল হয়ে পড়ার ঘৃত আকর্ষণ তো মামার জন্য তার কোনদিন ছিল না ! বড়লোক কৃপণ মামার যে-ধরনের আদর বেচারী চিরকাল পেয়ে এসেছে, তাতে মামার পরলোক-যাত্রায় তার খ্ৰীব বেশী দৃঢ় হবার কথা নয়। বাইরে মামাকে খ্ৰীব প্রধা-ভাস্তু দেখালেও মনে মনে নগেন যে তাকে প্রায়ই বন্ধের বাড়ী পাঠাত, তাও পরাশর ডাঙ্গার ভাল করেই জানতেন। পড়ার খরচের জন্য দৃশ্যচৰ্মতা হওয়ার কারণও নগেনের নেই, কারণ, শেষ-সময়ে কি ভেবে তার মামা তার নামে মোটা টাকা উইল করে রেখে গেছেন।

নগেন হঠাতে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, 'ডাঙ্গার-কাকা, সৰ্তা করে একটা কথা বলবেন ? আমি কি পাগল হয়ে গেছি ?'

পরাশর ডাঙ্গার একটু হেসে বললেন, 'তোমার মাঝা হয়ে গেছে। পাগল হওয়া কি ঘূর্খের কথা যে বাবা ! পাগল যে হয়, অত সহজে সে টের পায় না, সে পাগল হয়ে গেছে !'

'তবে—' স্বিধা ভরে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাতে নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আচ্ছা ডাঙ্গার-কাকা, প্ৰেতাব্যা আছে ?'

'প্ৰেতাব্যা মানে তো ভৃত ? নেই !'

'নেই ? তবে—'

অনেকক্ষণ ইতস্ততও করে, অনেক ভূমিকা করে, অনেকবার শিউরে উঠে নগেন ধীরে ধীরে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল। চৰকপুদ অবিশ্বাস্য কাহিনী ! বিশ্বাস কৰা শক্ত হলেও পরাশর ডাঙ্গার বিশ্বাস কৰলেন। যিথ্যা গম্প বানিয়ে তাঁকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয়, তিনি তা জানতেন !

মামা তাকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকাকাঢ়ি দিয়ে গেছেন জেনে প্ৰথমটা নগেন একেবারে স্তুতিভূত হয়ে গিয়েছিল। মামার এ-রকম উদারতা সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। বাইরে বেমন ব্যবহারই করে থাকুন, মামা তাকে নিজের ছেলেদের মতই ভালবাসতেন জেনে পৰলোকগত মামার জন্য আন্তরিক প্রধা-ভাস্তুতে

তাৰ ঘন ভৱে গেল। আৱ সেই সঙ্গে জাগল, এইৱকম দেবতাৰ ঘত মানুষকে সারাজীবন ভাস্তি-ভালবাসাৰ ভান কৰে ঠাকিয়েছে ভৱে, দারুণ লজ্জা আৱ অনুত্তাপ।

শ্বাস্থের দিন অনেক রাত্ৰে বিছানায় শুতে ঘাওয়াৰ পৰ অনুত্তাপটা ষেন বেড়ে গেল—শুয়ে শুয়ে সে ছট্টফট্ কৰতে লাগল। ইঠাঁ একসময় তাৰ মনে হ'ল, সারাজীবন তো ভাস্তি-শৰ্ম্মাৰ ভান কৰে ঘামাকে সে ঠাকিয়েছে, এখন যদি সত্য-সত্যই ভাস্তি-শৰ্ম্মা জেগে থাকে, লাইভেৰী-ঘৰে ঘামার তৈল-চিত্ৰে পারে মাথা ঠেকিয়ে প্ৰণাম কৰে এলৈ হয়তো আঞ্চলীয় একটু কথবে, ঘনটা শান্ত হবে।

ৱার্তি তখন প্ৰায় তিনিটে বেজে গেছে, সকলৈ আলো নিৰিয়ে শুয়ে পড়েছে—বাড়ী অন্ধকাৰ। এত রাত্ৰে ঘুমানোৰ বদলে ঘামার তৈল-চিত্ৰে পারে মাথা ঠেকিয়ে প্ৰণাম কৰার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে ঘাওয়াটা ষে রীতিমত খাপছাড়া ব্যাপার হবে, সে-জ্ঞান নগেনেৰ ছিল। তাই কাজটা সকালেৰ জন্য স্থৰ্পিগত রেখে সে ঘুমোবাৰ চেটা কৱলৈ। কিন্তু তখন তাৰ মাথা গৰম হয়ে গেছে। ঘন একটু শান্ত না হলৈ ষে, ঘূৰ্ম আসবাৰ কোন সম্ভাবনা নেই, কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ কৱার পৰ সেটা ভাল কৱেই টৈৰ পেয়ে শেষকালে ঘৰিয়া হয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

লাইভেৰীটি নগেনেৰ দাদামহাশয়েৰ আমলেৰ। লাইভেৰী-সম্পর্কে নগেনেৰ ঘামার বিশেষ কোন মাথাবাধা ছিল না। তাৰ আমলে গত হিশ বছৰেৰ ঘণ্যে লাইভেৰীৰ পিছনে একটি পয়সাও খৰচ কৱা হয়েছে কিনা সন্দেহ। আলমারী-কৱেকটি অংপদামী আৱ অনেকদিনেৰ প্ৰান্তো, ভিতৰগুলি বেশীৰ ভাগ অদৱকাৰী বাজে বইয়ে ঠসা এবং উপৰে বহুকালেৰ ছেড়া মাদিকপত্ৰ আৱ নানাৱকম ভাঙ্গা-চোৱা ঘৰোয়া জিনিষ গাদা কৱা। টৈবিলটি এবং চেয়াৰ কৱেকটি খুব সম্ভব অন্য ঘৰ থেকে পেনসন পেয়ে এবৰে স্থান পেয়েছে। দেয়ালে তিনিটি বড় বড় তৈল-চিত্ৰ, সচ্চা ছেমে-বাঁধানো কয়েকটা সাধাৱণ রঞ্জীন ছৰি ও ফন্টা টাঙ্গানো। তাছাড়া, কয়েকটা প্ৰান্তো কালেণ্ডাৱেৰ ছৰিৰ আছে—কোনটাতে ডিসেম্বৰ, কোনটাতে চৈত্ৰমাসেৰ বাৰ তাৰিখ লেখা কাগজেৰ ফলক এখনও বুলৈছে।

তৈল-চিত্ৰে একটি নগেনেৰ দাদামহাশয়েৰ, একটি দিদিয়াৰ এবং অপৱাটি তাৰ ঘামার। দাদামহাশয় আৱ দিদিয়াৰ তৈল-চিত্ৰ দৃঢ়ি একদিকেৰ দেয়ালে পাশাপাশি টাঙ্গানো আছে, ঘামার তৈল-চিত্ৰটি স্থান জুড়ে আছে পাশেৰ দেয়ালেৰ মাঝামাঝি।

কাৱও ঘূৰ্ম ভেঙ্গে ঘাবাৰ ভয়ে নগেন আলো জুলেনি। কিন্তু তাতে তাৰ কোন অসুবিধা ছিল না, ছেলেবেলো থেকে এ-বাড়ীৰ আনাচে-কানাচেৰ সঙ্গে তাৰ পৰিচয়। লাইভেৰীতে ঢুকে অন্ধকাৱেই সে ঘামার তৈল-চিত্ৰে কাছে এগিয়ে গেল। অস্ফুট্টবৰে ‘আমাৰ ক্ষমা কৱ ঘামা’ বলে যেই সে তৈল-চিত্ৰে পারেৰ কাছে আলদাজে স্পৰ্শ কৱেছে—বৰ্ণনাৰ এইখানে পোঁছে নগেন শিউৱে চুপ কৱে গেল। তাৰ মুখ আৱও বেশী ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, দ্বিতোখ বিস্ফোরিত।

‘তাৱপৰ?’

নগেন টোক গিলে জিভ দিয়ে টোট চেটে বলল, 'যেই ছবি ছুঁমেছি ডাক্তার-কাকা, কে ঘেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। সমস্ত শরীরটা ঝন্ট ঝন্ট করে উঠলো। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দোখ, সকাল হয়ে গেছে, আমি মামার ছবির নীচে মেঝেতে পড়ে আছি।'

পরাশর ডাক্তার গশ্চীর ঘৰ্খে জিজ্ঞাসা কৱলেন, 'তোমার আগে কোনাদিন ফিট হয়েছিল নগেন ?'

নগেন মাথা নেড়ে বলল, 'ফিট ? না, কস্মিন-কালেও আমার ফিট হয়নি ! আপৰান ভুল কৱছেন ডাক্তার-কাকা, এ ফিট নয় ; মৱলে তো মানুষ সব জানতে পাৰে, মামাও জানতে পেৱেছেন টাকাৰ লোভে আমি তাকে যিথ্যা ভাস্ত দেখাতাম। তাই ছবি ছৈয়ামাত রাগে ঘোৱায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সবটা শন্তন আগে, তাহলে বুৰতে পাৱেন !'

সমস্ত সকালটা নগেন ঘৰার মত বিছানায় পড়ে রইল। এই চিন্তাটাই কেবল তার মনে ঘৰপাক খেতে লাগল, ভাস্ত ভালবাসার ছলনায় ঢাকা আদায় কৱে নিয়েছে বলে পৱলোকে গিয়েও তার ওপৰ মামার এমন জোৱালো বিত্তফা জেগেছে যে, তেল-চিন্তাটি পৰ্যালত তিনি তাকে স্পৰ্শ কৱতে দিতে রাজ্ঞী নন। যাই হোক, নগেন একলোৱে ছেলে, প্ৰথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পৰ, তার মনে নানাবৰকম দ্বিধা সন্দেহ জাগতে লাগল। কে জানে রাতে যা ঘটেছে, তা নিছক স্বপ্ন কি না ! ধৰ্ম্য ধৰতে না পেৱে দুশ্শৱৰবেলা সে আবার লাই়েৱৰীতে গিয়ে মামার তৈলচিত্র স্পৰ্শ কৱে প্ৰাপ্ত কৱল। একবাৰ বৰ্ষা মামা রাগ দোখিয়ে থাকেন, আবাৰ দেখাবেন না কেন ?

এবাৰ কিছুই ঘটল না। শৱীরটা অবশ্য থৰ খারাপ হয়ে আছে, মেঝেতে ধাক্কা ঘেখালে লেগেছিল, মাথার সেখানটা ফুলে টুন টুন কৱছে এবং সকালে লাই়েৱৰীতে মামার তৈলচিত্রে নীচে মেঝেতেই তার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু এতে বড়জোৱ প্ৰমাণ হয়, রাতে ঘুৰেৱ ঘথেই হোক আৰ জাগ্রত অবস্থাতেই হোক, লাই়েৱৰীতে গিয়ে সে একটা আছাড় খেয়েছিল। নিজেৰ তৈলচিত্রে ভৱ কৱে মামাই যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন, তার কি প্ৰমাণ আছে ?

নগেন ঘেন স্বৰ্স্তিৰ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু বেশীক্ষণ তার মনেৰ শাস্তি টিকল না। রাতে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার তো ভুল হয়েছে ! দিনেৰ বেলা তাকে ধাক্কা দেওয়াৰ মত ক্ষমতা তো তার মামার এখন নেই, রাণি ছাড়া তার মামা তো এখন কিছুই কৱতে পাৱেন না ! কি সৰ্ব-নাশ ! তবে তো রাতে আৱেকবাৰ মামার তৈলচিত্র না ছুঁয়ে কাল রাতেৰ ব্যাপোৱকে স্বপ্ন বলা যায় না।

এত রাতে আবার লাই়েৱৰীতে যাওয়াৰ কথা ভেবেই নগেনেৰ হৃৎক্ষম হতে লাগল। কিন্তু এমন একটা সন্দেহ না যিটিয়েই বা মানুষেৰ চলে কি কৱে ? ধাৰ্মিক পৱে নগেন আবার লাই়েৱৰীতে হাজিৰ। ভয়ে বুক কঁপছে, ছুটে পালাতে

ইজেছ হচ্ছে, কিন্তু কি এক অদম্য আকৰ্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে মামাৰ তৈলচিঠ্ঠেৰ দিকে। ঘৰে ঢুকেই সে স্যুইচ টিপে আলো জেবলে দিল। ঘটকাৰ পাখাৰীৰ ওপৰ দামী শাল গায়ে মামা দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে একজোড়া মোটা গোঁফ, চোখে ভঙ্গনাৰ দ্রষ্টি। নগেন এগিয়ে গিয়ে মামাৰ পায়েৰ কাছে ছৰি স্পৰ্শ কৱল। কেউ তাকে ঠেলে সৰিৱয়ে দিলে না, কিন্তু সমস্ত শৱীৱটা হঠাৎ যেন কেমন অস্থিৰ কৰতে লাগল! তৈলচিঠ্ঠ থেকে কি যেন তাৰ মধ্যে প্ৰবেশ কৰে ভেতৰ থেকে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে।

তবু নগেন যেন বাঁচল। ভয়েৰ জন্য শৱীৱ এ-ৱকম অস্থিৰ কৰতে পাৰে। সেটা সামান্য ব্যাপার।

ফিরে যাওয়াৰ সময় আলোটা নিভিয়েই নগেন আবাৰ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাৰ আৱেকটা কথা মনে এসেছে। কাল ঘৰ অন্ধকাৰ ছিল, আজ আলো থাকাৰ জন্য যদি মামা কিছু না কৰে থাকেন? নগেনেৰ ভয় অনেকটা কৰে গিয়েছিল, অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই সে অন্ধকাৰে তৈলচিঠ্ঠেৰ কাছে ফিরে গেল। সে জানে, অন্ধকাৰে তৈলচিঠ্ঠ স্পৰ্শ কৱলেও কিছু হবে না। ঘৰে একটা আলো জুলছে কি জুলছে না, তাতে বিশেষ কি আসে যায়? ইত্যতৎ না কৰেই সে সোজা তৈলচিঠ্ঠেৰ দিকে হাত বাঁড়িয়ে দিল। পৱন্ত্রণে—

‘ঠিক প্ৰথম-ৱাতেৰ মত জোৱে ধাকা দিয়ে মামা আমায় ফেলে দিলেন ডাঙ্কাৰ-কাকা।’

‘অজ্ঞান হয়ে গেলে?’

‘না, একেবাৱে অজ্ঞান হয়ে বাইনি! অবশ আজ্ঞানেৰ মত অনেকক্ষণ ঘৰেতে পড়ে ছিলাম, কিন্তু জ্ঞান ছিল। তাৰপৰ থেকে আমি ঠিক পাগলেৰ মত হয়ে গেছি ডাঙ্কাৰ-কাকা! দিনৱাত কেবল এই কথাই ভাৰি। রোজ কতবাৰ ঠিক কৰিৱ বাড়ী ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাব, কিন্তু যেতে পাৰি না, কিসে যেন আমায় জোৱ কৰে আটকে রেখেছে।’

পৱাশৰ ডাঙ্কাৰ অনেকক্ষণ ভেবে জিজ্ঞাসা কৱলেন, ‘তাৰপৰ আৱ কোনাদিন ছৰিবটা ছ’য়েছ?’

‘কতবাৰ। দিনে ছ’য়েছি, রাত্রে ছ’য়েছি, আলো জেবলে ছ’য়েছি, অন্ধকাৰে ছ’য়েছি। ঠিক ওইৱকম ব্যাপার ঘটে। দিনে বা রাত্রে আলো জেবলে ছ’লে কিছু হয় না, অন্ধকাৰে হৈয়ামাত্ মামা আমাকে ঠেলে দেন। সমস্ত শৱীৱ যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে! কোনাদিন অজ্ঞান হয়ে যাই, কোনাদিন জ্ঞান থাকে।’

বলতে বলতে নগেন যেন একেবাৱে ভেঙ্গে পড়ল, ‘আমি কি কৰিব ডাঙ্কাৰ-কাকা? এমন কৰে কৰ্দিন চলবে? মাখে মাখে আস্থাহত্যাৰ কথা ভাৰি।’

পৱাশৰ ডাঙ্কাৰ বললেন, ‘তাৱ দৱকাৰ হবে না। আমি সব ঠিক কৰে দেব।

আজ সকলে ঘূমিয়ে পড়লে রাণি ঠিক বারোটাৰ সময় তুমি বাইরেৱ ঘৰে আমাৰ জন্য অপেক্ষা কোৱো, আমি যাব।'

একটু থেমে আবাৰ বললেন, 'ভূত বলে কিছু মেই, নগেন।'

তবু মাঝৱাতে অন্ধকাৰ লাইৱেৱৈতে পৱাশৰ ডাঙাৰ ম্দৰ একটু অস্বীকৃতি বোধ কৱতে লাগলৈন। এ ঘৰে বাড়ীৰ লোক খুব কম আসে। ঘৰেৱ বাতাসে পুৱানো কাগজেৱ একটা ভাপসা গুৰি পাওয়া যায়। নগেন শক্ত কৱে তাৰ একটা হাত চেপে ধৰে কাঁপছে। কিসেৰ ভয়? ভূতেৰ? তৈলচিত্ৰেৰ ভূতেৰ? ভূতে যে একেবাৰে বিশ্বাস কৱে না, যাৰ বশ্যমূল ধাৰণা এই যে, ষত সব অশ্বুত অৰ্থচ সত্য ভূতেৰ গল্প শোনা যায় তাৰ প্ৰত্যেকটিৰ সাধাৰণ ও স্বাভাৱিক কোন ব্যাখ্যা আছেই আছে, ছৰ্বিৰ ভূতেৰ অসম্ভব আৱ অৰ্বিশ্বাস্য ভূতেৰ ঘৰে পা দিয়ে তাৰ কথানো কি ভয় হতে পাৱে? তবু অস্বীকৃতি যে বোধ হচ্ছে, সেটা অস্বীকাৰ কৱাৰ উপয় নেই। নগেন যে কাহিনী শৰ্বনয়েছে, সারাদিন ভেওে পৱাশৰ ডাঙাৰ তাৰ কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা কল্পনা কৱতে পাৱেন নি। একদিন নয়, একেবাৰ নয়, ব্যাপারটা ঘটেছে অনেকবাৰ। দিনে তৈলচিত্ৰ নিষ্টেজ হয়ে থাকে, রাতে তাৰ তেজ থাঢ়ে। কেবল তাই নহ, অন্ধকাৰ না হলে সে তেজ সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ পাৱ না। আৱও একটা কথা, রাণি বাড়াৰ সঙ্গে তৈলচিত্ৰ যেন বেশী সজীব হয়ে উঠতে থাকে। প্ৰথম রাতে নগেন অন্ধকাৰে স্পৃশ কৱলে ছৰ্বি নগেনেৰ হাতটা শৰ্শৰ ছিটকিয়ে সৰিয়ে দিয়েছে; মাঝৱাতে স্পৃশ কৱলে এত জোৱে তাকে ধাকা দিয়েছে যে, মেৰেতে আছড়ে পড়ে নগেনেৰ জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে।

অশৱীৱী শক্তি কল্পনা কৱা ছাড়া এ-সমস্তেৰ আৱ কি মানে হয়?

হয়—নিশ্চয় হয়; মনে মনে নিজেকে ধৰক দিয়ে পৱাশৰ ডাঙাৰ নিজেকে এই কথা শৰ্বনয়ে দিলেন। তাৰপৰ চোখ তুলে তাকালৈন দেয়ালেৰ যেখানে নগেনেৰ মামাৰ তৈলচিত্ৰটি ছিল। এ ঘৰে তিনি আগেও কয়েকবাৰ এসেছেন, তৈলচিত্ৰগুলিৰ অবস্থান তাৰ অজনা ছিল না। যা চোখে পড়ল তাতে পৱাশৰ ডাঙাৰেৰ বুকটাৰ ধড়াস্ কৱে উঠল। তৈলচিত্ৰেৰ উপৰেৰ দিকে দৃঢ়ি উঠজৰুল চোখ তাৰ দিকে জবল্ জবল্ কৱে তাৰিয়ে আছে। চোখ দৃঢ়িৰ মধ্যে ফাঁক পায় দেড় হাত।

ঠিক এই সময় নগেন ফিস্ ফিস্ কৱে বলল, 'আলোটা জ্বালৰ ডাঙাৰ-কাকা?'

পৱাশৰ ডাঙাৰ তাৰ গলার আওয়াজ শৰ্বনেই চমকে উঠলেন।—'না।'

ৱাস্তা অথবা পাশেৰ কোন বাড়ী থেকে সৱু আলোৱ রেখা ঘৰেৱ দেয়ালে এসে পড়েছে। তাতে অন্ধকাৰ কমেনি, মনে হচ্ছে যেন সেই আলোটাৰুতে ঘৰেৱ অন্ধকাৰটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাৰ্ত্ত।

নগেন আবাৰ ফিস্ ফিস্ কৱে বলল, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গৈছ ডাঙাৰ-কাকা। দাদামশায় আৱ দিদিমাৰ ছৰ্বি তাৰা মৱবাৰ পৱ কৱা হয়েছিল, কিন্তু

মামাৰ ছৰিবটা মৱবাৰ আগে মামা নিজে সখ কৰে আৰ্কিয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্মেই—

নগেনেৰ শিহুৰ স্পষ্ট টেৱ পাওয়া যাব। ‘ভয় পেয়ে গেছেন?’

পৱাশৰ ডাঙুৱকে স্বীকাৰ কৰতে হল, একটু ভয় তিনি সতাই পেয়ে গেছেন। তাৰ বৈজ্ঞানিক মন এতদিন পৱে একটা মন্ত সত আৰ্বিকাৰ কৱল যে, মানুষৰ মন চিৰদিনই মানুষৰ মন। যন্ত্ৰ, তক্ষ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস দিয়ে মানুষ ভয়কে জয় কৰতে পাৱে না। দেহে আঘাত লাগলে যেমন দেনা বোধ হবেই, তেমনি উপযন্ত ভয়েৱ কাৱণ উপস্থিত হলে মানুষকে ভয় পেতেই হবে।

যাই হোক, একদিন যদি তিনি ভুল বিশ্বাস পোষণ কৰে এসে থাকেন, আজ ছৰিব ভূতেৰ কল্যাণে সে ভুল তাৰ ভেঙ্গে যাবে। তাতে ক্ষতি কি? দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পৱাশৰ ডাঙুৱ তৈলচিত্ৰে দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতে জৰুৰ-জৰুৱে চোখ দৃঢ়িৱ জোাতি অনেক কমে গেল।

হাত বাঢ়িয়ে দিতে প্ৰথমে তাৰ হাত পড়ল দেয়ালে। যত সাহস কৱেই এগিয়ে এসে থাকুন, প্ৰথমেই একেবাৱে নগেনেৰ মামাৰ গায়ে হাত দিতে তাৰ কেমন স্বিধা বোধ হচ্ছিল। পাশেৰ দিকে হাত সৰিয়ে তৈল-চিত্ৰেৰ ফ্ৰেম স্পৰ্শ কৰা মাত্ৰ বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন তাৰ শৰীৰটা বন্ধ বন্ধ কৰে উঠল। অক্ষুণ্ঠ গোঙানিৰ আওয়াজ কৰে পিছন দিকে দৃঢ়া ছিটকে গিয়ে তিনি যেৰেতে বসে পড়লেন।

পৱক্ষে ভয়ে অশ্রুত নগেন আলোৱে স্যুইচ টিপে দিলে।

মিনিট-পাঁচক পৱাশৰ ডাঙুৱ চোখ বুজে বসে রইলেন, তাৰপৰ চোখ মেলে মিনিট-পাঁচক একদৃষ্টে তাৰিক্যে রইলেন মামাৰ রূপৰ ফ্ৰেমে বাঁধানো তৈলচিত্ৰৰ দিকে।

তাৰপৰ তৌৰ চাপা গলায় তিনি বললেন, ‘তুমি একটি আস্ত গন্দৰ্ভ নগেন।’

*

*

*

*

ৱাগ একটু কমলে পৱাশৰ ডাঙুৱ বলতে লাগলেন, ‘গাধাৰ তোমাৰ চেয়ে বৰ্ণন্ধমান।’ এত কথা বলতে পাৱলৈ আমাকে, আৱ এই কথাটা একবাৱ বলতে পাৱতে না যে, তোমাৰ মামাৰ ছৰিবটা ইতিমধ্যে রূপৰ ফ্ৰেমে বাঁধানো হয়েছে, আৱ ছৰিব সঙ্গে লাগিয়ে দৃঢ়ো ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব ফিট কৰা হয়েছে?’

‘আমি কি জানি! ছ’ মাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ছৰিবটা এখনো তেমনি অবস্থাতেই আছে।’

‘ইলেক্ট্ৰিক শক্ খেয়ে বুৰতে পাৱ না কিসে শক্ লাগল, তুমি কোন্দেশী ছেলে? আমি তো শক্ খাওয়ামাত্ টেৱ পেয়ে গিয়েছিলাম তোমাৰ মামাৰ ছৰিবিতে কোন্দেশী ভৱ কৰেছেন?’

নগেন উদ্ব্ৰাল্লেৰ মত বলল, ‘রূপৰ ফ্ৰেমটা দাদামশায়েৰ ছৰিবিতে ছিল, চুৱি যাবাৰ ভয়ে মামা অনেকদিন আগে সিল্ডুকে তুলে রেখেছিলেন। মামাৰ শান্তেৰ দিন

মাঝীয়া ফ্রেমটা বার করে মামার ছবিটা বাঁধিয়েছিলেন। আলো দু'টো লাগিয়েছে আমার মামাতো ভাই পরেশ।'

'হ্যাঁ। সে এ-বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি' হয়েছে। তাই বলল, এই সামান্য কাজের জন্য ইলেক্ট্রিক মিস্ট্রীকে পয়সা দেব কেন?'

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে। কিন্তু পয়সা বাঁচানোর জন্য বাপের ছবিতে ভূত এনে ছেড়েছে। এ খবরটা যদি আগে দিতে আমার—।'

নগেন সংশয়ভরে বলল, 'কিন্তু ডাক্তার-কাকা—'

পরাশর ডাক্তার রাগ করে বললেন, 'কিন্তু কি? এখনো বুঝতে পারছ না? দিনের বেলা মেন-স্যুইচ অফ করা থাকে, তাই ছবি ছুঁলে কিছু হয় না,—ছবি মানে ছবির রূপার ফ্রেমটা। রূপার ফ্রেমটার নীচে কাটফাট কিছু আছে, দেয়ালের সঙ্গে যোগ নেই, নইলে তোমাদের ইলেক্ট্রিকের বিল এমন হব হব করে বেড়ে বেত যে, কোম্পানীর লোককে এসে 'লিকেজ' খাঁজতে হত। তুমিও মামার ভূতের আসল পরিচয়টা জানতে পারতে।

সন্ধ্যার পর বাড়ীর সমস্ত আলো জ্বলে, আর বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে ঘাতাঘাত করতে বেশী ভালবাসে কিনা, তাই সে সময় ছবি ছুঁলে তোমার কিছু হয় না। এ ঘরের আলোটা জ্বাললেও তাই হয়। মাঝরাতে বাড়ীর সমস্ত আলো নিনেডে যায়, তখন ছবিটা ছুঁলে আর কোন পথ খোলা নেই দেখে বিদ্যুৎ অগত্যা তোমার মত বোকা হাবার শরীরটা দিয়েই—'

পরাশর ডাক্তার চুপ করে গেলেন। তাঁর হঠাত মনে পড়ে গেছে, সুযোগ পেলে তাঁর শরীরটা পথ হিসাবে বাবহার করতেও বিদ্যুৎ দ্বিধা করে না।



ଅଛୁତ ସତ ଭୂତେ ଗଲ—

ନମକାର



ଟାକା ନିଯେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମାଯ ତୋମରୀ ମେରେ ଯେବୋ ନା ବାବା !

ଅନ୍ତୁ ସତ ଭୂତେର ଗଲା —

ଡାକ୍ତାରେର ବଳ୍ପା ମେଇ



—ହାତ ବାଡ଼ାତେଇ ଆର ଏକଥାନା ହାତ ଚାଦରେର ଡିତର ଥିକେ ବେଗିଯେ ତୋର
ହାତେ ଏମେ ଠେକନ.—ଶାସହୀନ ହାତ ଆନ୍ତ ଏକଥାନା ହାଡ଼ !



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ
ପୂଜା ଦେଖା

—ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ରପାତ୍ର—

ଗୋଡ଼ାତେଇ ବଲେ ରାଧି, ଏଟା ହାସିର ଗମ୍ପ ନଯ । କେନନା, ଭୃତ ଦେଖା, ଆର ସାଇ
ହୋକ, ହାନ୍ୟକର ବ୍ୟାପାର ନଯ ନିଶ୍ଚଯାଇ ।

ଏବଂ ଏବା ଦରକାର ଯେ, ଏଟା ଗମ୍ପ ନଯ ! ଆନ୍ଦୋଳା ସତ୍ୟ ଘଟନା । ଭୃତ
ଦେଖେଛେନ, ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନେକେର ଜୀବନେଇ ହ୍ୟାତୋ ଏଇ ଦୁର୍ଵ୍ୟାଗ ଘଟେ ଥାକ୍ବେ,
ତାଁରା ସବାଇ ଏକବାକେ ଆମାର ସାଙ୍କ୍ୟ ଦେବେନ ।

ভূতের গল্প মানেই সঁতাকারের গল্প।

অবশ্য, এও বলতে চাই, এক জীবনে অশ্বত আমি অনেক কিছুই দেখেছি, এবং এখনও দেখতে হচ্ছে, কিন্তু ভৃত আমি সেই একটিই—বা একসঙ্গে সেই দুটিই—যা একবার দেখেছিলাম!

বিনি আর আমি বাড়ীর খোঁজে বেরিয়েছি, প্রাণে বাসায় মন টিক্ছে না। নতুন একটা আবাস দেখে উঠে যাব, এই বাসন। এক জায়গাতে কতদিন আর মাথা গোঁজা যাব? খাঁচার পোষা জানোয়ারদেরই পোষায় কেবল। চোর ছাঁচেড়োরা ন্যাওটা না হলেও, চার্মাচিকেরা এসে আস্তা না গাড়লেও, কাঁকড়া-বিছেরা যখন তখন যেখানে দেখানে দেখা না দিলেও, আর্সেলারা ফ্র্ ফ্র্ আর ধেড়ে ইংদুররা ধ্র্ ধ্র্ করে ঘরময় না ঘুরলেও, তেমন কিছু অনিষ্ট না ঘটলেও, এক জায়গায় ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকাটা—এম্বিন্টেই কেমন খারাপ লাগে না কি? ভাড়াটে বাড়ী আঁকড়ে, মাটি কামড়ে পড়ে থাকা একটু বাড়াবাড়ি দেখায় না? পৈতৃক ভিটে নয় কিছু, পরকে টাকা গুণে পরের বাড়ীতে তৎপর হয়ে থাকব—অতটা পরার্থপর হওয়া কি ভাল?

সৌন্দর্য সকালে বিনি, আকারণেই কলতলায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। এবং উঠেই বল, প্রথম কথাই বল সেঁ:

“এই আস্তাবলটা এবার ছাড়ো তো বাপ্ত!”

“এই আস্তাবলটা এইবার বদলানো দরকার। বহুদিন তো কাটল।” আমি ওর ছেঁয়াধনিতে শোগ দিয়েছি। তার একটু আগেই বিছানায় কালির দোয়াতটা উল্টেছিলাম, কাজেই আমার সহানুভূতির অভাব ছিল না। এবং তারপরেই আমরা তীরবেগে রাস্তায় পড়ে বাড়ী খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছি।

কিন্তু মনের মত বাসা আর পাই কই? ‘ট্লেট’ দেখলেই এগিয়ে যাই, অনিকক্ষণ লটকে থাকি, তারপর আরো একটু বেশি দেখে ছিটকে বেরিয়ে আসতে হয়।

‘ট্লেট’ তো চারিধারেই ছাড়ানো, অনেক বাড়ীতে ভাড়াটে এসে জুটলেও ছাড়ানো হয় নি। নতুন বাসিন্দারাই নড়তে দ্যায় নি, ভাড়া করার শিতৌল্য দিনেই, কড়ার করে বাড়ী ছাড়ার নোটিশ দিয়ে রেখেছে। কড়া নোটিশ।

পয়সা খিসয়ে ইট-কাঠ বাসয়ে এসব কি বানিয়ে রেখেছে এরা? জর্মির ওপর এসব কী জর্মিয়ে রেখেছে? দেখে দেখে বিরক্ত ধরে গেল। এদের—এইসব অট্টালিকাদের ধরাশায়ী করবার জন্মেই, অনৰ্তবিলম্বে বড় গোছের ডৃমিকম্প কিম্বা এয়ার-রেড একটা কিছু হওয়া দরকার।

অবশ্যে, বেহালার দিকে একটা ভালো বাড়ীর খোঁজ পেলুম। আমরা যেমনটি চাই ঠিক তেমনটিই নারীক বাড়ীটি! অল্প ক'থানি ঘর নিয়ে ছোটখাটোর মধ্যে, অথচ ভাড়াও বেশী নয়, এমন কি তার একতলার ঘরগুলোও তালাক্ দেবার মতো না!

তালা দিয়ে না রেখে ব্যবহার করবার অতো। সামনে একটু লনের মতও রয়েছে নাকি!

খবর পেয়েই ছট্ট দিলুম। বিনি আর আমি।

খবরটা উড়ে এলেও, একেবারে উড়ে খবর নয়। অনিবর্চনযীয় না হলেও, পছন্দসই সত্যই। আশপাশ থেকে, এ-কোণ ও-কোণ নানান, কোণ থেকে, নানা দ্রষ্টিভঙ্গীতে দেখে উপাদেয় বলেই বোধ হোলো বাড়ীটাকে। বা'র থেকে তো ভালোই, এবার ভেতরে পা বাড়িয়ে দোখ।

বাড়ীওলার ছেলে এসে সদরের তালা খুলে দিলে। তালার ওপর খুলো জমে রয়েছে। মাথার চোকাটে মাকড়সার জাল লাগানো। দেয়ালে দেয়ালে চটা-উঠে-যাওয়া! সারা বাড়ীর আন্তেপুঁতে কী একটা সাবেক কালের ছোপ—কেমন যেন একটা প্রস্তুতের ছাপ মারা!

“পোড়ো বাড়ী নয়তো দাদা?” বিনি খুঁৎ খুঁৎ করে।

“না না! কী বলছেন?” ছেলেটি প্রতিবাদ জানায়: “চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পোড়ে নি। তাহলে তো আমরা ইন্সওরেন্সের টাকাগুলো পেতাম। বেশ মোটা টাকা!”

“য়াঁ, কী বলে?” আমি বিচিলিত হই।

“দমকলওলারা এসে পড়ল কিনা!” ছেলেটি অভিযোগ করে। কিরকম একটা আধপোড়া ধরা গন্ধ বাড়ীটার গা থেকে এসে আমাদের নাকে ধাক্কা মারে। প্রবণে ফিকে, কি জাতীয় একটা বিজ্ঞাতীয় কেমন গন্ধ!

“কিন্দন ভাড়া হয়নি, যাঁ?” আমি জিজ্ঞেস করিঃ “আগের ভাড়াটো উঠে গেছে কিন্দন?”

“তা বেশ—বেশ অল্প কিছু দিন!” ছেলেটি থেমে থেমে বলে।

“অল্প কিছু দিন? বলো কি? দরজায় মাকড়সার ওড়না বসানো দেখচ যে?”

“কী বলচেন?” ছেলেটি বড়ো বড়ো চোখ করে’ তাকায়।

“মাথার ওপর মাকড়সার জালিয়াতি দেখচ কিনা?” আমি সহজ করে’ বলি এবার। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজিতে, পরিষ্কার করে মানে করে’ দিইঃ “দে হ্যাভ্‌ফোর্ড্‌ যাহেড্‌!”

যাক, ভেতরে তো পা বাড়াই।

ছেলেটি কিন্তু কিছুতেই সঙ্গে আসে না। বলেঃ “আমার ইস্কুলের টাইম হয়ে যাচ্ছে।”

“কতো আর দোরি হবে? ঘরগুলো একবার ঘূরে-ফিরে দেখা বইতো না!” আমি ওকে অভ্যর্থনা করি। “এসো এসো! চলে এসো!”

“আমি বাইরেই আছি। বেশ আছি!” ছেলেটি আমাদের প্রেরণা দ্বায়ঃ “বান না, কুর কি? এখানেই তো আছি।”

দৱজা খুলে মাকড়সার জালনা ভেদ করে’ ভেতরে তো ঢুকলাম। ঢুকে দেখলাম, ষে-লোকটা খবর দিয়েছিল, নেহাং মিথো বলে নি! পাকা সিমেট-করা, নীচের ঘরগালো পর্যাপ্ত চমৎকার! সামনের লনে দিব্যা ব্যার্ডমন্টন চলবে। খুলো-বালি ঝেড়ে-কুড় ধোলাই করে’ নিতে পারলে খাসাই হবে। বাড়ীখানি বেশ। ভাড়াও বেশী নয়। কলকাতার বৃক্তে এ যে একেবারে রাজয়োটক!

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠা গেল।

এবং উঠেই শা দেখলাম—সে এক দশা!

সাম্মনের ঘর থেকে দুটি ঘৰক—হষ্টপুষ্টি দুটি ঘৰক—হাঁড়ও সে সময়ে তারা যে খুব হস্ত ছিল হলপ্ৰকারে’ একধা বলা যায় না—হৃড়মৃড় করে বেরিয়ে এল—হৃটোপাটি করতে করতেই বেরিয়ে এল। দুঃজনের মধ্যে সে কী হাঁচোৱা-পাঁচোৱা ধন্তাধন্তি আৱ আছড়া-পাছড়ি। পৰদ্বন্দৱের ধাকা সামনাতেই দুঃজনে বারান্দায় গিয়ে পড়েছে—একেবারে কাঠের রেলিংটার কাছ দৈংসে বারান্দার ধারটায়।

এ ওকে কিলোছে, সে তাকে কিলোছে। বে শাকে পাছে, বেকসুর কিলিয়ে নিজে!

দুঃজনের মধ্যে সে কী তুম্ভল সংগ্রাম!

অত্থানি বীৱিহৰে চোট সামানা কাঠের রেলিং সইতে পারবে কেন?

সেই মহুভৈই কাঠের গম্ভী ভেঙে দুঃজনেই—দুঃজনাই—তারা—দারণ তাল ঠুকতে ঠুকতে—কোথায় আৱ? কোনো গাঠকে কাঠের রেলিংয়ের ঘায়া একবাৱ কাঠতে পারলে কোথায় আৱ ঘাওয়া ঘায়? সোজা নীচের দিকে, অধঃপতনের পথে, সিমেট দিয়ে শানানো একতলার উদ্দেশেই সটান রওনা হয়ে গেছে। ততক্ষণে তাদেৱ চিহ্নাত্তও নেই—অন্ততঃ বারান্দার ওপৰে তো নেই! তাদেৱ তথনকাৱ চোখ-ঘৰেৱ সেই ভীৰ্ত্তীবহুল চিত্ৰ এ-জীবনে আমি ভূলতে পাৱব না।

এত কাণ্ড ঘটে গেল আমাদেৱ সামনেই—আমাৱ আৱ বিনৰ চোখেৱ ওপৰেই!

এবং একেবারে নিঃশব্দেই ঘটে গেল!

বলা বাহুল্য, ও-ৱকম একটা দশ্যেৱ পৰে ও-বাড়ীতে আৱ ওঠা চলে না। ভূতে ভূত কিলোছে, এ-ৱকম দেখতে পাওয়া সচৰাচৰ দূৰ্লভ, খৰই বিৱল, তাতে ভূল নেই; কাৱণ, শোনা যায় এবং দেখাৰ গেছে (নিজেৰ কানে এবং অন্যোৱ চোখেই) —যে, ওৱাই অপৰদেৱ, যাবা ভূত নয় তাদেৱ ধৰে পাকড়ে মজা করে পিটিয়ে নেৱ। থবৱেৱ কাগজেও যাকে পড়া যায় বইকি!

তব, দৰ্শনীয় হিসাবে ষতই উপভোগ্য আৱ অভূতপূৰ্ব হোক, না কেন, সেই দৃষ্ট্য বিলাসিতা কৰতে গিয়ে কে ওদেৱ কিলাতিশয়েৱ মধ্যে গিয়ে পড়বে?

তাছাড়া, বিনি আমাকে ব্রুক্সে দিল, এমনও তো হতে পারে, ওরা ষড়্যন্ত ক'রে একটা সাংস্কৃতে এসে, অবশ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পে কিংবা বেওয়ারিল বিবেচনায়, আমাদের দু'জনকে শতকরা পঞ্চাশের আধারাধি ব্যক্তির নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়া করে' নিতে পারে। ভাগভাগি করে' বিনে পরসায় মারামারির জন্যেই অবশ্যি।

এবং আমিও বিনিকে ব্রুক্সে দিলাম, সে-রকমটা হ'লৈ 'মারামারি' আর হবে না। কেবল, ভূতকে মারা আর মারাই হোক, আমায় দিয়ে অন্ততঃ হবার নয়। নিজের ক্ষতির ভয়ে নয়, ভূতের প্রতি মহত্তর নয়, এবং কেবল যে আমার ক্ষমতার অর্তারিঙ্গ, তাই বলেও নয়, তবু, আমার দু'সাহসের একটা সীমা আছে তো! অতএব, ওটা কেবল এক তরফা, ভূতের জ্বানি, একচেটে 'মারী' হবে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং স্বচক্ষে যা দেখা গেল, যে-রকম একরোধা চল্লতে থাকবে, তাতে মহামারী' তো বটেই।

অতএব বাড়ী বদ্লানো আর হলো না। সেই দুর্ঘটনার পর অপর কোনো অচেনা আড়তে ওটা আমাদের সাহসে কুলালো না। কোথায় গিয়ে ফের কিন্তু ভূতের নিদর্শন পাবো, কে জানে! যেখানে আছি সেই ভালো! পুরাণে কোটেরেই পন্থমুক্তির হয়ে পড়ে থাক্লাম। এই সাবেক আস্তাটার স্মৰণ এই (ষেটা নতুন করেই সম্প্রতি আমাদের চোখে পড়ল), এখানে আশে-পাশে যে দু' একজন অবাঙ্গনীয় রয়েছেন, তাঁরা নিতান্তই জলজ্যালত এবং জানাশোনার ভেতরে; এখন পর্যন্ত, এতদিনেও একটিও মৃত ভূতের সাক্ষাৎ আমরা পাই নি, এবং বিনির বিবেচনায় (আর আমারও ঐ মত), মৃত ভূতেরাই বেশী রকম ভয়াবহ।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, ইতিমধ্যে বিনি একদিন সিঁড়ি থেকে গাড়িরে পড়েছে এবং এক রাস্তারে আমি—আমি নিজেও খাট থেকে পিছলে গেছি, আর ছোটখাট হেঁচট, তো লেগেই রয়েছে, চল্লতে ফিরতে ঠোকাঠোরও বড় কম খাচ্ছ না; এছাড়া অস্ত্রযন্থের আছড়ের তো কথাই নেই! তবু, অখাদ্যের এত বাড়াবাড়িতেও, বাড়ী বদ্লানোর নাম কেউ মৃথেও আৰিন নি। এতসব সঙ্গেও চমৎকার শান্তির মধ্যে কালাতিপাত করা যাচ্ছে, এখন সময়ে একটি ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

“আমি, আমি লালায়িত রায়—একজন লেখক!” বলেন তিনি।

“ও! তা—তা—” আমি আমতা আমতা করিঃ “আপনি লেখক? বেশ, বেশ!”

লোকটিকে, সেখকটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হয়!

“আমি আস্থাই বেহালা থেকে। ‘আব্ছায়া’ নামক পার্শ্বক পর্যাকার পক্ষ থেকে। ‘আব্ছায়া’র নাম শব্দেছেন নিশ্চয়?”

“আব্ছায়া? শোনা শোনা বলেই মনে হচ্ছে তো! তা, কী দরকার বলুন!”

“আজ্ঞে, আব্ছায়া-সম্পাদক তুম্বানল ভট্ট-ধিনি একাধিক বই লিখেছেন—”

“হ্যাঁ, জানি। ভট্ট মহাশয়ের নাম শুনেছি। এক-আধখানা পড়েও থাকব। খ্বৰ অথাদ্য লেখেন না ভদ্রলোক।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালোই লেখেন। আমার চেয়ে ভালো না হলেও খ্বৰ মন্দ নয়। তাঁর কাছ থেকেই আসছি, এবং আমার নিজের কাছ থেকেও বটে। আমরা দৃঢ়জনেই ‘আব্ছায়া’র—কি বলে গিয়ে—স্কৃতিকর্তা এবং রক্ষকর্তা...একমাত্র আর অস্বিতাইঁ।”

“তা, তৃতীয় বাণিজ কাছে কী কারণে আসা? আমি কি করতে পারি, বলুন?”
এবং অনন্যবিশেষ জানিয়ে দিইঁ: “সম্পাদকতা আমি করতে পারিনে।”

“না না না, সেজন্যে নয় এবং লেখার জন্যেও না। আমরা, আমরা আপনার কাছে লেখা-টৈখা চাইনে, ভয় নেই, ছোট্ট একটু কাগজ, আমাদের নিজেদের লেখা ছেপেই কুলিয়ে উঠতে পারছিনে, তবে—তবে কিনা—” বলতে বলতে উনি থেমে যান।

কিছুটা তখন আমি আশ্বস্ত হয়েছি: “তাহলৈ আর ভয় কি? বলুন।
বলে ফেলুন!” ঝঁকেও তখন ডরসা দিয়ে দিই।

“আজ্ঞে, আমরা আপনাকে একটা টাঁ-পাঁচি দিতে চাই। খ্বৰ ছোট্ট একটা টাঁ-পাঁচি। তার নিয়মস্থগ করতেই আমি এসেছিলুম। আপনার স্বীকৃতি একদিন, বৈদিন আপনি বলবেন, আমাদের ওখানে গিয়ে দয়া করে যদি যৎকর্ষণ জলযোগ—”

জলযোগের আবাহনে কে না কাবার হয়? আমি একটু কাঁ হলুম।

“তা, কে কে থাকবেন সেই পাঁচিতে?” আমি জিজ্ঞেস করি, “নামকরা
লেখকদের আর কেউ?”

“তাদের অনেককেই আমাদের করা হয়ে গেছে। তাঁদের খতম করেই আপনার
কাছে এসেছি। এদিন কেবল আপনি আর আমরা। আমরা মানে, সম্পাদক
তুম্বানলবাবু আর আমি। আমি হাঁচি আমাদের ‘আব্ছায়া’র সহকারী সম্পাদক
এবং—এবং সহকারী সম্পাদক থেকে ষ্ট্রীট-হকার পর্যন্ত সব। গুপ্ত কথাটা
আপনাকে বলতে আর দোষ কি? আপনি তো আমাদেরই একজন!”

“তা বেশ। আমরাও জন-দুই ঘাব। আমি আর বিনি। ওঁ: বিনি? বিনি
আমার ছোট বোন্।”

নিন্দিষ্ট দিনে যথা-সময়ের কিছি, আগেই, বিনি আর আমি বেহালায় গিয়ে
পেঁচিলাম। অনেক যুক্তি ঠিকানাও খুঁজে বার করা গেল।

যাঁ, এ বে সেই বাড়ী। সেই মারাওক বাড়াবাড়ি ঘার রেলিং ভেদ করে একদা
নীচে নেমে গেছে, সেই প্রাণ-নিয়ে-টানাটানি বাড়ীই যে!

দরজার মাথায় ‘আব্ছায়া কার্য্যালয়’, সাইনবোর্ড লট্কানো, এবং তার পাশেই
সিনেমার লম্বা-চোড়া বিজ্ঞাপন ঘেরে গেছে:

**দেবদত্ত ফিল্মের
পথভুলে !
—তঙ্গসহ—
সাবধান !!!**

একে বিনি সারা রাস্তা পাশাপাশি ‘তুমি ভুল করো না পার্থক! গুন্ট গুন্ট
কর্তে কর্তে এসেছে, তার ওপরে ভূতপূর্ব সেই বাড়ী আর তার গায়ে সাঁটা
এই বিজ্ঞাপন—সাবধানার্থক এই বাণী—দেখেই আমার বৃক্ষটা ছাঁৎ করে উঠল।
আমি আর আমার মধ্যে নেই!

আগ্রাপিছু কর্তে কর্তে কখন কড়া নেড়ে বসোছি এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন
ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছেন।

“এই যে! আপনারা! আপনারাই! আপনাদেরই অপেক্ষা কর্ছি”—
আমায়িকভাবে করমর্দনে তিনি এগিয়ে এলেন: “আমিই তুষানলবাবু। আমার
সেই মাস্তুলে ভাইটি—আমাদের সহকারী সম্পাদক—তিনি একটি বেরিয়েছেন। এই
এসে পড়লেন বলে! আপনারা আস্বন!”

এই বলে আমাদের হস্তগত ক'রে তিনি ভেতরে নিয়ে গেলেন।

তুষানলবাবুকেও কোথায় যেন দেখেছি, চেনা চেনা বলেই সল্লেহ হলো। কেন
সাহিত্যিকের আসরে বা সাহিত্য-বাসরেই দেখে থাক্ৰ হয়তো। আজকাল সব
অলিগণিতেই তো লেখকের বৈঠক বেধে রয়েছে। সাহিত্যের আখ্ডার তো অভাব
নেই! কাগজের ওপর কুস্তি করছে না কে?

দোতালায় সেই কাঠের রেলিং-ঢেরা বারান্দার কোণ ঘেঁষে, একটা তেপায়া টেবিল
ঘিরে আমরা তিনজনে বসলুম! সেই কাঠের রেলিংটা তেমনি অক্ষত দেহে রয়েছে:
খেলনো ছিন্নভিন্ন হয় নি। একান্ত অকারণেই তখন আমাদের বৃক্ষ মাঝে মাঝে
ছম্ব ছম্ব ক'রে উঠলেও, নিতান্ত অম্লক ভয়েই এমন চমৎকার বাড়ীটা আমরা
হাতছাড়া করেছি, তা বৃক্ষতে বাকী ছিল না। কেননা, এই তুষানলবাবুরাই-বা
এমন কি মন্দ আরামে এখানে বসবাস করছেন? তাঁরা যে সদাসৰ্বদা, বা কালে-
ভদ্রেও কখনো এস্থলে কোনো বিভীষিকা দেখেছেন বা দেখে আস্বেন—তাঁদের
চেহারায়, কই, তার চিহ্নাত্মক তো নেই!

কাঠের রেলিংটা আমাদের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হাস্তে থাকে।

ভেবে দেখলে, ভূত জিনিষটা কি? অতীতের আবহাওয়া ছাড়া আর কিছু তো নয়? বিগতকালে যেসব ঘটনা বা দৃশ্যটানা ঘটে গেছে, আকাশপটে তার পুনর্মুদ্রণ বই তো না? পৃথিবীর যত কিছু শব্দের মতো যাবতীয় দশ্যও তো আবহাওয়ার ভাঁড়ার-ঘরে জমা হয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগতই জম্ছে। আমাদের কান র্যাদ কখনো রেজিয়ের পর্যায়ে ওঠে, এক মুহূর্তের জন্যও ওঠে, তাহলে সেই মুহূর্তেই আমরা আকাশবাসী শুন্তে পাই, দৈববাণী যার নাম দিয়েছি। তের্বাঁ এই নশবর নেতৃ র্যাদ কখনো টেলিভিসনের পর্দার নামে, তাহলে তার আকস্মিক আভাসেই দৈবাং দশ্য আমাদের চোখে পড়ে যায়—যাকে বলি ভূত! কিন্তু বারবারই যে সেই একই দশ্য দেখব, বারবারই এই চম্রচক্র টেলিভিসনে পরিগত হবে, তার কি মানে আছে? হার হায়, অশ্বতাবশে ভূলবশতঃ এমন যাব-পৱ-নাই বাঢ়ীটা বেহাত হতে দেয়া বক্ত বোকায় হয়ে গেছে, মনের মধ্যে হা-হুতাশ হতে থাকে।

একটু পরেই, লাগায়িত রায়, অক্ষয়িম সংগীদকের সহযোগী সেই আদিম লেখক, একবার খাবারের মোট নিয়ে ফিরে এলেন। খাবারের সংগীদনা করতেই তিনি বেরিয়েছিলেন, বোৰা গেল। কিন্তু তাঁকে দেখে, আর তাঁর হাতে খাবারের ঝুঁড়ি দেখে, কোথায় আমরা পুলকে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠব, তা না, ততক্ষণে আমাদের হয়ে এসেছে!

প্রথম দর্শন থেকেই ঝন্দের দৃঢ়জনকে আমাদের চীন চীন টেক্ছিল, কিন্তু কেন যে এত ছিঠে মনে হচ্ছিল, এখন ঝন্দের উভয়কে একসঙ্গে দেখে, একেবারে পাশাপাশি দেখে, যুগপৎ দেখবার পরে ব্ৰহ্মতে আৰ বাকী থাকে না।

এঁয়া উভয় বে সেই দৃঢ়টি ভয়—ভয়াবহ সেই দৃঢ়ই অভিযান্তি—একদা যাঁদের আমরা এইখানেই, এই বারাদার ধারেই ধাক্কাধাক্কি ক'রে, রেলিং ভেঙে, সবেগে নেমে যেতে দেখেছি—সেই দৃঢ়ই অবতারই আজ এই নবরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সে-বিষয়ে আৱ সংশয় মাত্র রইল না।

সেদিন এঁদের—এই মারাষ্ট্রক মাস্তুতো ভাইদের—অশৱীরী দেহে দেখেছিলাম, ঝন্দের কাৰ্যাকলাপও ছিল নিশ্চেদ; কিন্তু আজ—আজ একটু আগেও তো ঝন্দের একজন করমদৰ্শনের অজ্ঞাতে নিজের অস্থিমজ্জার অস্তিত্ব আমাদের জানিয়ে দেখেছেন এবং এতক্ষণ ধৈরে কত ধোস-গুল্মই তো একত বসে কৱা গেল! এসব কি একান্তই মহাপ্রভুদের ছলনা তাহলে? স্কুল লৌলা?

এঁয়া কি তাহলে—তাহলে তাই ছাড়া আৰ কিছুই নয়? ভাবতে না ভাবতেই আমাদের হৃৎকল্প স্বৰ্দ হয়।

কিন্তু একটু একটু ক'রে আমাদের ভয় ভাঙে। দৃঢ়জনের, দৃঢ়ই মাস্তুতো ভাসের—গলায়-গলায় ভাব দেখেই সন্দেহ দ্রব হয়। ঝন্দের চালচলন অতান্তই

স্বাভাবিক—সাধারণ মানুষের যেমন হয়ে থাকে। কোথাও কোনো ব্যতার—কিছু-মাত্র মারাত্মকতা নেই এবং রেলিং চুর্ণ করাও যে খারাপ কোনো মতলব শুরা মনে মনে ভাঙছেন, শুনের আচার-ব্যবহার থেকে ঘৃণাক্ষরেও তা বোঝবার যো নেই। তবে বোধহয়, এখনও শুরা সম্পর্গের পেছনাতে ভূতান্তরিত হতে পারেন নি। আগের নম্বৰে দেহেই কল্পনাটে রয়ে গেছেন তাহলে!

আর তাছাড়া, ভেবে দেখতে গেলে (ভেবে আমাদের স্বচ্ছতর নিঃশ্বাস পড়ে), একজন ভূতের পক্ষে (না হয় দুজনই হলো), পক্ষের পর পক্ষ একথানি পর্যবেক্ষণ করা এবং তার সমস্ত কাঁপ লেখা, তার ওপরে প্রক্রিয়া দেখা, তারপর সেই-সব প্রেম থেকে ছাপানো (ভাবলেই গায়ে জরুর আসে!), তারপর রাস্তার মোড়ে মোড়ে, ঘটলে ঘটলে গিয়ে যত না কপি জমা দিয়ে আসা, এবং শেষে সহরের সব হকারদের কাছ থেকে মারায়ারি করৈ তার দাম আদায় করা চাট্টিখানি কথা নয়! একজন ভূতের পক্ষে এত ভূতের খাট্টনি খাট্টা কি সম্ভব? দুজনের পক্ষেও কঠিন! বেশ কঠিন। সত্যিকারের ভূত হলে এই ভৌতিক জগৎ ছেড়ে কবে চম্পত্তি দিত!

কিন্তু তবুও, সেই অতীতের কথা গনে হলৈ একটু যেন কেমন—একটু আশ্চর্যই লাগে কেমন! ভূত যদি না হয়, তাহলে সেদিন তবে কি আমরা ভাবিয়ৎ দেখেছিলাম?

নিছক ভাবিয়া-ই? ভূত নয় তাহলে?

থাবার আসার সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা দুজনেই পাশের ঘরে ঢুকেছিলেন। জলযোগের গোচগাছ করতেই বোধহয়।

আমি আর বিনি ঘূর্খায়াথি তাকিয়ে থাকি, এক কথাই দুজনে ভাবি। কী যে ভাবি, তা আমরাই জানিনে।

একটু পরেই একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসেঃ “এই, এই! তই খাচ্ছস্ যে বড়?”

“বাঃ, আমি কষ্ট করে আনলাম, আমি খাব না?”

“তা বলে এখন থাবি? এখনই থাবি? অতিরিক্ত বসে নেই? আগে তাদের দেয়া হোক্!”

“ভাবী আমার অতিরিক্ত! বিদ্যাবাটির আদিত্যভূতো আমার! যতই খাওয়াও চাই, ভবী ভুলবার নয়! অনেক তো খাইয়েছ, অনেকক্ষেত্রে তো খাইয়েছ! বিনি-পয়সায় লেখা পেয়েছ একটাও? সে-বিষয়ে হুসিয়ার, সে পাত্রই নয় ওরা!”

“শুন্তে পাবে, চৃপ্ত!”

“শুন্তো তো বয়েই গেল। আমি থাকতে ‘আব্ছায়া’য় আর কারুকে লিখতে দিচ্ছি না। টাকা দিয়েও না: টাকা নিয়েও নয়। কেবল আমি লিখব, আর তুমি, —তুমি সম্পাদক, তুমিও লিখতে পারো। আর কেউ না!”

“আবদার আৱ কি! জানিস, আমাৱ কাগজ? তোকে লিখতে দিয়েছি তাই
বক্তৈ গোছিস্। তোৱ লেখা কেউ ছাপে নাকি?”

“আমাৱ লেখৰ তুঃষি কি বুৰবে? জানতো তোমাৱ দাদা। লেখাৰ জন্য রোজ
ধৰ্ণি দিত আমাৱ বাড়ী। ক'জোড়া জ'তোই ক্ষইয়ে ফেলোছিল! হৎ!”

“দাদা তুলো না বলছি! ভালো হবে না কিন্তু!”

“তোমাৱ চেয়ে ভালো লিখি কিনা, সেইজন্যেই তোমাৱ এত রাগ। তা বুঝেছি।
কিন্তু তাৱ জন্যে আৱ কী কৰবে? কে আৱ তোমাৱ মুখ চেয়ে খারাপ লিখতে
যাচ্ছে? কালকেৱ ছেলেও তোমাৱ চেয়ে ভালো লিখে তোমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—
তোমাৱ চেয়ে নামজাদা হয়ে যাচ্ছে। তা বাপদু তুবানল, নিজেৰ অনলে এমন তিলে
তিলে আৱ কত দণ্ড হবে? তাৱ চেয়ে গলায় দাঁড়ি দাও, সব ল্যাঠা চুকে থাক!”

“দ্যাখ, ভালো হচ্ছে না কিন্তু! এইসা এক থাপড় কসাৰো, টেৱ পাৰি তথন!
সব লম্ফ-ৰাম্ফ বৈৱয়ে ঘাবে এক্ষণি। তোৱ লেখা ছাপানোও বৈৱয়ে ঘাবে।
আৱ তোৱ লেখা ছাপ'ব না, যাঃ!”

“তোমাৱ লেখাই বা কে ছাপছে? নিজেৰ বই তো নিজেৰ টাকায় ছাপে,
আবাৱ কথা কইতে আসো! কখানা তাৱ বিক্তি হয়? পৱেৱ হিংসেয় জৰলে মৱছ
কেবল! সম্পাদক বলে কিছু বলছি না, নহিলে—”

তঙ্গৰ্জনেৰ তোড়জোড় বেড়েই চলে।

বিনি ভীতিৰিহবল নেতে তাকায়।

হঠাতে ধাঁ ক'রে একটা রসগোল্লা কক্ষচূত হয়ে ছিটকে আসে, উল্কাৰ মত
ছুটে আসে, কিন্তু একটুৱ জন্যে ফস্কে ঘায়। আমাৱ গালে এসে লাগে,—ওদেৱ
গোলমাল শুনে আমি হাঁ ক'রে ছিলাম, কিন্তু কোনো ফল হয় না। মুখেৰ মধ্যে
না ঢুকে, রসগোল্লাটা গালেৰ গায়ে লেগে, আমাকে বাঁয়ে রেখে নিজেৰ আবেগে
ছিটকে বৈৱয়ে ঘায়।

গাতক ভালো নয়! অন্ততঃ রসগোল্লাদেৱ গাতি-বিধি খুব সুবিধেৰ নয়!

কিন্তু তাছাড়াও—আৱেকটা খটকা লাগে। চটক' ক'রে আমাৱ মনে হয়, অতীত-
কালেৰ সেই ভৰ্বিষ্যৎ, সেই সন্দ্ৰপৰাহত সম্ভাবনা, অন্ততঃ বৰ্তমানে এখনই,
নিতান্ত আসন্ন হয়ে আসছে না তো? ঘোৱালো হয়ে, আৱো জোৱালো হয়ে
এবং ঐ ক্ষীণকায় রেলিংএৰ ওপৱ যন্দ্ৰ সম্ভব ভাৱালো হয়ে—যাঁ?

এখন পৰ্যন্ত ঘাৱা ভূত হ'তে পাৱে নি, কিন্তু একদা ঘাৱেৰ ভূত বা ভৰ্বিষ্যৎ
যাই হোক, আমৱা দৰ্শন কৱেছিলাম—অকৃত্তিম আসল ভূতে পৰিণত হ'তে তাদেৱ
কি আৱ দৱৈ নেই?

কাঠেৰ রেলিংটা অটুট রয়েছে, এখনো রয়েছে, কিন্তু কতক্ষণ আৱ এমন থাকবে?
ভাৱতেই আমৱা শিউৱে উঠি।

আইন্স্টাইন নাকি বলেছিলেন, যা অতীত, তাই ভৰ্বিষ্যৎ এবং তাৱাই আবাৱ

বর্তমান ; এক কথায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব একাকার। মোটের ওপর এই গোছের কী একটা কথা বহুবিধ প্রমাণের সাহায্যে আমাদের কাছে তিনি গচ্ছাতে চেয়েছিলেন —বলা বাহ্যিক, আমার বোধগম্য হয় নি। কিন্তু আজ এই মহাত্মের জাজবুল্যমান দৃষ্টান্তের সামনে—আগতপ্রায় ওই দুই উদাহরণের মধ্যেমুখ্য দাঁড়িয়ে, নিম্নের মধ্যে সেই তত্ত্ব, দ্রুতিগম্য সেই তথ্য, বিদ্যৎ-বলকের মত আমার ঘাথার মধ্যে লেগে যায়।

সম্ভূত কাল, ইতিহাস যেଉন ঘৰে-ফিরে আসে, ঘে-কারণে আসে, তেরুনি, সেই কারণেই, অনন্তের অজ্ঞাত-ভান্ডারে জমানো একই সব দৃশ্য, অভিন্ন সব কথা, অন্তর্বৃত্ত সব ভাব, ঘৰ্গে-ঘৰ্গে খোলস বদলে যাতায়াত করে। খবরের কাগজের নিউজ, কলমের মত নতুন ইতিহাসের রূপ নিয়ে, সেই-সব একসেয়ে প্রাণে খবর প্রমরাবৃত্ত হয়। ঘৰে-ফিরে ফের এসে দেখা দেয়—আবার আমরা নতুন করে পাই।

হারানো অতীত বাড়ানো বর্তমানে এসে, হারিয়ে গিয়ে আবার অনাগত ভবিষ্যতে উদ্ঘাপিত হতে থাকে। সেই উদ্ঘাপনের দায় নিয়ে পুনঃ পুনঃ আমরা জীবন যাপন করি—কিন্তু কার জীবন যাপন করি? আকাশের সংবাদপত্র আগাগোড়া যার পড়া, যার নথদর্পণে, এমন কেউ যদি কোথাও থাকে, সে-ই কেবল তা বলতে পারে।

এই-সব ভাব, আর কাঠের রেলিংটা আমাদের দিকে চেয়ে কটাক্ষ করে!

আর কিছু না, ভূত ভবিষ্যৎ মাথায় থাক্, কেবল বর্তমানের হাত থেকে আঘাতক্ষা করবার জন্য—খনোখনির সাক্ষী হবার দায়িত্ব থেকে ঘাড় বাঁচাবার জন্যেই আমি আর বিনিঃ, পরম্পরাকে করায়ত্ত করে সেই যে সেখান থেকে ছুট মেরেছি,—বেহালার পথে আর পা বাঢ়াই নি। কোনোদিন বাঢ়াবও না।